হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

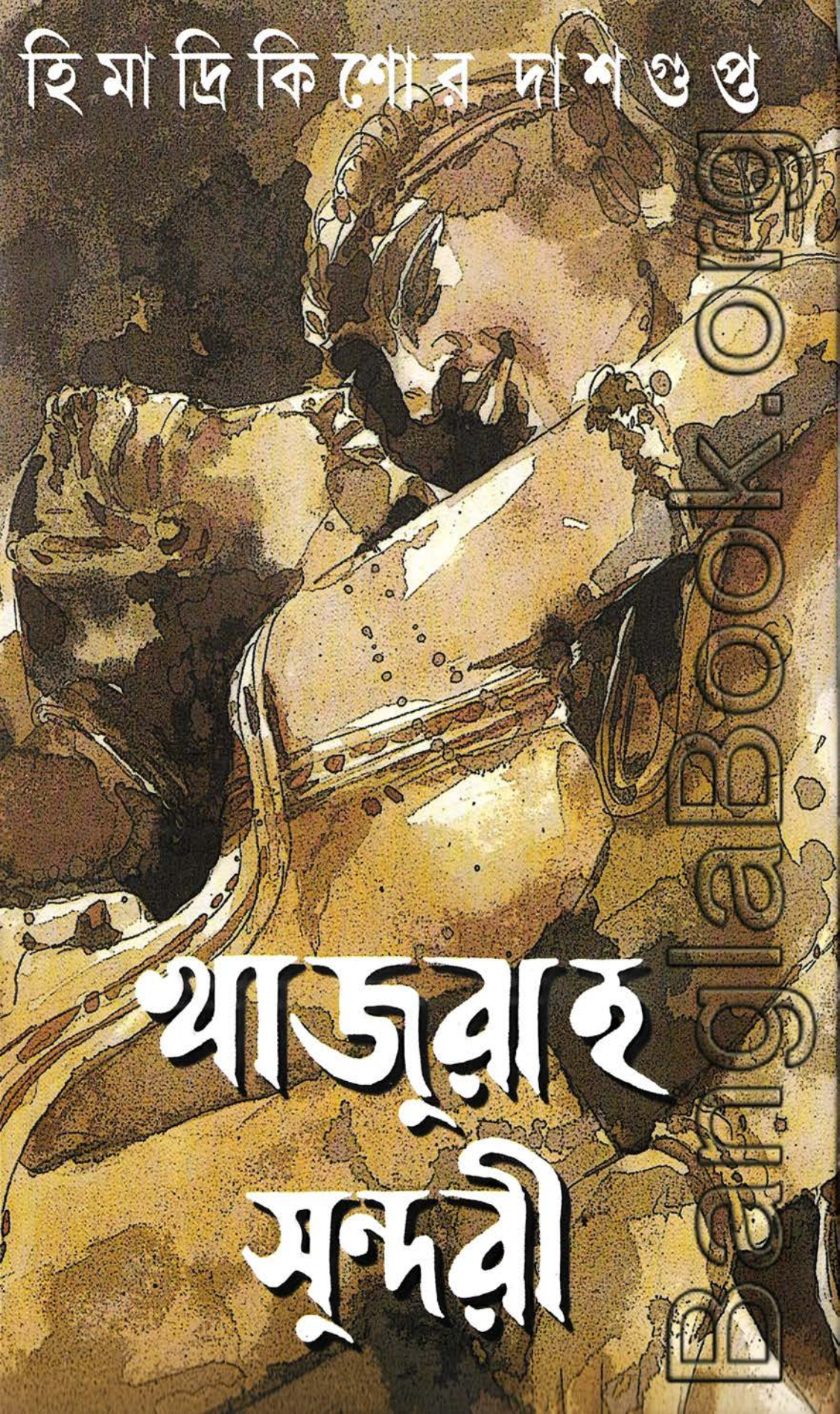

খাজুরাহ সুন্দরী

BanglaBook.org

একমলাটে ভারতের
ইতিহাসের পটভূমিতে
রচিত দুই প্রেমকাহিনি।

খাজুরাহ সুন্দরী
ও
একা কুম্ভ

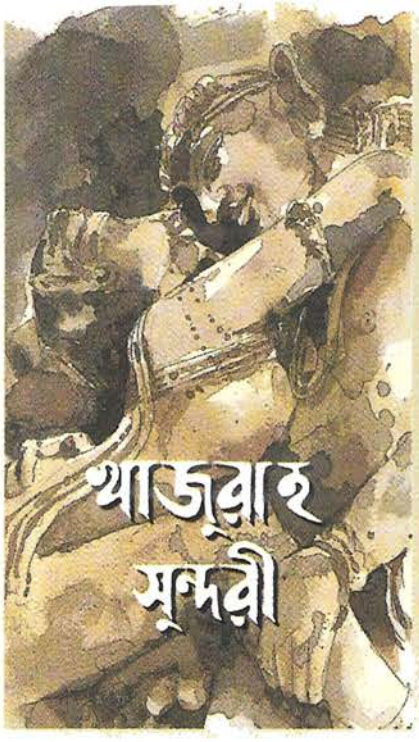

www.BanglaBook.org

মন্দিরময় নগরী খাজুরাহ। চান্দেলরাজ বিদ্যাধরের নির্দেশে সেখানে নির্মিত হচ্ছে মিথুন ভাস্কর্য সমন্বিত কান্ডারীয় মন্দির। দাসের হাট থেকে মন্দির-ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য কিনে আনা হয় নারীদের। তারপর তাদের উলঙ্গ করে নগ্নমূর্তি রচনা করেন ভাস্কররা। অসহায় নারীদের লজ্জা-কান্না মিশে যা: পাথরের বুকে। তেমনই এক সুরসুন্দরী মিত্রাবৃন্দা। তার প্রেমে বিভোর হয় সৈনিক রাহিল। এই প্রেম তাদের নিয়ে যায় এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে। কী সেই পরিণতি?—

চিতোরেশ্বর মহারানা কুম্ভ। তার স্ত্রী কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর মীরাবাঈ। মীরাবাঈ বাহ্যজ্ঞানহীন কৃষ্ণপ্রেমে। কিন্তু মহারান কুম্ভ তখনও প্রেম খুঁজে বেড়ান। তাঁর রক্ত উদ্দাম হয় নারীস্পর্শে। কারণ তিনি রক্তমাংসের মানুষ। শেষ পর্যন্ত কুম্ভ কী খুঁজে পেলেন তার ইপ্সিত নারীকে?...

একমলাটে ভারতের ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত দুই প্রেমকাহিনি। খাজুরাহ সুন্দরী ও একা কুম্ভ।

জন্ম ১৭ মে ১৯৭৩।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ।
ছোটদের সব প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাতেই লেখালেখি। বড়দের জন্যও লেখেন।
প্রথম প্রকাশিত গল্প 'হারানখুড়োর মাছ ধরা', কিশোর ভারতী পত্রিকায়।
প্রথম উপন্যাস 'কৃষ্ণলামার গুম্ফা' আনন্দমেলাতে প্রকাশিত হয়।
প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫টি। জনপ্রিয় এফ.এম. রেডিয়ো চ্যানেলগুলিতে নাট্যরূপ পেয়েছে বহু গল্প।
শখ আড্ডা, সাহিত্যচর্চা ও ভ্রমণ।
পত্রভারতী থেকে এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাস **রাক্ষুসে নেকড়ে, খাজুরাহ সুন্দরী, ফিরিঙ্গি ঠগি, চন্দ্রভাগার চাঁদ, কৃষ্ণলামার গুম্ফা, রুদ্রনাথের চুনির চোখ**।
বহু সম্মাননা ও পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু কিশোর আকাদেমি প্রদত্ত উপেন্দ্রকিশোর স্মৃতি পুরস্কার।

প্রচ্ছদ **সুব্রত মাজী**

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৮

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সুব্রত মাজী

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

KHAJURAHO SUNDORI
by Himadrikishore Dasgupta
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

Price ₹ 225.00

ISBN 978-81-8374-442-3

সুগত চক্রবর্তী, অর্ণব দাস,
সুখেন্দুকুমার সিনহা-কে

লেখকের অন্যান্য বই

চন্দ্রভাগার চাঁদ
ফিরিঙ্গি ঠগি
রুদ্রনাথের চুনির চোখ
কৃষ্ণলামার গুম্ফা
রাক্ষুসে নেকড়ে

মন্দির নগরী 'খাজুরাহ'। এক সময় তার নাম ছিল 'খর্জুরবাহক'। চান্দেলরাজ বিদ্যাধরের নির্দেশে সেখানে দীর্ঘ দশবছর ধরে নির্মিত হয়েছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিথুন ভাস্কর্যখোদিত কান্ডারীয় মহাদেব মন্দির। এ মন্দিরের অপরূপা সুরসুন্দরীদের যে নগ্নিকা মূর্তিগুলো আমাদের বিস্মিত করে, তারা কিন্তু কেউ প্রাচীন শিল্পীদের কল্পনা ছিল না। সেই সুরসুন্দরীরা, মৈথুনরত যুগলমূর্তিরা সবাই ছিলেন রক্তমাংসের মানুষ। জীবন্ত মডেল সামনে রেখেই তাদের মূর্তি নির্মাণ করতেন ভাস্করেরা। এই নারী মডেলদের কিনে আনা হত দাসের হাট থেকে। তারপর তাদের বাধ্য করা হত নগ্নিকা হতে, অচেনা পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে, এমনকী পশুর সঙ্গেও মিলিত হতে। অসহায় নারীদের চোখের জল, অসহায় হাহাকার শুষে নিত মন্দিরের রুক্ষ পাথর। 'খাজুরাহ সুন্দরী' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে এই পটভূমিকায়।

ইতিহাস আধারিত এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় উপন্যাস 'একা কুম্ভ'। ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত এই নাতিদীর্ঘ উপন্যাসটিও এক প্রেমকাহিনি। আবর্তিত হয় এক অনামা নারীকে কেন্দ্র করে। যার মুখ্য চরিত্র 'কুম্ভ'। ইনি বুঁদির গড়ের কুম্ভ নন, চিতোরের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি মহারানা কুম্ভ। নির্মাণ করেছিলেন চিতোরের শৌর্যবীর্যের প্রতীক 'বিজয় স্তম্ভ'। নির্মাণ করেছিলেন আরও বহু দুর্গ। ইতিহাসবিখ্যাত এই রাজপুত মহারানার পত্নী ইতিহাসবিখ্যাত নারী মীরাবাই। পত্নী মীরাবাই কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর। কিন্তু কুম্ভ তো সাধক নন, রক্তমাংসের মানুষ! প্রৌঢ় হলেও তাঁর হৃদয় প্রেম চায়, শরীর পেতে চায় নারীর স্পর্শ।

ঐতিহাসিকরা ইতিহাস রচনা করেন। আর ঐতিহাসিক কাহিনিকারেরা ইতিহাসকে আশ্রয় করে তার কাহিনির জাল বোনেন। আমার এই উপন্যাস দুটি তেমনই। আমার খাজুরাহ ভ্রমণের সাক্ষী হয়েছিলেন কাঁচরাপাড়া রেল ওয়ার্কশপের কর্মী, সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ শ্রীসুখেন্দুকুমার সিনহা। লেখার জন্য নোট নেওয়া, ছবি তোলা ইত্যাদি কাজে তিনি প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই লেখক দেবতোষ দাশ ও শাশ্বতী চন্দকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য। কৃতজ্ঞতা জানাই পত্রভারতী কর্তৃপক্ষকে একমলাটে আমার এই উপন্যাসদুটি প্রকাশ করার জন্য।

পরিশেষে বলি, কিছু পাঠক-পাঠিকার দীর্ঘদিনের অনুযোগ ছিল তাঁরা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস পান না বলে। আমার ধারণা এই বই তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করবে।

১২ ডিসেম্বর ২০১৬

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

খাজুরাহ সুন্দরী ১১

একা কুম্ভ ১৫৫

খাজুরাহ সুন্দরী

১

কান্ডারীয় মন্দিরের উঁচু ভিতের ওপর প্রশস্ত চত্বরে রক্ষীবাহিনীর ছোট্ট দলটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল রাহিল। রাজনির্দেশে আজ সকালে সবেমাত্র তারা উপস্থিত হয়েছে এই মন্দিরনগরীতে, এই কান্ডারীয় মন্দিরে। রাহিল এ জায়গাতে আগে কোনওদিন আসেনি। চত্বরের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে নানা আকারের প্রস্তরখণ্ড, অর্ধসমাপ্ত নানা ধরনের মূর্তি, মন্দির নির্মাণের যন্ত্রপাতি। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থাতেই রাহিল মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল পিছনের দিকে। অনেকটা পর্বত শৃঙ্গের মতোই ধাপে ধাপে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে নির্মীয়মাণ বিশাল এক স্থাপত্য।

কান্ডারীয় মহাদেব মন্দির। চান্দেলরাজ বিদ্যাধরের নির্দেশে গত দশ বছর ধরে নির্মিত হচ্ছে এই মন্দির। মন্দিরের মূল কাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে অনেক আগেই। মন্দিরগাত্রের অলঙ্করণের কাজও দুই-তৃতীয়াংশ সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে রচিত হয়েছে নানা অলঙ্করণ, স্থাপিত হয়েছে নানা পশুপাখি, দেবদেবীর মূর্তি। তবে তারই মাঝে ত্রিভুজের মতো আকাশের দিকে উঠে-যাওয়া মন্দিরগাত্রে রয়েছে অসংখ্য ফাঁকা খাঁজ, উন্মুক্ত তাক। সেগুলো ভরাট হলেই সম্পূর্ণ হবে মহারাজ বিদ্যাধরের স্বপ্ন-মন্দিরের নির্মাণ।

হাজার বছর পরও যে মন্দির দেখে বিস্মিত হবে ভবিষ্যতের মানুষ, স্মরণ করবে চান্দেলধীপ বিদ্যাধরকে। এ পর্যন্ত মন্দিরের নির্মাণ কাজ যতটুকু সম্পন্ন হয়েছে তা দেখেই ঘোর লেগে যাবে মানুষের মনে। বিশেষত, ওই দেবদেবী আর পশুমূর্তিগুলো এতটাই জীবন্ত যে হঠাৎ দেখলে তাদের রক্ত-মাংসর প্রাণী বলে ভ্রম হয়। চত্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

থাকা কালো পাথরের তৈরি বিশাল হস্তীযূথকে প্রথম দর্শনে তো সত্যি ভেবেছিল রাহিল। এখানে সৈন্যদল নিয়ে আসার পর বেশ কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে রাহিলের। তাদের মধ্যে প্রধান ভাস্কর চিত্রবান, পুরোহিত অনুদেব যেমন আছেন তেমনই আছে মাহবার মতো সাধারণ ভাস্করও।

মাহবা বলছিল মন্দিরগাত্রের ওই শূন্য খোপ-তাকগুলো নাকি ভরাট করা হবে সুরসুন্দরী আর মিথুনমূর্তি দিয়ে। মন্দির বা স্থাপত্যে মিথুনমূর্তি থাকলে নাকি বজ্রপাত হয় না। তাই স্থাপন করা হবে মিথুনমূর্তি। যাতে হাজার বছর পরও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পায় চান্দেলরাজদের মন্দিরময় রাজধানী খর্জুরবাহকের এই মহাদেব মন্দির। যদিও কী কারণে রাহিলের নেতৃত্বে এই ছোট্ট সেনাদলকে এখানে নিয়োজিত করা হল তা এখনও রাহিলের কাছে স্পষ্ট নয়।

প্রধান সেনাধ্যক্ষ উগ্রায়ুধ তাদের এখানে পাঠাবার আগে জানিয়েছেন এখানে এসে চিত্রবান আর অনুদেবের নির্দেশ পালন করতে হবে রাহিল আর তার ক্ষুদ্র সেনাদলকে। প্রাথমিক পরিচয়ে সেনাদলকে কী কাজ করতে হবে তা ব্যক্ত করেননি চিত্রবান বা অনুদেব। তাঁরা জানিয়েছেন যথাসময় রাহিলকে তাঁরা তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করবেন।

সূর্য ঠিক মাথার ওপর। রাহিলদের কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়েছিলেন প্রধান স্থপতি ভাস্কর চিত্রবান। মধ্যবয়সি, পরনে শুভ্রবসন। গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, আজানুলম্বিত পেশিবহুল হাত, কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা ঘন কুঞ্চিত কেশরাশি। ঠিক যেন কালো পাথরের তৈরি মূর্তি। আর তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ অনুদেব। প্রৌঢ় অনুদেবের পরনে রক্তাম্বর, গায়ে একটা উড়নি। শুভ্র দেহ, মুণ্ডিত মস্তক, দীর্ঘ পুরুষ্ট শিখা নেমে এসেছে পিঠ পর্যন্ত। মধ্যাহ্নের সূর্যকিরণে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে তার কর্ণকুন্তল।

প্রাথমিক পরিচয় বিনিময়ের সময় রাহিল জেনেছে যে অনুদেব এই মন্দিরনগরীতে যত মন্দির আছে তাদের পুরোহিতদের অধিপতি। পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ তিনি। কিছুদিন পর কান্ডারীয় মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হলেই মন্দিরনগরীর প্রধান মন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন অনুদেব। শাস্ত্রমতে যাতে এই মন্দির নির্মিত হয় তা দেখার দায়িত্ব অনুদেবের ওপরই ন্যস্ত।

BanglaBook.org

আর তাদের দুজনের কিছুটা তফাতে সম্ভ্রমের দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছে তাদের জনা দশেক অনুচর। চিত্রবান, অনুদেবসহ তাদের অনুচরদের সবার দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ। বেশ কিছুটা তফাতে একটা খর্জ্জুরকুঞ্জের আড়ালে গিয়ে হারিয়ে গেছে মন্দিরচত্বর থেকে এগিয়ে যাওয়া পাথুরে রাস্তাটা। সেই বাঁকের দিকে তাকিয়ে কীসের যেন প্রতীক্ষা করছে সবাই।

একসময় প্রতীক্ষার অবসান হল। অনুদেবকে হাত তুলে দূরের বাঁকের দিকে দেখালেন চিত্রবান। খর্জ্জুরকুঞ্জর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে একদল অশ্বারোহী। সঙ্গে বেশ কয়েকটা গো-শকট। তারা এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে। তাদের দেখামাত্র চিত্রবান ঘাড় ফিরিয়ে রাহিলকে বললেন, 'নীচে চলুন। ওরা আসার পর ওদের চারপাশে বৃত্তাকারে ব্যূহ রচনা করবেন।' কথাগুলো বলার পর তিনি হাঁক দিলেন, 'বিকর্না? বাইরে আসো। ওরা এসে গেছে।'

সেই হাঁক শুনে মলের ছমছম শব্দ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এল স্থূলকায়া একজন। পরনে ঘাগরা, কাঁচুলি। মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। কুতকুতে চোখ, পুরু ঠোঁট, লাবণ্যর লেশমাত্র নেই সারা শরীরে। কোমরবন্ধনীতে গোঁজা আছে একটা ছোট্ট ছুরিকা। বাইরে বেরিয়ে সে একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল রক্ষীবাহিনীর দিকে। যেন জরিপ করে নিল সবাইকে। রাহিল ভালো করে তাকে দেখার পর বুঝতে পারল এই বিকর্না আসলে একজন বৃহন্নলা।

সে বাইরে আসার পর তাকে আর তাদের অনুচরদের নিয়ে মন্দির ভিত থেকে নীচে শানবাঁধানো চত্বরে নামতে শুরু করল সবাই। সঙ্গীদের নিয়ে তাদের অনুসরণ করে চত্বরে এসে দাঁড়াল রাহিল। সেই অশ্বারোহীর দলটা তিনটে গো-শকট নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে দাঁড়াল সে জায়গাতে। শকটগুলোর ওপর ছই নেই। তার পরিবর্তে পশুচর্মে আচ্ছাদিত বিরাট চারকোনা রাখা আছে। দলটা সেখানে এসে দাঁড়াতেই রাহিলের ইশারাতে রক্ষীরা ঘিরে ফেলল তাদেরকে।

ঘোড়সওয়ার আগন্তুকদের সকলের পরনেই লম্বা ঝুলের নোংরা পোশাক, মাথায় পাগড়ি, কোমরে বাঁকানো তরবারি, পায়ে ফিতে বাঁধা চর্মপাদুকা। তাদের মধ্যে একটা তামাটে ঘোড়ায় বসে থাকা স্থূলকায়

BanglaBook.org

একজন লোক মনে হয় দলপতি। তার কানের স্বর্ণকুন্তল, গলায় মুক্তমালার ছড়া, তরবারির হাতলটাও মনে হয় সোনার। অঙ্গুরীয়-খোচিত হাতে ধরা আছে একটা লম্বা চাবুক। লোকগুলোর পোশাক আর সর্বাঙ্গ ধুলো-মাখা দেখে রাহিল অনুমান করল লোকগুলো ভিনদেশি। যাযাবর শ্রেণির লোকও হতে পারে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে তারা এখানে এসেছে।

সেই স্থূলকায় লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে চিত্রবান আর অনুদেবকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্ভাষণ জানিয়ে বিজাতীয় ভাষায় কী যেন বলল। তার কথা শুনে গো-শকটের দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। দলপতি এরপর নির্দেশ দিলেন তার সঙ্গীদের ঘোড়া থেকে নেমে তারা খুলতে শুরু করল গো-শকটের আচ্ছাদন। আর সেগুলো সরে যেতেই চমকে উঠল রাহিল।

প্রত্যেক শকটের ওপর রয়েছে শাল কাঠের খুঁটির তৈরি খাঁচা। আর তার মধ্যে রয়েছে নারীর দল! যুবতী, কিশোরী! ঠিক যেমনভাবে বন্য পশুদের খাঁচায় রাখা হয়, ঠিক তেমনভাবে খাঁচায় রাখা হয়েছে তাদের। ভীত সন্ত্রস্তভাবে খাঁচার গরাদ ধরে তারা বাইরে তাকাচ্ছে, কেউ বা আবার ভয়ে কাঁপছে। রাহিল বুঝতে পারল ওরা ক্রীতদাসী, আর ওই মোটা লোকটা সম্ভবত দাসব্যবসায়ী। কিন্তু এদের এখানে আনা হয়েছে কেন? দেবদাসী বানাবার জন্য? কিন্তু মন্দিরনির্মাণ-কাজ তো এখনও শেষ হয়নি! তাদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল রাহিল।

খাঁচার আগল সরিয়ে মাটিতে নামানো শুরু হল নারীদের। মাটিতে পা রেখে তাদের কেউ ডুকরে কেঁদে উঠল, কেউবা আতঙ্কে বা দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর মধ্যাহ্নের সূর্যালোক সহ্য করতে না পেরে চোখ বন্ধ করে ফেলল। তিনটে গাড়ি থেকে নামানো হল মোট তিরিশজনকে। সারবদ্ধভাবে পাথুরে চত্বরে দাঁড় করানো হল তাদের।

যাদের আনা হয়েছে তাদের বয়স, পোশাক, গাত্রবর্ণের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাদের দেখে রাহিলসহ উপস্থিত সবাই একটা ব্যাপার স্পষ্ট উপলব্ধি করল, এই নারীরা তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব বা মুখমণ্ডলের দিক থেকে প্রত্যেকেই আসামান্যা রূপসি। হাজারও মলিনতা, বিষণ্ণতা সত্ত্বেও সৌন্দর্য যেন চুঁইয়ে পড়ছে তাদের দেহ বেয়ে। সবাই বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে

BanglaBook.org

তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। এরা কি মানবী, নাকি শাপভ্রষ্ট অপ্সরা! আকাশ থেকে খসে পড়েছে ধূলা-মলিন পৃথিবীতে।

বিস্ময় ভাব ফুটে উঠেছে প্রধান ভাস্কর আর পুরোহিত অনুদেবের চোখেও। তাই দেখে হলদে দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসতে লাগল সেই দাস ব্যবসায়ী।

চিত্রবান আর অনুদেব এরপর চাপা স্বরে কী যেন আলোচনা সেরে নিয়ে ইশারা করলেন বিকর্নাকে। বৃহন্নলা এগিয়ে গেল সেই নারীদের দিকে। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা নারীদের প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল একজন অষ্টাদশী। কদাকার বিকর্না তার দিকে এগোতেই নারী দলের ভিতরে মৃদু গুঞ্জন উঠল আতঙ্কে। তাই দেখে দাসব্যবসায়ী একবার তার হাতের চাবুকটা মাথার ওপর বাতাসে ঘুরিয়ে মাটিতে আছড়ালেন। হিংস্রতা ফুটে উঠল তার চোখে। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু গুঞ্জন থেমে গেল।

বিকর্না প্রথমে সেই অষ্টাদশী যুবতীর কাছে গিয়ে পোশাকের ওপর দিয়ে তার বুকে, নিতম্বে, পেটে, ঊরুতে হাত দিয়ে টিপে টিপে কী যেন পরীক্ষা করল। তারপর একইভাবে পরীক্ষা শুরু করল অন্য নারীদেরও।

রাহিল মৃদু বিস্মিতভাবে দেখতে লাগল ঘটনাটা। বৃহন্নলার খসখসে হাতের স্পর্শে ঘেন্নায় আতঙ্কে কুঁকড়ে উঠে চোখ বুজে ফেলছে কেউ। কেউ বা আবার স্থির অচঞ্চলভাবে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকছে। হয়তো তারা তাদের ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছে অথবা তারা এত দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে যে নতুন কোনও কষ্ট তাদের স্পর্শ করতে পারছে না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল বিকর্নার সেই পরীক্ষাপর্ব। শুধু পেটে হাত দেবার পর দুজন রমণীকে সে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। দাসব্যবসায়ীর অনুচররা সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুজনকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে একটা গো-শকটের ওপর খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিল। অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর্তনাদ করে উঠল তারা। তাদের একজন যেন কী কারণে খাঁচার মধ্যে দাঁড়িয়ে মুষ্টাঘাত করতে লাগল নিজের পেটে। যেন পাগল হয়ে গেছে সেই রমণী। তারপর সে একটানে গলা থেকে তার মঙ্গলসূত্র টেনে ছিঁড়ে খাঁচার বাইরে ছুড়ে ফেলল। সেটা এসে পড়ল রাহিলের পায়ের

BanglaBook.org

সামনে। রাহিল সেটা দেখে বুঝতে পারল ওই রমনী বিবাহিত।

বিকর্নার পরীক্ষাপর্ব মিটল এক সময়। হাসি ফুটে উঠল দাসব্যবসায়ীর মুখে। মাত্র দুজন ছাড়া সবাই নির্বাচিত হয়েছে প্রাথমিক পরীক্ষায়। আবছা হাসি ফুটে উঠল চিত্রবান আর অনুদেবের ঠোঁটের কোনাতেও। মুখবন্ধ রেশমের থলে হাতে চিত্রবানদের এক অনুচর এসে দাঁড়াল। চিত্রবান সেই থলেটা তুলে দিল দাসব্যবসায়ীর হাতে। স্থূলকায় লোকটা সেই থলেটা নিয়ে একবার ঝাঁকাল। মুদ্রার ঝনঝন শব্দ স্পষ্ট কানে এল রাহিলের। এরপর সেই দাসব্যবসায়ী চিত্রবানের সঙ্গে কথা বলে চড়ে বসল তার অশ্বে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হতভাগ্য সেই দুই রমনীকে নিয়ে দাসব্যবসায়ীদের পুরো দলটা রওনা দিল কোনও অজানা গন্তব্যে। অন্য রমনীরা প্রথমে পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে রইল।

রাহিলকে এবার চোখের ইশারায় কাছে ডাকলেন প্রধান ভাস্কর চিত্রবান। রাহিল তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চিত্রবান বললেন, 'এই নারীদের পাহারা দেবার কাজেই আপনারা নিয়োজিত থাকবেন। মন্দিরের নিজস্ব রক্ষীবাহিনী একটা আছে। তার প্রধানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

প্রধান পুরোহিত অনুদেব বললেন, 'খেয়াল রাখবেন এই রমনীদের মধ্যে কেউ যেন মন্দির চত্বর ছেড়ে পালাতে না পারে। নচেৎ রাজরোষ বর্ষিত হবে সবার ওপর।'

মাথা ঝুঁকিয়ে তাদের কথায় সম্মতিদান জানাল রাহিল। সে রক্ষীবাহিনীর অনু-অধ্যক্ষ মাত্র। রক্ষীদলের দশজনের দায়িত্ব সামলায় সে। রক্ষীবাহিনী বা সেনাদলের সর্বকনিষ্ঠ পদ তার। প্রতি একশোজন অনু-অধ্যক্ষর দায়িত্ব সামলান একজন উপাধ্যক্ষ, কুড়িজন উপাধ্যক্ষর ওপর একজন অধ্যক্ষ। আর চারজন অধ্যক্ষর মাথার ওপর চান্দেলরাজের প্রধান সেনাপতি, মহাসৈন্যাধ্যক্ষ অনুলোম। সেনাদলের কনিষ্ঠতম আধিকারিক হিসাবে নির্দেশ পালনই তার একমাত্র কাজ।

বৃহন্নলা বিকর্না এরপর সেই নারীদের নিয়ে রক্ষী-পরিবৃত অবস্থায় সোপানশ্রেণি বেয়ে উঠতে শুরু করল মন্দির-ভিতের ওপরের চত্বরে। আর তাদের পিছন পিছন এগোল চিত্রবান, অনুদেব, রাহিল ও অন্য ভাস্কররা। তাদের সঙ্গে এগোতে এগোতে রাহিল কৌতূহলবশত চিত্রবানকে প্রশ্ন

BanglaBook.org

করল, 'এদের এখানে আনা হল কেন? দেবদাসী বানাবার জন্য?'

চলতে চলতে প্রধান ভাস্কর জবাব দিলেন, 'না, দেবদাসী নয়, এদের দেখে সুরসুন্দরীদের মূর্তি রচনা করবেন ভাস্কররা। বিল্বফলের মতো স্তন, ক্ষীণ কটি, গভীর নাভিকুণ্ড, ভারী বীণার মতো নিতম্বযুক্ত এইসব নারীদের বাছাই করে আনা হয়েছে মগধ, উজ্জয়িনী, কামরূপ, কনৌজ, ত্রিপুরীর দাসবাজার থেকে। এদের কাউকে কাউকে মিথুন ভাস্কর্য বা যৌন ভাস্কর্য নির্মাণের কাজেও ব্যবহার করা হবে। তবে চূড়ান্ত নির্বাচন পর্ব এখনও হয়নি। সে পর্বে এদের মধ্যে যারা নির্বাচিত হবে তারাই সুরসুন্দরী হবে। বাকিরা দাসী হবে, সুরসুন্দরীদের পরিচর্যা করবে, প্রয়োজনে ভাস্করদের মনোরঞ্জন করবে। কাশ্মীর, উৎকল, ত্রিগর্ভ, চালুক, গন্ডরাজ্য, পশ্চিম উপকূলের বহু জাতির নারী আছে এই দলে।'

রাহিল জানতে চাইল, 'চূড়ান্ত নির্বাচন কীভাবে হবে? দুজন নারীকে প্রাথমিক নির্বাচনে বাদ দেওয়া হল কেন?'

সোপানশ্রেণি বেয়ে মন্দির-ভিতের ওপর উঠতে উঠতে চিত্রবান দ্বিতীয় প্রশ্নের আগে জবাব দিয়ে বললেন, 'কারণ, ওই দুই নারীর গর্ভে সন্তান আছে। যত দিন যাবে তত তাদের উদর স্ফীত হবে। ভাস্কর্য রচনার পক্ষে অনুপযুক্ত তারা। হয়তো গর্ভে বীজ ধারণ করেই দাসের হাটে তারা বিক্রির জন্য এসেছিল অথবা দাসব্যবসায়ীরা তাদের ধর্ষণ করেছে।'

পাশ থেকে অনুদেব গম্ভীরভাবে বললেন, 'শাস্ত্রমতেও সন্তানসম্ভবাদের মিথুন ভাস্কর্য রচনা করা নিষিদ্ধ।'

চিত্রবান এরপর প্রথম প্রশ্নর জবাবে বললেন, 'সুরসুন্দরীদের মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে বক্ষসৌন্দর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই সৌন্দর্যই পরীক্ষা করা হবে এবার।'

কথা বলতে বলতে সবাই উঠে এল মন্দির-ভিতের ওপর। যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মূল মন্দির। বিকর্না এক জায়গাতে সেই নারীদের জড়ো করে দাঁড় করিয়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে তারা তাকিয়ে দেখছে চারপাশে। তারা ঠিক বুঝতে পারছে না কেন তাদের এখানে আনা হয়েছে। হঠাৎ মন্দির-ভিতের ওপর এক কোণে একটা জিনিসের ওপর চোখ পড়তেই ডুকরে কেঁদে উঠল এক নারী। সেখানে প্রোথিত রয়েছে একটা হাড়িকাঠ।

BanglaBook.org

যে হাড়িকাঠে ভিতের ওপর মন্দির নির্মাণের আগে উৎসর্গ করা হয়েছিল চারজন বালককে। সেটা দেখে মেয়েটির সম্ভবত ধারণা হয়েছে তাদেরও বলি চড়াবার জন্য মন্দিরে আনা হয়েছে। কিন্তু বিকর্না কর্কশ গলায় ধমক দিতেই তার কান্না থেমে গেল। হাড়িকাঠটার দিকে তাকিয়ে কাঁপতে লাগল সে।

মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে রাহিলকে সঙ্গে করে এসে দাঁড়ালেন চিত্রবান, অনুদেব ও তার সঙ্গীরা। সেখানে পাথুরে মাটিতে খড়ি দিয়ে বেশ বড় একটা বৃত্ত রচনা করা হয়েছে। সেই বৃত্ত ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল ভাস্করদের দল। অন্য নারীদের রক্ষীদের হেফাজতে রেখে বিকর্না প্রথমে এক নারীকে এনে দাঁড় করাল বৃত্তর ঠিক মাঝখানে। তারপর কোমর থেকে ছুরি বার করল। তা দেখেই থরথর করে কাঁপতে শুরু করল মেয়েটা। বিকর্না ছুরি দিয়ে চিরে ফেলল তার ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক, খসিয়ে ফেলল তার বক্ষ আবরণী। এতজন পুরুষের চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল তার ঊর্ধ্বাঙ্গ।

শঙ্খের মতো তার স্তন চেয়ে আছে আকাশের দিকে, ক্ষীন কটিদেশে নাভিকূপ এত গভীর যে সূর্যালোক সেখানে প্রবেশ করতে পারছে না। এত সৌন্দর্য কোনও নারীর হতে পারে! মেয়েটা একবার চেষ্টা করল দু-হাত দিয়ে তার স্তনযুগলকে আড়াল করার।

কিন্তু বিকর্না এক ঝটকায় তার মৃণালবাহুদুটোকে দু-পাশে নামিয়ে দিল। তারপর ভঙ্গি করে দেখাল কীভাবে বুক চিতিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়াতে হবে আকাশের দিকে মুখ তুলে। চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে মুখ করে সেভাবেই দাঁড়াল সেই যুবতী। শুধু লজ্জা, অপমানে তার চোখের কোণ বেয়ে পাথুরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। উপস্থিত সবাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল তাকে। তার উন্মুক্ত অঙ্গের প্রতিটা খাঁজ, প্রতিটা বাঁক ছুঁয়ে যেতে লাগল ভাস্করদের চোখ।

রাহিলের কিন্তু বেশ অস্বস্তি হল এই দৃশ্য দেখে। উন্মুক্ত বক্ষ অনেক দেখেছে রাহিল। সীমান্ত অঞ্চলে জেজাকভূক্তির হয়ে যুদ্ধে কলচুরি আর যবনদের প্রতিহত করেছে সে। যবন সেনাদের রোমশ বুক, কলচুরিদের কালো কষ্টিপাথরের মতো বুক লক্ষ্য করে অনেকবার অস্ত্র হেনেছে

BanglaBook.org

রাহিল। কিন্তু এই উন্মুক্ত, কোমল, অশ্রুসিক্ত নারীবক্ষ দেখে কেমন যেন অস্বস্তি আর লজ্জাবোধ হতে লাগল তার।

মন্দির-প্রাঙ্গনে, দেওয়ালগাত্রে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে সার সার দেবদেবীর মূর্তি। অপূর্ব শিল্পসুষমামণ্ডিত যে মূর্তিগুলোকে কিছু সময় আগে রাহিলের জীবন্ত বলে মনে হয়েছিল এখন সে বুঝতে পারল ওই দেবমূর্তিগুলো নিছকই পাথরের মূর্তি। অস্বস্তি হলেও ব্যাপারটা কী ঘটতে চলেছে তা বোঝার জন্যই রাহিল চেয়ে রইল সেই দৃশ্যর দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ সেই অপরূপাকে পর্যবেক্ষণ করার পর প্রধান ভাস্কর তার পোশাকের ভিতর থেকে একটা ক্ষুদ্র গোলক বার করলেন। আকারে সেটা কবুতরের ডিমের মতো হবে। তবে নিটোল গোলক। সম্ভবত হীরক গোলক হবে। সূর্যালোকে ঝলমল করছে সেটা। বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতীর দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে তাকালেন তিনি। তারপর অদ্ভুতভাবে গোলকটা নিক্ষেপ করলেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

গোলকটা ঠিক গিয়ে পড়ল যুবতীর উন্মুক্ত দুই বক্ষের ঠিক মাঝখানে। তারপর আটকে গেল সেখানেই। তা দেখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল প্রধান ভাস্করের ঠোঁটের কোণে। হাসি ফুটে উঠল অন্যদের ঠোঁটেও। রাহিল অনুমান করল সম্ভবত নির্বাচিত করা হল এই রমণীকে। বিকর্না তার বক্ষ থেকে সেই হীরক-গোলক তুলে নিয়ে প্রধান ভাস্করের দিকে তাকাল। তিনি ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে ধরলেন উপর দিকে। বিকর্না সেই গোলক ভাস্করের হাতে সমর্পণ করে পরীক্ষিত সেই নারীকে বৃত্তের বাইরে একপাশে দাঁড় করাল। তারপর নিয়ে এল আর এক নারীকে। তারও ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মোচন করে ছুড়ে দেওয়া হল গোলক। সে-ও বক্ষে ধারণ করল সেই গোলক।

পরীক্ষা পর্ব চলতে লাগল। মাথার ওপরের সূর্যও পশ্চিমে এগোতে শুরু করল। মাঝে একজন রমনীর দুই বক্ষর মাঝ দিয়ে গোলক গড়িয়ে পড়ল নীচে। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রবান বৃদ্ধাঙ্গুল নীচের দিকে প্রদর্শন করলেন, তাকে অন্যপাশে দাঁড় করানো হল।

পরীক্ষাপদ্ধতিটা বোধগম্য হল রাহিলের। যে নারীর দুই স্তন ঘন সন্নিবিষ্ট, যাদের মধ্যে দিয়ে গোলক গড়িয়ে নীচে পড়ছে না তাদের

BanglaBook.org

নির্বাচন করা হচ্ছে সুরসুন্দরী রূপে। আর যাদের স্তন বিল্বের ন্যায় বর্তুলাকার বা শঙ্খের ন্যায় উদ্ভিন্ন হলেও স্তনযুগল ঘন সন্নিবিষ্ট নয় তাদের নির্বাচিত করা হচ্ছে দাসী হিসাবে। সত্যি অদ্ভুত এই বক্ষসৌন্দর্য পরিমাপের কৌশল!

অধিকাংশ নারীরাই নির্বাচিত হচ্ছে পরীক্ষায়। ক্রমশ চওড়া হচ্ছে চিত্রবানের ঠোঁটের কোণে হাসি। শুধু পুরোহিত অনুদেব আগের মতোই গম্ভীর। তিনি তীক্ষ্ণ নজরে পর্যবেক্ষণ করছেন সব কিছু আর মাঝে মাঝে শিখায় হাত দিচ্ছেন।

চলতে লাগল পরীক্ষা। মন্দিরের ছায়া পড়তে শুরু করল সামনের চত্বরে। একসময় তখন আর মাত্র দু-তিনজনের বক্ষসৌন্দর্য নির্ধারণ বাকি, রাহিলের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা অনুদেব গম্ভীর স্বরে রাহিলকে বললেন, 'এইসব সুরসুন্দরী আর দাসীর দল আজ থেকে বিকর্নার তত্ত্বাবধানে এই মন্দিরেই থাকবে। সুরসুন্দরীদের চৌষট্টি কলার বিভিন্ন মুদ্রার তালিম দেবে বিকর্না।

'মন্দিরের পিছনের কুঠুরিতে রাত্রিবাস করবে এরা। উন্মুক্ত অবস্থাতেই থাকবে, মন্দির-প্রাঙ্গণেও বিচরণ করতে পারবে যদি-না কেউ কোনও নিয়মভঙ্গ না করে, অনুশাসন মেনে চলে। কিন্তু আপনারা খেয়াল রাখবেন এদের কেউ কোনও অবস্থাতেই মন্দির থেকে পালাতে না পারে। ভাস্কর বা মজুরদের কেউও যাতে তাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে চত্বর ছেড়ে অন্যত্র না যায়। প্রয়োজনবোধে আপনার রক্ষীরা শাসন করতে পারে সুরসুন্দরীদের। চপেটাঘাত, কেশ কর্ষণ, মুষ্টাঘাতও চলতে পারে, তবে অস্ত্রাঘাত কোনও সময়ই নয়। তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাদের অঙ্গ। ভাস্কর্যর কাজে আর তাকে লাগানো যাবে না। বহু ব্যয় করে এদের এখানে আনা হয়েছে। মনে রাখবেন, এই এক-একজন সুরসুন্দরী হীরকখণ্ডের চেয়েও দামি ভাস্করদের চোখে। এ ব্যাপারগুলো অবগত করুন আপনার সেনাদের।'

প্রধান পুরোহিতের কথা শুনে রাহিল এগোতে গেল কিছুটা তফাতে রক্ষীদলের কাছে যাওয়ার জন্য। একজন দীর্ঘাঙ্গী অপরূপা সামনে এগিয়ে আসছে বৃত্তে প্রবেশ করার জন্য। এখন আর তাদের হাত ধরে টেনে

BanglaBook.org

এনে বৃত্তের মাঝখানে দাঁড় করাতে হচ্ছে না বিকর্নাকে।

নবাগতাদের প্রাথমিক শঙ্কা, মৃত্যুভয় সম্ভবত কিছুটা কেটে গেছে, ভবিতব্যকেও মেনে নিয়েছে তারা। বিকর্নার ইশারায় একে একে এসে দাঁড়াচ্ছে বৃত্তের মাঝখানে। উন্মোচিত করছে তার বক্ষবন্ধনী। আত্মসমর্পণ করছে পুরুষের দৃষ্টির কাছে। সেই শুভ্রবর্ণা অপরূপাও এগিয়ে গেল বৃত্তের দিকে। বৃত্তের ভিতর প্রবেশ করেই সে ঘুরে দাঁড়াল প্রধান ভাস্করের দিকে। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে সম্ভাষণ জানাল চিত্রবান ও অনুদেবকে উদ্দেশ্য করে। এ কাজ ইতিপূর্বে অন্য কোনও নারী করেনি। তাকে দেখে চিত্রবানদের মনে হল এতক্ষণ যাদের তাঁরা দেখেছেন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী এই নারী। মাথায় একরাশ কুঞ্চিত ঘন কৃষ্ণবর্ণের কেশদাম, গাত্রবর্ণ রক্তাভ শঙ্খের ন্যায় উজ্জ্বল, টিকালো নাসা, ফুলের পাপড়ির মতো ওষ্ঠাধার, বক্ষাবরণী যেন ধরে রাখতে পারছে না তার যৌবনকে।

ঘন সন্নিবিষ্ট স্তনযুগলের উপরিভাগে গিরি-খাদের মতো বিভাজিকার দুর্নিবার হাতছানি, ক্ষীণ কটিদেশে আবৃত স্বচ্ছ রেশমবস্ত্রকে অতিক্রম করে দৃশ্যমান হচ্ছে গভীর নাভিকূপ। মৃদঙ্গর মতো নিতম্ব, মৃণালবাহু, কদলিবৃক্ষর মতো ঊরুসম্মিলিত সেই নারীর দিকে চেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন চিত্রবান আর প্রধান পুরোহিত। এ কি মানবী নাকি স্বর্গের অপ্সরা নেমে আসছে মন্দির-প্রাঙ্গণে! কোনও উপমাতেই তার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা যায় না! তাদের বিমোহিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে যেন হাসি ফুটে উঠল সেই নারীর দীঘল হরিণী চোখে।

বৃত্তাকারে রাহিল এগোতে যাচ্ছিল তার বাহিনীর দিকে। কিন্তু সৈনিকের তৃতীয় নয়ন হঠাৎ ধরে ফেলল একটা ব্যাপার। সেই নারীর পশ্চাৎ ভাগ দেখতে পাচ্ছে রাহিল। সম্মোহনের দৃষ্টিতে প্রধান ভাস্কর আর পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে-থাকা অবস্থাতেই তার ডান হাত চলে গেছে তার নিতম্বের ওপর কোমরবন্ধে। কী যেন একটা অনুভূতি সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিল রাহিলের সৈনিকসত্তাকে।

ভিড় ঠেলে সে লাফ দিল সেই যুবতীর দিকে। সে যখন সেই যুবতীর বাহু চেপে ধরল ঠিক তখন তার হাতে উঠে এসেছে একটা ধারালো

BanglaBook.org

ছুরিকা। হিংস্র বাঘিনীর মতো জ্বলে উঠেছে তার দুই চোখ। ছুরিটা সে বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রধান ভাস্কর বা পুরোহিতের বুকে। কিন্তু পারল না, তার আগেই রাহিল মুচড়ে ধরল তার হাত।

মৃদু আর্তনাদ করে উঠল সেই যুবতী। ধাতব ছুরিকা খসে পড়ল তার হাত থেকে। কয়েক মুহূর্তর মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল সকলের। আর তারপরই বৃহন্নলা বিকর্না সেই ছুরি তুলে নিয়ে বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল সেই যুবতীর বুকে, কিন্তু তাকে আগলে দাঁড়িয়ে রাহিল তাকাল চিত্রবান আর অনুদেবের নির্দেশের অপেক্ষায়। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেছিলেন চিত্রবান, কিন্তু প্রধান পুরোহিতের চোখ কয়েক মুহূর্তর জন্য যেন হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলে উঠল। রাহিল তাদের দিকে তাকাতেই চিত্রবান তাকালেন অনুদেবের দিকে।

অনুদেবের ক্রোধ যেন হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেল। তার পরিবর্তে তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল অন্যরকম একটা হাসি। শিখাতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে তিনি বললেন, 'অরণ্যের হিংস্র বাঘিনীকে পোষ মানালে সে পালিত ব্যাঘ্র শাবকের চেয়ে ভবিষ্যতে অনেক বেশি কৌতুক প্রদর্শন করে। এই নারীকে রজ্জুবদ্ধ করে আপাতত কুঠুরিতে বন্দি করা হোক।'

তাঁর কথায় সম্মতি প্রকাশ করলেন প্রধান ভাস্কর, নিরস্ত হল বিকর্নাও। তা দেখে রাহিল একটা জিনিস অনুধাবন করতে পারল,—চিত্রবান এই কান্ডারীয় মন্দিরের প্রধান স্থপতি অথবা প্রধান ভাস্কর হতে পারেন ঠিকই, কিন্তু পুরোহিত অনুদেবের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাঁর অপেক্ষা বেশি। এখানে শেষ কথা বলেন সম্ভবত অনুদেবই।

তাঁর নির্দেশমতো মন্দিরের নিজস্ব রক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে নারীকে রজ্জুবদ্ধ করল। উপস্থিত কয়েকজন চিত্রবানের অনুচর সেই যুবতীকে নিয়ে এগিয়ে চলল মন্দিরের ভিতরে নির্দিষ্ট গন্তব্যে। সেই রমণী আর কোনও বাধা দিল না। শুধু রজ্জুবদ্ধ রক্ষীপরিবৃত অবস্থায় চলতে চলতে একবার ফিরে তাকাল রাহিলের দিকে। রাহিলের মনে হল সেই নারীর দু-চোখ দিয়ে

BanglaBook.org

যেন ঘৃণা বর্ষিত হল তার প্রতি। অসহ্য সেই দৃষ্টি। রাহিল চোখ ফেরাল অন্যদিকে।

মন্দিরের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। দূরের বিন্ধ্যপর্বতমালার আড়ালে কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য অস্ত যাবে। রক্ষীরা সেই নারীকে নিয়ে চলে যাবার পর আরও একটা কাজ বাকি ছিল অনুদেবদের। একজন একটা জ্বলন্ত কাঠকয়লাপূর্ণ পাত্র নিয়ে এল। তার ভিতর গোঁজা আছে একটা লৌহশলাকা। আর সেই শলাকার মাথায় রয়েছে চান্দেলরাজের আঁক-সম্মিলিত শিলমোহর। সার বেঁধে সুরাকন্যা ও দাসীদের দাঁড় করাল বিকর্না। আর সেই লোকটা তাদের কাছে গিয়ে তাদের পিঠে এক এক করে সম্রাট-মুদ্রার ছাপ আঁকতে শুরু করল।

উত্তপ্ত লৌহশলাকার স্পর্শে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল নারীর দল। এ-ছাপ কোনওদিন উঠবে না। মন্দিরের সম্পত্তি হিসাবে দেগে দেওয়া হল তাদের। এ-কাজ শেষ হবার পর বিকর্না তাদের সবাইকে নিয়ে চলল মন্দির-প্রাঙ্গণের পিছনের দিকে তাদের রাত্রিবাসের জায়গাতে। অবসন্ন, বিষন্ন নারীর দল ধুঁকতে ধুঁকতে অনুসরণ করল বিকর্নাকে।

রাহিল নিজেও বেশ ক্লান্ত বোধ করল। গত দু-রাত সীমান্তপ্রদেশ থেকে সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। দলের অর্ধেক সৈনিককে মন্দির-চত্বরে মোতায়েন করে বাকিদের নিয়ে চলল তাদের জন্য নির্ধারিত কক্ষে বিশ্রাম লাভের জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দির-চত্বরে অন্ধকার নেমে এল। রাহিলের রক্ষীরা মশাল জ্বালিয়ে শুরু করল মন্দির প্রহরার কাজ।

BanglaBook.org

২

ভোরবেলা কুক্কুটের ডাকে ঘুম ভাঙল রাহিলের। কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল সে। তারই মধ্যে মন্দির-চত্বরে শুনতে পেল অসংখ্য মানুষের কলরব। ক্রমশ সে শব্দ বাড়তে লাগল। সৈনিকের বর্মপোশাক পরে কোমরে শস্ত্র গুঁজে বিশ্রাম গ্রহণ করা পাঁচজন সৈনিককে নিয়ে সে যখন

মন্দিরপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল তখন অনেক লোক সমবেত হয়েছে সেখানে। গতকাল যেসব শিল্পী ভাস্করের দল মন্দির চত্বরে ছিল তাঁরা তো আছেনই তার সঙ্গে সমবেত হয়েছে কয়েকশো মজুরের দল।

প্রধান ভাস্কর চিত্রবানকেও দেখতে পেল সে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে তিনি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছেন। চাবুক হাতে কিছু অস্ত্রধারীকেও দেখতে পেল সে। তারা মন্দিরের নিজস্ব রক্ষীদল। দূরের বিন্ধ্যপর্বতমালার ওপর থেকে সূর্যালোক ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে মন্দিরনগরীতে। কুয়াশার আবরণ মুছে চারপাশে কিছুটা তফাতে তফাতে উঁকি দিচ্ছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দিরগুলোর শীর্ষদেশ। বহু প্রাচীন এ নগরী, প্রাচীন ওইসব মন্দির।

চান্দেল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রবর্মন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ নগরীর। তারপর তার বংশধররা একে একে গড়ে তোলেন এইসব মন্দির। যার সিংহভাগ নির্মিত হয়েছে মহারাজ বিদ্যাধরের পিতা মহারাজ গণ্ডবর্মন ও পিতামহ মহারাজ ঢঙ্গবর্মনের আমলে। এই কান্ডারীয় মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন মহারাজ গণ্ডবর্মন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি এমন এক মন্দির নির্মাণ করবেন যার শিখর, গঠনশৈলী, ভাস্কর্য ছাপিয়ে যাবে তাঁর পূর্বপুরুষদের যাবতীয় কীর্তিকে।

মন্দিরনগরী খর্জ্জুরবাহকের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির হবে এই কান্ডারীয় মন্দির। কিন্তু কাজ শুরু হবার আগেই মৃত্যু হল চান্দেলরাজ গণ্ডর। তার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব নিয়েছেন মহারাজ বিদ্যাধর। শুধু জেজাকভূক্তিরই নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির রূপে কান্ডারীয় মন্দিরকে গড়ে তুলছেন তিনি। হাজার বছর পরও যে স্থাপত্যের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে ভবিষ্যতের মানুষ।

মহারাজ বিদ্যাধরের এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে স্মরণ করবে এই অতুলনীয় শিল্পকীর্তির স্রষ্টা মহারাজ বিদ্যাধরকে। মাতঙ্গেশ্বর, লক্ষণ, বরাহমিহির, এসবের ওপর যুগ যুগ ধরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে কান্ডারীয় মহাদেব মন্দির। এ মন্দির যতকাল ধরার বুকে দাঁড়িয়ে থাকবে ততদিন মানুষের কাছে বেঁচে থাকবে চন্দ্রবর্মনের এই রাজবংশের নাম। মহারাজ বিদ্যাধর এই মন্দির উৎসর্গ করতে চলেছেন তাঁর আদি

BanglaBook.org

পূর্বপুরুষ মহারাজ চন্দ্রবর্মনকে।

চান্দেল মহারাজ চন্দ্রবর্মনের এখানে এই নগরী প্রতিষ্ঠানের পিছনে এক পৌরাণিক আখ্যান আছে। সৈনিক রাহিলও শুনেছে সে গল্প—প্রাচীনকালে বারাণসীর গাহিরওয়াড়রাজ ইন্দ্রজিতের গৃহদেবতার পূজারি ছিলেন হেমরাজ নামে এক ব্রাহ্মণ। তাঁর কন্যা হেমবতী ছিলেন বালবিধবা। তাঁর সঙ্গে দেহমিলনের আগেই মৃত্যু হয় তার স্বামীর। উদ্ভিন্ন যৌবনের অধিকারী হেমবতী বঞ্চিত ছিলেন পুরুষ-স্পর্শ থেকে।

এক রাতে পদ্ম সরোবরে স্নান করতে নেমেছেন হেমবতী। মাথার ওপর চন্দ্রদেব তখন বেরিয়েছেন নৈশ অভিসারে। তিনি হঠাৎ ওপর থেকে কমল সরোবরে দেখতে পেলেন সেই নগ্নিকাকে। কে এই রূপসি নারী? যাঁর যৌবনের কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে চন্দ্রালোকে প্রস্ফুটিত সেই পদ্মও? অপরূপার শুভ্র শঙ্খের মতো স্তনযুগল যেন তাকিয়ে আছে আকাশের দিকেই। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে চন্দ্রদেব নেমে এলেন মাটিতে। নগ্নিকা তখন জানু পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে আপন খেয়ালে জলক্রীড়ায় মেতে আছেন সেই সরোবরে। এমন সময় চন্দ্রদেব গিয়ে আলিঙ্গন করলেন তাকে।

পুরুষের প্রথম স্পর্শে জেগে উঠল নারী শরীর। হেমবতী তাঁর মৃণালবাহু দিয়ে চন্দ্রদেবের গলা আলিঙ্গন করলেন। মিলিত হল দুজনের ওষ্ঠ-শরীর। সারা রাত ধরে চলল সেই রতিক্রীড়া। একসময় চন্দ্রদেবের ফিরে যাবার সময় হল, সূর্যদেব উদিত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই।

চন্দ্রদেবের আলিঙ্গন-মুক্ত হতেই হেমবতীর স্মরণ হল তিনি বাল-বিধবা। চন্দ্রদেবের সঙ্গে মিলনের ফলে যে সন্তান জন্ম নেবে তার পরিচয় তিনি কী দেবেন? সমাজ তো তাঁকে ধর্মনাশিনী ব্যভিচারিণী বলবে? তিনি চন্দ্রদেবকে বললেন তাঁকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে।

চন্দ্রদেব এবার তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি এ নগরী ছেড়ে দূরে চলে যাও। এখান থেকে অনেক দূরে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে নদীঘেরা বৎসদেশে অনেক খর্জ্জুরকুঞ্জ দেখতে পাবে। সেখানে গিয়ে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেবে তুমি। আমি তোমাকে বর দিচ্ছি, অসীম তেজশালী হবে তোমার পুত্র। সে একদিন ওই খর্জ্জুরবাহক অঞ্চলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

BanglaBook.org

করবে। রাজা হবে তোমার পুত্র।' এই বলে চন্দ্রদেব আকাশে মিলিয়ে গেলেন।

হেমবতী নির্দেশ পালন করলেন চন্দ্রদেবের। তিনি চলে এলেন এই খর্জ্জুরবাহকে। জন্ম দিলেন এক পুত্রসন্তানের। তার নামকরণ করা হল চন্দ্রবর্মন।

অসীম তেজদীপ্ত সাহসী পুরুষ হিসাবে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি। কথিত আছে মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে তিনি নাকি খালি হাতে সিংহ শিকার করেন। তার শৌর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় ছোট ছোট অরণ্যচারী দলপতিরা স্মরণ নিল চন্দ্রবর্মনের। জোটবদ্ধ হল সবাই। সেই প্রাচীন বৎসদেশ তখন প্রতিহারদের সাম্রাজ্যের অধীন। চন্দ্রবর্মন বা নান্নুকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হল প্রতিহারদের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী নেতা চন্দ্রবর্মন তারপর এই খর্জ্জুরবাহক অঞ্চলেই চন্দ্রবংশের প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। চন্দ্রবর্মনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তার পুত্র জেজাক। তার সময় থেকেই এই রাজ্য পরিচিত হয় জেজাকভূক্তি নামে।

জেজাকের পর সিংহাসনে বসেন রাহিল। সৈনাধ্যক্ষ রাহিলের নামকরণ সেই রাহিলরাজের নাম অনুকরণেই। রাজা রাহিলের পর বংশপরম্পরায় একে একে সিংহাসনে বসেন রাজা হর্ষ, রাজা লক্ষণ। রাজা লক্ষণবর্মন প্রতিহারদের থেকে কলঞ্জর দুর্গ জয় করে নিয়ে প্রতিহারদের থেকে প্রকৃত অর্থে জেজাকভূক্তিকে মুক্ত করে এ অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যে স্থিতি ফিরে আসে। লক্ষণবর্মন শুরু করেন মন্দির নির্মাণের কাজ।

যদিও গত দুশো বছর ধরে এখনও প্রতিহারদের সঙ্গে বৈরতা চলছে। সীমান্ত অঞ্চলে এখনও মাঝে মাঝে হানা দেয় প্রতিহাররা, কলচুরিদের সঙ্গেও যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকে। কিন্তু তারই মধ্যে মন্দির-নির্মাণ কখনও থেমে থাকেনি। লক্ষণবর্মনের সময় থেকেই এখানে গড়ে উঠেছে একের পর এক মন্দির। মন্দিরনগরী হিসাবে গড়ে উঠেছে জেজাকভূক্তির রাজধানী খর্জ্জুরবাহক। মহারাজ বিদ্যাধরও পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গড়ে তুলছেন এই কান্ডারীয় মহাদেব মন্দির।

মন্দির-প্রাঙ্গণে টহল দিতে শুরু করল রাহিল। এবার সে এই কর্মযজ্ঞের

BanglaBook.org

ব্যাপ্তি বুঝতে পারল। অসংখ্য মজুর, অসংখ্য ভাস্করের দল একসঙ্গে কাজ করে চলেছে। কেউ কাঁধের বাঁকে পাথর ঝুলিয়ে আনছে। পাথর ভাঙছে কেউ, কেউ আবার মূর্তি নির্মাণে ব্যস্ত। হলুদ বর্ণের বেলে পাথরের মূর্তি সব।

মন্দির-প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে সিংহর সঙ্গে খালি হাতে যুদ্ধরত এক মানুষের মূর্তি। সিংহর বুকের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বাঁ-হাতে সে ধরে রেখেছে সিংহর উদ্যত থাবা আর ডান হাতে চেপে ধরেছে সিংহর টুঁটি। চান্দেল রাজবংশর প্রতীক এই মূর্তি। চান্দেলদের পতাকাতেও আঁকা থাকে এই মৌর্য মূর্তি। এ মূর্তি আসলে চান্দেলরাজদের আদি পুরুষ চন্দ্রবর্মনের মূর্তি।

ঠিক এভাবেই নাকি তিনি সিংহ শিকার করেছিলেন। এ মূর্তি আগেও অনেক জায়গাতে দেখেছে রাহিল। কিন্তু কান্ডারীয় মন্দিরের এই ভাস্কর্য যেন শিল্পীর ছোঁয়ায় একদম জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধরত সিংহ ও মানবের প্রত্যেক মাংসপেশী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সেই মূর্তিতে। এ ছাড়া মন্দির-চত্বরের বিভিন্ন জায়গাতে খোদিত হয়েছে বিভিন্ন শার্দূল মূর্তি। কল্পিত, অপার্থিব, জীবজন্তুর মূর্তি রচিত হয়েছে শিল্পীর কল্পনায়। সিংহর মস্তক, ঘোড়ার গ্রীবা, ষাঁড়ের কুজঅলা পিঠ, বাজপাখির নখরযুক্ত থাবা। অদ্ভুত সব মূর্তি!

কালো পাথরের তৈরি মূর্তি এ অঞ্চলে দেখা যায় না। কিন্তু তেমনই একটা দণ্ডায়মান পুরুষমূর্তি হঠাৎ মন্দিরচত্বরের একপাশে দেখতে পেল রাহিল। তাকে ঘিরে কাজ করছে ভাস্করের দল। কৌতূহলবশত সে এগিয়ে গেল সে জায়গাতে। একটা বর্শায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মূর্তি। কিন্তু কাছে গিয়ে সেই মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর নিজের ভুল বুঝতে পারল রাহিল।

মূর্তি নয়, সে একজন জীবন্ত মানুষ! নগ্ন হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। চোখের পাতা পর্যন্ত তার কাঁপছে না। অপরূপ অঙ্গসৌষ্ঠবের অধিকারী সেই যুবক। প্রশস্ত বুক, ক্ষীণ কটি, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে তার প্রত্যেকটা মাংসপেশি দৃশ্যমান। তার চেহারা দেখে রাহিলের মনে হল এই পাহাড়-জঙ্গল-ঘেরা দেশে যেসব আদিম অনার্য গোষ্ঠী বাস

BanglaBook.org

করে এ যুবক তাদেরই কেউ হবে।

তাকে ঘিরে থাকা ভাস্করের দল পাথরের ওপর কীলক আর হাতুড়ির আঘাতে এঁকে চলেছে তার অঙ্গসৌষ্ঠব। সূর্যালোক যেন পিছলে নামছে যুবকের তৈলাক্ত স্কন্ধ, ঊরু, নিতম্ব বেয়ে। বেশ কিছু সময় সেখানে দাঁড়িয়ে সেই যুবক আর ভাস্করদের কাজ দেখল রাহিল। সত্যিই কী অসীম অনুশীলন সেই যুবকের! একবার কী একটা ছোট পাখি তাকে পাথরের মূর্তি ভেবে তার কাঁধের ওপর বসল, তারপর আবার উড়ে গেল।

সে জায়গা ছেড়ে রাহিল এরপর ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আবার ঘুরতে লাগল মন্দির-প্রাঙ্গণে। সূর্যের তেজ ক্রমশ প্রখর হচ্ছে মাথার ওপর। ভাস্কর, মজুরদের গা বেয়ে চুঁইয়ে পড়তে শুরু করেছে স্বেদবিন্দু। তবু তার মধ্যে কাজ করে চলেছে সকলে। কেউ মূর্তি গড়ছে, কেউ পাথর ভাঙছে। ছেনি-হাতুড়ির শব্দে মুখরিত মন্দিরপ্রাঙ্গণ।

টহল দিতে দিতে একসময় আবার তাদের দেখতে পেল রাহিল। গতকাল যেসব নারীদের এখানে আনা হয়েছিল তাদেরকে। তবে সবাইকে নয় যাদের সুরাকন্যা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল তাদের। তাদের পোশাকের ভিন্নতা আজ আর নেই। তাদের সবার পরনেই নীলবর্ণের মেখলা, শুভ্র বক্ষাবরণী উন্মুক্ত পিঠে সুতো দিয়ে বাঁধা। কারুকাজ করা স্তম্ভর মাথার ওপর একটা ছাদের নীচে তাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিকর্না। সে কী সব নির্দেশ দিচ্ছে তাদেরকে। সম্ভবত তাদের স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরিয়ে মন্দির চত্বরে আনা হয়েছে তালিম দেবার জন্য। এখনও জল ঝরছে তাদের চুল বেয়ে।

সূর্যালোক চিকচিক করছে নাভিকূপে, বক্ষ বিভাজিকায় জমে থাকা জলবিন্দু। কারও কারও মুখে মৃদু বিষণ্ণতা থাকলেও আতঙ্কর ভাবটা যেন অনেকটাই কেটে গেছে। দু-একজনের ঠোঁটের কোণে যেন আবছা হাসিও ফুটে আছে। তাদের দেখে রাহিলের মনে হল একঝাঁক প্রজাপতি যেন সমবেত হয়েছে সেই ছাদের নীচে।

কাজ শুরু করে দিয়েছে বিকর্না। বিভিন্ন হস্তমুদ্রা তাদেরকে দেখাচ্ছে সে। তাকে অনুকরণ করছে সুরসুন্দরীরা। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে রাহিল দেখতে লাগল সেই দৃশ্য।

BanglaBook.org

হঠাৎ রাহিলের মনে পড়ে গেল সেই নারীর কথা। যে ছুরিকাবিদ্ধ করতে গেছিল চিত্রবান আর অনুদেবকে। তাকে কি এখানেই রাখা হয়েছে? নাকি স্থানান্তরিত করা হয়েছে অন্য কোথাও? সুরসুন্দরীদের তালিম দিতে দিতে একসময় পিছন ফিরে রাহিলকে দেখতে পেল বিকর্না। পুরু ঠোঁটে তার উদ্দেশ্যে হেসে চোখ মটকাল বিকর্না। কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হল রাহিলের। সে আর সেখানে দাঁড়াল না। মন্দিরের মূল কাঠামোকে বেড় দিয়ে এগোতে লাগল পিছনের দিকে।

মন্দিরের এ অংশে লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি অপেক্ষাকৃত কম। কিছুটা তফাতে তফাতে কয়েকজন ভাস্কর বসে নিবিষ্ট মনে তাদের কাজ করে চলেছে। রাহিলের পদশব্দ শুনে হয়তো মুহূর্তর জন্য একবার তাকাচ্ছে তার দিকে তারপর আবার কাজে মন দিচ্ছে। তাদের হাতুড়ির আঘাতে বেলেপাথরের ওপর ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে ফুল-লতাপাতার অলঙ্করণ অথবা কোনও নারীমূর্তি।

সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর তখন মন্দির-চত্বরের পিছনের অংশে পরিচিত একজনকে দেখতে পেল রাহিল। গতদিন এখানে আসার পর এ লোকটার সঙ্গে তার মৃদু পরিচয় হয়েছিল। লোকটার নাম মাহবা। অন্যদের থেকে বেশ কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে মূর্তি গড়ছেন বৃদ্ধ ভাস্কর মাহবা। কৃষ্ণবর্ণের দেহ, পরনে মালকোঁচা দেওয়া কাপড়, উন্মুক্ত পিঠের মধ্যভাগ পর্যন্ত নেমে এসেছে রুপালি কেশগুচ্ছ, অসংখ্য বলিরেখাময় মুখমণ্ডল।

রাহিলের পায়ের শব্দ পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন ভাস্কর। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করার জন্য কিছুটা তফাতে একটা পাথরের ওপর বসল রাহিল। এক পূর্ণাবয়ব অপ্সরার মূর্তি গড়ছেন ভাস্কর। নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সেই নারী। দু-হাত দিয়ে বুকের কাছে ধরা আছে একটা প্রস্ফুটিত পদ্ম। যেন সে তার হৃদয়কমল নিবেদিত করতে চলেছে কারো চরণে। অসাধারণ শিল্পসুষমামণ্ডিত মূর্তি। কঠিন পাথরে প্রাণ সঞ্চার করেছেন শিল্পী। মূর্তি নির্মাণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। বৃদ্ধ শিল্পী এখন একটা লৌহশলাকা দিয়ে ঘসে মেজে মসৃণ করছেন তার বাহুযুগল।

BanglaBook.org

কিছু সময় বসে তাঁর কাজ দেখার পর তার সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করার জন্য রাহিল বলল, 'অসম্ভব সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করেছেন আপনি।'

রাহিলের কথা কানে যেতেই লোহার পাতটা খসে পড়ল বৃদ্ধ ভাস্করের হাত থেকে। চমকে উঠে রাহিলের দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে তিনি প্রথমে বললেন, 'আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছেন?'

তারপর বললেন, 'না, আমি এ-মূর্তি নির্মাণ করিনি। এ-মূর্তি, এ-মন্দির সবকিছু নির্মাণ করেছেন জেজাকভূক্তির সম্রাট মহারাজ বিদ্যাধর।'

তার কথা শুনে মৃদু বিস্মিত হয়ে রাহিল বলল, 'এ-মন্দির মহারাজ বিদ্যাধর নির্মাণ করাচ্ছেন জানি। কিন্তু এই নারীমূর্তি তো আপনার হাতে নির্মিত। আমি সে কথাই বলছি। সম্রাট তো নিজের হাতে মন্দির, মূর্তি নির্মাণ করেননি। পরীক্ষা করার কথা কী বলছেন?'

তার কথায় বৃদ্ধ ভাস্কর বললেন, 'না, না, এ-মূর্তি সম্রাটই নির্মাণ করেছেন।'

রাহিল এবার তার কথা শুনে হেসে ফেলে বলল, 'কী বলছেন! সম্রাট নিজের হাতে পাথর কুঁদে এ-মূর্তি নির্মাণ করেছেন! এ-মূর্তি তো নির্মাণ করেছেন আপনি বা অন্য কোনও শিল্পী বা ভাস্কর।'—এ-কথা বলে রাহিল আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বৃদ্ধ ভাস্কর বেশ আতঙ্কিতভাবে বললেন, 'দোহাই আপনার চুপ করুন। এ-কথা কেউ শুনলে আমার বিপদ হবে। আর আপনিও বিপদে পড়তে পারেন।'

বিস্মিতভাবে রাহিল জানতে চাইল, 'বিপদে পড়ার মতো কী কথা বললাম আমি?'

ভাস্কর মাহবা কয়েক মুহূর্ত তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ফেরালেন অন্যদিকে। তাদের কিছুটা তফাতে একটা স্তম্ভর সামনে উবু হয়ে বসে ছোট ছোট পাথরের টুকরো ভাঙছে একজন। মাহবা তার উদ্দেশ্যে হাঁক দিলেন, 'মল্লখ, এদিকে এসো।'

ডাক শুনে লোকটা ধীর পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। তার সারা অঙ্গে ধুলো-পাথরের গুঁড়ো মাখা, মাথার চুলে জট পড়ে গেছে, সামান্য একটা বস্ত্রখণ্ড কোনওক্রমে লজ্জা নিবারণ করছে তার। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত। কিন্তু সৈন্যবেশে অস্ত্রসজ্জিত রাহিলকে দেখে

BanglaBook.org

তার সেই উদ্‌ভ্রান্ত চোখেই স্পষ্ট আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। বৃদ্ধ ভাস্কর রাহিলকে বললেন, 'আপনি ওকে কিছু একটা প্রশ্ন করুন।'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রাহিল বুঝতে পারল তার বয়স বেশি নয়। যুবকই বলা চলে তাকে। রাহিল লোকটাকে প্রশ্ন করল 'তুমি কি ভাস্কর? নাকি মজুর? কতবছর কাজ করছ এখানে?'

মুখ খুলল সেই যুবক। কিন্তু কথার পরিবর্তে তার গলা দিয়ে অস্পষ্ট গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোতে লাগল। ভালো করে খেয়াল করার পর রাহিল বুঝতে পারল যে লোকটার জিভ নেই। কিছুক্ষণ ধরে নিষ্ফলভাবে কথা বলার চেষ্টা করে থেমে গেল সেই যুবক। তার বোবা চাহনি তাকিয়ে রইল রাহিলের দিকে।

মাহবা এরপর তাকে ইঙ্গিত করল নিজের জায়গাতে ফিরে যাবার জন্য। আতঙ্কিত চোখে রাহিলের দিকে তাকাতে তাকাতে নিজের জায়গাতে ফিরে গেল সেই যুবক।

বিস্মিত রাহিল বৃদ্ধ ভাস্করকে প্রশ্ন করল, 'ও.কে.?'

মাহিবা তাকে বললেন, 'সামনের মন্দির-প্রাঙ্গণে সিংহর সঙ্গে যুদ্ধরত একটা মানবমূর্তি আছে সেটা কি আপনি দেখেছেন? রাজবংশের প্রতীক ওই মূর্তি। এই মূর্তি নির্মাণ করেছিল এই যুবক ভাস্কর। তারপর...।'

রাহিল বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি। অসাধারণ সুন্দর সেই মূর্তি আমাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু তারপর কী?'

একটু চুপ করে থাকার পর বৃদ্ধ চাপাস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, অসাধারণ সুন্দর মূর্তি। ওই মূর্তি নির্মাণ করেছিল মল্লখ-ই। মূর্তিনির্মাণ-কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর সে একদিন চিৎকার করে বলে উঠেছিল, 'দেখে যাও কী আশ্চর্য মূর্তি নির্মাণ করেছি আমি। এই মূর্তি যতদিন অক্ষত থাকবে ততদিন মানুষ স্মরণ করবে ভাস্কর মল্লখকে।' আর তারপর...।'

'তারপর কী?' ব্যাগ্র হয়ে জানতে চাইল রাহিল।

মাহবা আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধর ঠোঁটের কোণে। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'যুবক মল্লখের কথাটা কীভাবে যেন পৌঁছে গেছিল প্রধান পুরোহিত অনুদেবের কানে। হয়তো বা সম্রাট বিদ্যাধরের কানেও। সাধারণ ভাস্কর আমরা। বংশপরিচয়হীন

BanglaBook.org

অজ্ঞাত কুলশীল। একজন তুচ্ছ ভাস্কর কিনা রাজকৃতিত্বের অংশীদার হতে চায়! এই মন্দির নির্মাণের একমাত্র কৃতিত্বের অধিকারী শুধু চান্দেল সম্রাট বিদ্যাধর। আর কেউ নয়। ভাস্কর মল্লখের এই ধৃষ্টতা কেন সহ্য করবেন সম্রাট, প্রধান ভাস্কর বা পুরোহিতশ্রেষ্ঠ অনুদেব? তার এই অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি দিতে তাকে শুধু ভাস্কর থেকে মজুরে পদচ্যুতি করা হল তাই নয়, যাতে সে দ্বিতীয়বার এ কথা উচ্চারণ করতে না পারে, আর অন্য ভাস্কররাও যাতে এ কথা বলার দুঃসাহস ভবিষ্যতে না দেখাতে পারে সে জন্য প্রধান পুরোহিত অনুদেবের আদেশে জিভ কেটে নেওয়া হল মল্লখের। এখন ও পাথর ভাঙার কাজ করে।' কথাগুলো বলে মাথা নীচু করলেন বৃদ্ধ ভাস্কর। রাহিল তারই মাঝে দেখতে পেল তার দু-চোখের কোণ চিকচিক করছে।

রাহিল এবার অনুধাবন করল ব্যাপারটা। রাহিল কিশোর অবস্থাতে যোগ দিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। সৈন্যবাহিনীর নিয়মকানুন তার বিলক্ষণ জানা আছে, কিন্তু এসব অনুশাসন, রীতিনীতি তার জানা নেই।

রাহিলের দিকে আবার মুখ তুলে তাকালেন ভাস্কর। বিষণ্ণ হেসে তিনি বললেন, 'ওই যে কাছে-দূরে দেখুন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বরাহমন্দির, লক্ষণমন্দির, মাতঙ্গেশ্বর মন্দির। প্রাচীন মন্দির সব। যদি আপনি কাউকে জিগ্যেস করেন যে ওইসব কারা গড়েছেন তবে লোকে বলবে রাজা গণ্ড, রাজা চন্দ্র, রাজা লক্ষণের নাম।

লক্ষণমন্দির তো চান্দেলরাজ লক্ষণ বা যশোবর্মনের নিজের নামেই পরিচিত। শিল্পী-মজুরদের নাম কেউ জানে না, এমনকী প্রধান ভাস্করের নামও নয়। শিল্পী-মজুররা শুধু কাজ করে যাবে। যদি কোনও মানুষ ভবিষ্যতে কোনও মন্দির-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়, মনে মনে তারিফ করে বহুযুগ আগের কোনও অজানা-অনামী শিল্পীকে, তবে সেটাই স্রষ্টার একমাত্র প্রাপ্তি।'

রাহিল এরপর এ প্রসঙ্গে আলোচনা না করে বলল, 'মজুর, ভাস্কররা কি আশেপাশের গ্রাম থেকে আসেন? কাল তো এত লোক দেখিনি। আজ সব কোথা থেকে এল?'

মাহবা জবাব দিলেন, 'কাল সুরসুন্দরীদের এখানে আনা হবে বলে

BanglaBook.org

মন্দিরের কাজ বন্ধ ছিল। বহু বছর পর একদিনের জন্য ছুটি পেয়েছিল সবাই। তাই মন্দিরে লোক সমাগম কম ছিল। আমরা ভাস্কর-মজুররা সব ওখানেই থাকি।' এই বলে তিনি মন্দির-ভিত থেকে নীচের দিকে দূরে একটা জায়গা আঙুল তুলে দেখালেন।

মন্দিরের পিছন থেকে নীচে নেমে দু-পাশে উঁচু গাছের গুঁড়ির প্রাচীর দেওয়া একটা রাস্তা গিয়ে মিশেছে সেখানে। সে জায়গাও তেমনই উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত। আর তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট ছোট কুঁড়েঘর। দূর থেকে কেমন যেন বিবর্ণ, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে জায়গাটাকে। মাহবা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওখানেই মন্দির নির্মাণ শুরু হবার পর থেকে আছি আমরা।'

'আর সংসার পরিজন?'

'না ওখানে শুধু আমরাই থাকি। সংসার পরিজন আমরা যে যেখানে রেখে এসেছিলাম, হয়তো তারা সেখানেই আছে, অথবা নেই। ওই থাকার জায়গা আর এই মন্দির-চত্বর ছেড়ে আমরা কেউ বাইরে যেতে পারি না। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের হুকুম নেই কারও। প্রায় এক যুগ হয়ে গেল আমরা এমনই আছি। যতদিন না নির্মাণকার্য শেষ হয় ততদিন কেউ ঘরে ফিরতে পারব না আমরা। চান্দেলরাজের এমনই নির্দেশ। কতজন তো কাজ করতে করতে মারাই গেল। আর ঘরে ফেরা হল না তাদের। কেউ এই মন্দির-চত্বরেই মারা গেল পাথর চাপা পড়ে, কেউ আবার মারা গেল পাথরের ধুলোতে শ্বাস টেনে। অনেক পাথরের ধুলোতে বিষ থাকে।'

এ কথাগুলোর পর যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'আমাকে মার্জনা করবেন। অনেক কথা বলে ফেললাম আপনাকে। বৃদ্ধ হয়েছি তো। অনেক সময় অনেক কথা অবান্তর বলে ফেলি। দোহাই আপনার, এই কথোপকথন যেন অন্য কারও কানে না যায়। তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমারও অবস্থা হয়তো ওই মল্লখের মতো হবে।'

রাহিল তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ কথোপকথন আমি গোপন রাখব।'

তার কথা শোনার পর মাহবা আবার মনোনিবেশ করলেন নিজের

BanglaBook.org

কাজে।

রাহিল বেশ কিছু সময় ধরে একই জায়গাতে আছে। দিনের আলোতে একবার মন্দির-চত্বরটা ঘুরে দেখা দরকার। তাই সে এগোল সামনের দিকে মন্দিরের পিছনের অংশে। কিছুটা এগিয়েই একটা বাঁকের মুখে আসতেই রাহিলের কানে এল একটা কথোপকথন। কেউ একজন বলল, 'ভিতের নীচ থেকে দাঁড়িয়ে সে প্রেতমূর্তি দেখেছে বলছ?'

প্রশ্নর জবাবে কে একজন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর হবে। নীচে তখন টহল দিচ্ছিল সে। মন্দিরের শীর্ষগাত্রে ওই মূর্তির ঠিক উলটোদিকে ওই তাকের ওপর সে ওই তান্ত্রিকের প্রেতমূর্তি দেখতে পায়।'

প্রথমজন এবার উত্তরদাতাকে ধমকের সুরে বলল, 'চুপ করো। নির্ঘাত মদিরা পান করেছিল লোকটা। একথা দ্বিতীয় কারও কানে গেলে আতঙ্ক সঞ্চারিত হবে মজুর-ভাস্করদের মনে। তাতে নির্মাণকার্যের গতি ব্যাহত হবে। এজন্যই তোমাদের ওপর আর ভরসা না করে রাজসৈন্যদের মন্দিরে মোতায়েন করার বন্দোবস্ত করতে হল।'

তাদের কথা শুনতে শুনতে বাঁক ঘুরতেই রাহিল দেখতে পেল চিত্রবান আর অনুদেব একজন অস্ত্রধারীকে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের সকলের দৃষ্টি মন্দিরের পশ্চাতভাগে শীর্ষদেশের দিকে নিবদ্ধ। সেখানে অনেক উঁচুতে তাকের গায়ে একাকী দাঁড়িয়ে আছে পাথরের তৈরি এক নারীমূর্তি। এতটা নীচ থেকে তাকে অনেকটা ছোট পুতুলের মতো দেখাচ্ছে।

রাহিল তাদের মুখোমুখি হয়ে গেল। তাকে দেখামাত্রই আলোচনা থেমে গেল তাদের। ভাস্কর আর পুরোহিত একবার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে নেবার পর চিত্রবান তাকে প্রশ্ন করলেন, 'মন্দিরটা আপনি ভালো করে ঘুরে দেখে নিচ্ছেন তো?'

'হ্যাঁ, দেখছি। যদিও পুরোটা এখনও দেখা বাকি'—রাহিল জবাব দিল।

চিত্রবান এরপর প্রথমে বললেন, 'আপনার খোঁজই আমরা করছিলাম।' তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই অস্ত্রধারীকে দেখিয়ে বলল, 'এ হল প্রকটাক্ষ। মন্দিরের নিজস্ব রক্ষীবাহিনীর প্রধান।' প্রকটাক্ষর চোখ দুটো

BanglaBook.org

সত্যিই প্রকট। তার অক্ষিগোলক দুটো যেন সত্যিই অক্ষিকোটর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। সে কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। তারপর অনিচ্ছাকৃতভাবেই যেন মাথা ঝুঁকিয়ে সম্ভাষণ জানাল তাকে।

চিত্রবান এরপর বললেন, 'প্রকটাক্ষ ও তার লোকেরা রাতে মন্দির-ভিতের নীচে চারপাশে পাহারা দেবে। আর আপনারা মন্দির চত্বরে। প্রয়োজনবোধে আপনি ওদের ওপরে ডেকে নেবেন। রাতে তো আমি বা অনুদেব মন্দির-চত্বরে থাকি না। নিরাপত্তার ব্যাপারে সেসময় কোনও প্রয়োজন হলে দুজনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

পুরোহিত অনুদেব বললেন, 'বিকর্না আজ থেকে মন্দির-চত্বরে সুরসুন্দরীদের তালিম দিতে শুরু করেছে। ওদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। আর একটা কথা জানাই আপনাকে। মজুর ভাস্করদের মধ্যে কারা যেন অসন্তোষ ছড়াবার চেষ্টা করে মাঝে মাঝে। মহারাজ বিদ্যাধর তাদের এত ভালো অবস্থায় রেখেছেন তবু তাদের খুশি করা ভার। মহারাজ যশোবর্মনের আমলেতে ভাস্কর-মজুরদের পায়ে লোহার বেড়ি পরানো থাকত। সেটাই সঠিক ছিল। মহারাজ বিদ্যাধর উদার প্রকৃতির মানুষ। সেই উদারতার সুযোগ নেবার চেষ্টা করে কেউ কেউ। আপনি যদি এমন কিছু কখনও দেখেন বা শোনেন যাতে আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবেন। সম্রাটের সেবক আমরা। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মন্দির নির্মাণের কাজে নিয়োজিত আছি। মন্দির-নির্মাণ কাজে কোনও বাধা রাজদ্রোহের সামিল।'

রাহিল জবাব দিল, 'অবশ্যই।' সুরসুন্দরীদের প্রসঙ্গ ওঠায় তার মনে পড়ে গেল গতকালের সেই নারীর কথা। সে জানতে চাইল, 'সেই যুবতী কোথায়? কাল যাকে রজ্জুবদ্ধ করা হয়েছে?'

চিত্রবান বললেন, 'সে এখন ভূগর্ভস্থ কক্ষে বন্দি। সে জায়গাও আপনার দেখা দরকার। এদিকে আর একটু এগোলেই দেখবেন নীচে নামার সোপানশ্রেণি। কাল আপনার সতর্কতায় আমরা খুশি।'

রাহিল জিগ্যেস করল, 'তার ভবিষ্যত কী?'

প্রধান পুরোহিত বললেন, 'আপাতত সে ওখানেই থাকবে যতদিন সে

BanglaBook.org

সুরসুন্দরী হতে না চায়।'

ভাস্কর এবার বললেন, 'আমরা এখন অন্যত্র যাব। মন্দিরের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও আলোচনা তা সেরে নিন প্রকটাক্ষর সঙ্গে।'—এই বলে তিনি অনুদেবকে নিয়ে এগোলেন রাহিল যে পথে এসেছে সেদিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে গেল প্রধান পুরোহিত অনুদেবের খড়মের শব্দ। রাহিল তাকাল প্রকটাক্ষের দিকে। সে বিকট নয়নে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে রাহিলের দিকে। রাহিল লোকটার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলার জন্য মৃদু হাসল তার দিকে। লোকটা কিন্তু হাসল না।

সে বলল, 'এই মন্দিরের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরাই যথেষ্ট ছিলাম। আপনাদের কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণের সময় থেকেই আমরা এখানে আছি। আপনারা বহিরাগত। এখানের কিছুই আপনারা জানেন না। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তা আমাদেরই ব্যবস্থা নিতে হবে।'—এই বলে আর কোনও কথা না বাড়িয়ে সে এগোল অন্যদিকে। তার আচরণে রাহিল বুঝতে পারল যে তাদের আগমনে স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট লোকটা।

সে চলে যাবার পর আবার এগোতে শুরু করল রাহিল। কিছুটা এগিয়েই সে দেখতে পেল সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষের প্রবেশমুখ। মন্দির চাতাল থেকে সংকীর্ণ সোপানশ্রেণি নেমে গেছে নীচের দিকে। সে জায়গা একবার দেখার জন্য রাহিল নামতে শুরু করল সেই সোপানশ্রেণি বেয়ে। ভূগর্ভের এক সুড়ঙ্গে উপস্থিত হল রাহিল। এঁকে-বেঁকে সুড়ঙ্গ এগিয়েছে সামনের দিকে। আধো অন্ধকার সুড়ঙ্গ। মাঝে মাঝে কিছুটা তফাতে তফাতে দেওয়ালের গায়ে মশাল গোঁজা আছে। সেই আলোতে তার সামনের অংশ আলোকিত হলেও কেমন যেন অপার্থিব, অধিভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সুড়ঙ্গে। কোথাও কেউ নেই।

নির্জন সুড়ঙ্গ ধরে এগোতে লাগল রাহিল। কিছুটা এগোবার পরই রাহিল দেখতে পেল পথের একপাশে শাল খুঁটির গরাদ ঘেরা ছোট ছোট কক্ষ। নীচু ছাদ, তিন দিকে নিষ্প্রাণ পাথুরে দেওয়াল-ঘেরা কক্ষ। তারই একটাতে তাকে দেখতে পেল রাহিল।

প্রায় অন্ধকার সেই কক্ষের এক কোণে হাঁটু মুড়ে বসে আছে সেই

BanglaBook.org

যুবতী। রাহিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই সম্ভবত তার মৃদু পদশব্দ শুনেই চমকে উঠে তাকাল সে। রাহিলও দেখতে লাগল তাকে। কিছুক্ষণ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর রাহিল পা বাড়াচ্ছিল ফেরার জন্য। ঠিক সেই সময় উঠে দাঁড়াল সেই যুবতী। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে গরাদ ধরে সে দাঁড়াল। রাহিল ভালো করে তাকাল তার দিকে। যুবতীর চোখে আর কোনও আক্রোশ আছে বলে তার মনে হল না। কেমন যেন অসহায় দৃষ্টি জেগে আছে তার চোখের তারায়। তার সম্বন্ধে জানার জন্য রাহিল তাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কী?'

রাহিল আশঙ্কা করেছিল হয়তো এ নারী তার ভাষা বুঝতে পারবে না। কিন্তু সে মৃদুস্বরে জবাব দিল, 'মিত্রাবৃন্দা।'

অর্থাৎ সংস্কৃত বুঝতে পারে সে। অর্থাৎ খুব দূরদেশ থেকে তাকে সংগ্রহ করে আনা হয়নি। চান্দেল, কলচুরি, প্রতিহারদের অনেকেই এ ভাষায় কথা বলে। চান্দেলদের রাজভাষাও সংস্কৃত।

এরপর বিড়বিড় করে সে কী যেন বলতে লাগল রাহিলের উদ্দেশ্যে।

রাহিল তা দেখে তাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কী বলছ?'

যুবতীর কম্পিত ওষ্ঠ থেমে গেল। কয়েক মুহূর্ত রাহিলের দিকে তাকিয়ে থেকে সে হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকল। রাহিল কাষ্ঠ-শলাকার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

তাকে আরও কাছে আসার ইঙ্গিত করল সেই রমণী। যেন অতি সঙ্গোপনে সে কিছু বলতে চায় তাকে।

রাহিল একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল শলাকার সামনে। সেই নারী অপর দিক থেকে এগিয়ে এল তার কাছে। তার ওষ্ঠ, বক্ষবিভাজিকা হাত বাড়ালেই স্পর্শ করতে পারবে রাহিল। শলাকা ধরে দাঁড়াল যুবতী। ফিসফিস করে সে কী যেন বলতে শুরু করল। সে কী বলছে তা বোঝার জন্য তার মাথাটা এগিয়ে দিল শলাকার গায়ে। আর এরপরই এক কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ সেই রমণীর চোখ জ্বলে উঠল। আর তার পরমুহূর্তেই কাষ্ঠশলাকার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে সেই রমণী চেপে ধরল রাহিলের গলা।

কঠিন সেই নিষ্পেষণ। দমবন্ধ হয়ে আসছে রাহিলের। সে-ও হাত

BanglaBook.org

চেপে ধরল তার। সৈনিকের শক্তির কাছে পরাস্ত হল যুবতী। রাহিলের কণ্ঠদেশ থেকে ছিন্ন হল যুবতীর বাহু। রাহিল তারপর ধাক্কা মারল তাকে। সেই অভিঘাতে ঘরের পাথুরে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রমণী। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'কাল তুমি আমার ছুরিকাবদ্ধ হাত চেপে ধরেছিলে কেন?'

ঘটনার আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে রাহিল কঠিন স্বরে বলে উঠল, 'তুমি ভাস্কর বা পুরোহিতকে ছুরিকাঘাত করতে যাচ্ছিলে তাই। এখনও তুমি আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করলে। এর জন্য কঠিন শাস্তি হতে পারে তোমার।'

রমণী আর্তনাদ করে উঠল, 'না, আমি কাউকে হত্যা করতে চাইনি। ওই ছুরিকা আমি নিজের বুকেই বসাতে যাচ্ছিলাম।' এ কথা বলেই সে মাটি থেকে উঠে আবার ছুটে এল শলাকার কাছে। তারপর একটানে বক্ষ আবরণী খসিয়ে ফেলে বলে উঠল, 'দোহাই তোমার, তোমার ওই তলোয়ার বিদ্ধ করো আমার বুকে। আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও...।'

এ কথাগুলো বারে বারে বলতে বলতে কাষ্ঠশলাকার গায়ে মাথা ঠুকতে লাগল সেই রমণী। রাহিল হতভম্বর মতো সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা বাড়াল বাইরে যাবার জন্য। সেই হতভাগ্য নারীর ক্রন্দনধ্বনি পাক খেতে লাগল সুড়ঙ্গের নিষ্প্রাণ পাথুরে দেওয়ালে।

BanglaBook.org

৩

একপক্ষ কাল সময় কেটে গেল দেখতে দেখতে। রাহিল নিয়োজিত আছে একই কাজে। নিয়মিতভাবে তারা দিনে-রাতে টহল দেয় মন্দির-চত্বরে। মাঝে মাঝে দু-একজন ভাস্কর বা মজুরদের সঙ্গে মামুলি কথা-বার্তা হয় তার। কেউ-ই খুব বেশি বাক্যালাপ করতে চায় না। তারা এড়িয়ে চলতে চায় রাহিল আর তার রক্ষীদলকে। সম্ভবত এর পিছনে তাদের কোনও চাপা আতঙ্ক কাজ করে। কঠিন অনুশাসনে বাঁধা তাদের জীবন।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির-চত্বরে ভেরী বেজে ওঠে। সমবেত হয়

মজুরের দল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তারা নিয়োজিত থাকে নিজেদের কাজে। জোরকদমে চলছে মন্দির নির্মাণের কাজ। সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা। তারপর দিনের শেষে ধুকতে ধুকতে সার বেঁধে নিজের কুটিরে ফিরে যায় তারা। মাঝে একটা দুর্ঘটনা অবশ্য ঘটেছিল। একটা পাথরখণ্ড ভাঙতে গিয়ে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত তুলে মারা গেল এক মজুর। পাথর ভাঙতেই তার ভিতর জমে থাকা বিষবাষ্প বেরিয়ে এসেছিল। তাতেই মৃত্যু হল লোকটার।

এ ঘটনা নাকি আগেও ঘটেছে। তবে রাহিল ব্যাপারটা চাক্ষুষ করল এই প্রথম। তার চোখের সামনেই ছটফট করতে করতে মারা গেল লোকটা। তার শূন্য দৃষ্টি শুধু চেয়ে রইল আকাশের দিকে। কাজ থামিয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল মজুর-ভাস্করের দল। মৃতদেহ ঘিরে বৃত্তাকারে নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। এমন সময় খবর পেয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন চিত্রবান আর অনুদেব। মন্দির-চত্বরে শোক জ্ঞাপন নাকি শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ, সবচেয়ে বড় কথা কাজ থেমে গেছে। কাজেই তারা দুর্ঘটনাস্থল থেকে হটিয়ে দিলেন তাদের। তারপর অনুলোমের নেতৃত্বে কয়েকজন মৃতদেহের পায়ে দড়ি বেঁধে অন্য মজুরদের চোখের সামনে দিয়ে শৃগাল-কুকুরের মৃতদেহ যেমন নিয়ে যাওয়া হয় তেমনই টানতে টানতে মন্দির-চত্বরের বাইরে কোথায় যেন ফেলে এল সেই দেহটাকে। ভাস্কর-মজুরদের কেউ কোনও কথা বলেনি এ-ব্যাপারে।

রাহিলের শুধু মনে হয়েছিল সেদিন ভাস্কর-মজুরদের পাথরের গায়ে হাতুড়ি-শলাকা ঠোকার শব্দ যেন অন্যদিনের তুলনায় অনেক প্রকট শোনাচ্ছিল মন্দির-প্রাঙ্গণে। মনের ভিতরের নিষ্ফল আক্রোশকে প্রশমিত করার জন্য যেন তারা জোরে জোরে ঘা দিচ্ছিল পাথরের গায়ে। অবশ্য এ ভাবনাটা রাহিলের মনের ভুলও হতে পারে।

মন্দির-চত্বরের সর্বত্র প্রখর দৃষ্টি রেখে চলেন প্রধান ভাস্কর চিত্রবান আর অনুদেব। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কিনা, যেখানে কোনও মূর্তি বা পাথরখণ্ড স্থাপনের কথা ঠিকমতো বসানো হয়েছে কিনা, কারোর কাজের গতি শ্লথ হয়েছে কিনা,—সব ব্যাপারেই তাঁদের শ্যেনপক্ষীর তীক্ষ্ণ নজর।

BanglaBook.org

অনুদেবের পায়ের খড়মের শব্দ পেলেই সজাগ হয়ে যায় মজুর-শিল্পীর দল। তাদের দুজনের সঙ্গে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার বাক্যালাপ হয়েছে রাহিলের। অনুদেব তাকে প্রতিবারই তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছেন, বিশেষত সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে বলেছেন সেই সুরসুন্দরীদের প্রতি। খোঁজ নেবার চেষ্টা করেন মজুরদের আচরণ সম্বন্ধে। সুরসুন্দরীদের কেউ অবশ্য এখনও পর্যন্ত পালাবার দুঃসাহস দেখায়নি। ভবিতব্যকে তারা মেনে নিয়েছে, বশ্যতা স্বীকার করেছে বিকর্নার। মন্দিরের ভিতরে একটা কক্ষে তাদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিকর্না ইতিমধ্যে তাদের বেশ কিছু তালিম দিয়েছে। একদিন তাদের লজ্জাবোধ ভাঙানোর জন্য উন্মুক্ত বক্ষে শিল্পী-মজুরদের চোখের সামনে দিয়ে দ্বিপ্রহরে মন্দির প্রদক্ষিণ করানোও হল। মজুর-ভাস্করের দল যে যার কাজ থামিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে দেখল তাদের। তবে সে দৃষ্টিতে যৌনতা বা কামলালসা ছিল না, বরং তাদের দেখে কারও কারও চোখে ফুটে উঠেছিল স্পষ্ট বিষণ্ণতা। হয়তো এই নারীদের দেখে তাদের মনে পড়ে গেল বহু দিন আগে ফেলে আসা স্ত্রী, প্রেয়সী অথবা কন্যার কথাও।

ইদানীং তারা মন্দিরের মধ্যেই থাকে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশপথে সেজন্য সর্বসময় একজন সৈন্যকে অনুদেবের নির্দেশে মোতায়েন করেছে রাহিল। সাধারণত তারা দিনের বেলা খুব একটা বাইরে বেরোয় না। শুধু সূর্য ডুবে যাবার পর মজুরের দল যখন কুঁড়েতে ফিরে যায় তখন ধীরে ধীরে এক-একজন হয়তো বাইরে এসে দাঁড়ায় উন্মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেবার জন্য।

মাথার ওপর একসময় চাঁদ উঠতে শুরু করে। সেই আলো ছড়িয়ে পড়ে দূরের বনানীতে, বিন্ধ্যপর্বতমালায়। তারা তাকিয়ে থাকে সেদিকে। ওই বনানী, পর্বতমালার আড়ালে, হয়তো বা আরও অনেক দূরে একদিন যেখানে তারা ছিল, যেখানে হারিয়ে গেছে তাদের প্রিয়জনরা হয়তো ভাবে সেই জন্মভূমির কথা। উদীয়মান চন্দ্রালোকে বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে তাদের চোখে। তারপর আবার তারা ফিরে যায় অন্ধকার মন্দিরগর্ভে।

সেদিন ভোরবেলাও অন্যদিনের মতো সঙ্গীদের নিয়ে মন্দির-চত্বরে এসে

BanglaBook.org

দাঁড়াল রাহিল। সুন্দর সকাল। বিন্ধ্যপর্বতের মাথা থেকে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে অনতিদূরে খর্জ্জুর কুঞ্জেরমাথায়, আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দিরগুলোর শীর্ষদেশে। কান্ডারীয় মন্দিরের মাথার তাকগুলোতে কিছু বাজপাখির আস্তানা আছে। তারা ঝাঁক বেঁধে আকাশে পাক খাচ্ছে প্রভাতি সূর্যকিরণ ডানায় মেখে নেবার জন্য। মাঝে মাঝে তারা উড়তে উড়তে কর্কশ ডাক ছেড়ে উল্লাস প্রকাশ করছে।

মন্দির-চত্বরে শিল্পী-মজুরের দল কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগের রাতে রাহিলের যে পাঁচজন সৈনিক পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিল তারা এবার বিশ্রাম নিতে যাবে। রাহিলের আসার প্রতীক্ষায় এক জায়গাতে সমবেত হয়ে অপেক্ষা করছিল তারা। রাহিল তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রতিদিনের মতোই প্রশ্ন করল, 'নিরুপদ্রবে রাত কেটেছে তো?' সৈনিকদের মধ্যে যে সবচেয়ে প্রবীণ সেই বল্লভ নামের লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, নিরুপদ্রবেই কেটেছে। তবে একটা কথা জানানোর আছে আপনাকে।'

'কী কথা?'

রাহিল অন্যদের থেকে একটু তফাতে এসে দাঁড়াল বল্লভকে নিয়ে। বল্লভ একটু ইতস্তত করে বলল, 'যদিও ব্যাপারটা গুরুতর কিছু নয়, তবুও আপনাকে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করছি। গতকাল তখন প্রায় মধ্যরাত্রি হবে। অন্য দিনের মতোই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মন্দির-চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমরা। আকাশে মেঘ ছিল, তা মাঝে মাঝে চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছিল। অন্ধকার নেমে আসছিল মন্দির-প্রাঙ্গণে।

এমনসময় মন্দির-রক্ষীদলের একজন নীচ থেকে ওপরে উঠে এসে জানাল যে সে একজনকে নাকি দেখেছে মন্দিরের পিছনের অংশে। সামান্য লাঠির ওপর ভরসা করে সে সেখানে যেতে চাচ্ছে না। আমাকে তখনই তার সঙ্গে সেখানে যেতে হবে। সে যে নীচ থেকে চাঁদের আলোতে একজনকে মন্দিরশীর্ষের তাকের গায়ে দেখেছে সেটা হলফ করে বলল। বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। লোকটার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হলাম সে জায়গায়।

'মন্দিরের পেছনের অংশে মাথার অনেক ওপরে একটা তাক আছে। সেখানে রয়েছে এক যক্ষিনীর মূর্তি। তার কিছুটা তফাতে উলটোদিকে

BanglaBook.org

একটা তাক। সেদিকে তাকিয়ে লোকটা বলল, 'ওই তাকেই সে নাকি একজনকে দেখেছিল! আমি নীচ থেকে যতটুকু দেখা যায় সে জায়গা তা ভালো করে দেখলাম। কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না।

জায়গাটা অনেক উঁচুতে, তাছাড়া অত রাতে একাকী অত উঁচুতে কারো পক্ষে ওঠাটাও বিপজ্জনক। যদিও মন্দিরের মাথার দিকের তাকগুলোতে ছোট ছোট শার্দূলমূর্তি বসানো শুরু হয়েছে, কিন্তু আপনিও দেখেছেন যে সে সময় মজুরের দল পড়ে যাবার ভয়ে একে অপরের সঙ্গে রজ্জুবদ্ধ হয়ে ওপরে ওঠে। তার প্রান্তভাগ আবদ্ধ থাকে তাকের গায়ে। যাই হোক, বেশ কিছুক্ষণ সেই স্থানীয় রক্ষীর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি যখন চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে থাকা সেই প্রস্তরমূর্তি ছাড়া কাউকে দেখতে পেলাম না তখন আমি লোকটাকে বললাম যে এত রাতে ওখানে ওঠা কারও পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

নিশ্চই তার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে ছিল। এমনও হতে পারে যে মেঘ ও চাঁদের খেলায় ওই প্রস্তরমূর্তির ছায়া পড়েছিল উলটোদিকের তাকে। কিন্তু সে তবুও বলার চেষ্টা করল যে সে নিশ্চিতভাবেই সেখানে দেখেছে কাউকে। সে এ কথাগুলো বলার সময় এবার তার মুখ থেকে মদিরার গন্ধ টের পেলাম আমি। ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে।

'আমি তাকে তিরস্কার করে বললাম, মদিরা পান করে সে মন্দির পাহারার কাজে নিযুক্ত হয়েছে এ ব্যাপারটা আমি যথাস্থানে জানিয়ে দেব। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে গেল লোকটা। আমাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগল ব্যাপারটা যাতে কারো কাছে প্রকাশ না করি সে জন্য। বিশেষত, এ ঘটনা পুরোহিত অনুদেবের কানে গেলে তার নাকি প্রাণ সংশয় ঘটতে পারে। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বললাম, এ ব্যাপার যেন দ্বিতীয়বার না ঘটে এই শর্তে ব্যাপারটা আমি গোপন রাখব। আমার কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে এরপর চত্বর ছেড়ে নীচে চলে গেল লোকটা। কিন্তু...।

'কিন্তু কী?' জানতে চাইল রাহিল।

সৈনিক বল্লভ বলল, 'সে চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ একাকী সে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ফেরার জন্য যখন আমি পা বাড়াচ্ছি

BanglaBook.org

তখনই হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটা জিনিস। এই যে এটা—' —এই বলে বল্লভ তার পোশাকের ভিতর থেকে জিনিসটা বার করে তুলে দিল রাহিলের হাতে।

রাহিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল জিনিসটা। সূচিমুখ, ছোট অথচ ভারী লৌহশলাকা। এই শলাকা বা ছেনি দিয়ে পাথর ভাঙা নয়, পাথরের গায়ে সূক্ষ্ম অলঙ্করণ বা লেখার কাজ করে ভাস্কররা।

বল্লভ বলল, 'ওই তাকের ঠিক নীচেই মন্দির-চাতালের দুটো পাথরের ফাঁকে গেথে ছিল জিনিসটা। যেন অনেক ওপর থেকে পড়ে পাথরে গেঁথে ছিল শলাকাটা। ওই তাক থেকেই হয়তো বা জিনিসটা পড়েছে? এইজন্য মৃদু হলেও একটা সন্দেহর উদ্রেক ঘটছে আমার মনে।'

রাহিল বলল, 'আপনার কথার ইঙ্গিত আমি বুঝলাম। আপাতত ব্যাপারটা কাউকে জানানোর প্রয়োজন নেই। তবে রাত-পাহারার সময় মাঝে মাঝে গিয়ে দেখবেন ওই জায়গা। যদি কিছু নজরে আসে...।'

রাহিল এরপর বল্লভ ও রাত-পাহারায় নিযুক্ত অন্য সৈনিকদের বিশ্রামে পাঠিয়ে নতুন সৈনিকদের মন্দির-প্রাঙ্গণে নিয়োজিত করে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে মন্দির প্রদক্ষিণ করার জন্য এগোল। সে যখন মন্দিরে প্রথম এসেছিল তখন একদিন চিত্রবান, অনুদেব আর প্রকটাক্ষ একই ব্যাপার নিয়ে সন্তর্পণে আলোচনা করছিল। প্রকটাক্ষর বক্তব্য ছিল আরও এক মন্দিররক্ষী নাকি ওই তাকের ওপর কাউকে দেখেছিল!

দৈনন্দিন কাজ শুরু হয়েছে মন্দিরে। চারপাশ থেকে ভাসতে শুরু করেছে ছেনি-হাতুড়ির শব্দ। একদল মজুর আবার বেষ্টুবদ্ধ হয়ে মন্দির-গাত্রে ওঠার চেষ্টা শুরু করেছে শার্দূল বসাবার জন্য। ধীরে ধীরে থেমে থেকে সব কিছু লক্ষ করতে করতে এগোল রাহিল।

একসময় রাহিল মুখোমুখি হয়ে গেল প্রধান ভাস্কর চিত্রবানের। ব্যগ্রভাবে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন তিনি। রাহিলকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সৌজন্য বিনিময়ের পর তিনি রাহিলকে বললেন, 'আজ থেকে তিনজন সুরসুন্দরীর মূর্তি নির্মাণ শুরু হল। ব্যাপারটার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন।'

রাহিল জানতে চাইল, 'কোথায়?'

BanglaBook.org

কিছুটা তফাতে মন্দির-প্রাঙ্গণে একটা পাথুরে মণ্ডপের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে অন্তর্হিত হলেন অন্যদিকে। রাহিল কৌতূহলবশত এগোল সেদিকে।

ফুলপাতার অলঙ্করণ আঁকা স্তম্ভর মাথায় পাথরের ছাদঅলা মণ্ডপ। সেখানে উপস্থিত হয়ে রাহিল দেখতে পেল তাদের। মণ্ডপের নীচে কিছুটা তফাতে তফাতে পাথরের মূর্তির মতো নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন নারী। সম্পূর্ণ নিরাবরণ তাদের দেহ। কোথাও একটা সুতো পর্যন্ত লেগে নেই। সূর্যালোক কেড়ে নিয়েছে তাদের দেহের প্রতিটা খাঁজের গোপনীয়তা। না হলে তা ভাস্করের চোখে দৃশ্যমান হবে কীভাবে? কেমন করে সে কঠিন পাথরে ছেনির আঁচড়ে পাথরের ওপর ফুটিয়ে তুলবে সুন্দরীদের জীবন্ত প্রতিমূর্তি? নিরাবরণ দেহ হলেও রাহিল খেয়াল করে দেখল সেই নগ্নিকাদের হাতে কঙ্কণ ও পায়ে মল পড়ানো হয়েছে হয়তো বা তা মূর্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। তাদের কিছুটা তফাতে তিনটে বড় পাথরখণ্ড। তাদের আকার এমন যে তা দিয়ে পূর্ণাবয়ব মূর্তি রচনা করা যাবে সুরসুন্দরীদের। সেই পাথরের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে সামনে দণ্ডায়মান নগ্নিকাদের ছবি আঁকায় মগ্ন তিনজন প্রবীণ ভাস্কর।

ধীরে ধীরে পাথরের গায়ে ফুটে উঠছে নারীদেহের ছবি। মুখমণ্ডল, গ্রীবা, স্তন...। সুরসুন্দরীদের মাঝের জন বিম্ববতী। বিল্বফলের মতো স্তন তার। দু-পাশে দুজন শঙ্খিনী। ঘন সন্নিবিষ্ট শঙ্খর মতো স্তনযুগল। আঁকার কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন হলেই পাথর কাটার কাজ শুরু হবে। কিন্তু সেই পাথরের মূর্তি তৈরির কাজ শুরু হবার আগেই যেন পাথরের মূর্তিতে নিজেরাই রূপান্তরিত হয়েছে এই তিন নারী। তাদের তিনজনের দৃষ্টিই মাটির দিকে নিবদ্ধ। চোখের পলকও পড়ছে না। কোনও লজ্জাবোধই যেন আর কোনওদিন স্পর্শ করবে না সেই দৃষ্টিকে। নিজেদের লজ্জাবোধ খসিয়ে তারা শুধু যুগ যুগ ধরে যৌনতা জাগাবে অন্যের চোখে। নগ্ন করবে কামোদ্দীপক পুরুষের লালসাকে। মহাকাল যেন এ দায়িত্ব সঁপে দিয়েছে তাদের ওপর। তাই নগ্নিকা হয়েও পুরুষের সামনে তারা এত স্থির-অচঞ্চল।

রাহিলের আকস্মিক উপস্থিতিও কোনও প্রভাব ফেলল না তাদের

BanglaBook.org

চোখের তারায়। একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল তারা। ভাস্কররা পাথরের গায়ে এঁকে যেতে লাগল নারীদের অঙ্গসৌষ্ঠব। রাহিলের উপস্থিতি তারাও যেন গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। নিবিষ্টভাবে করে যেতে লাগল নিজেদের কাজ। রাহিল বেশ অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সেই নারীদের ও ভাস্করদের কাজ দেখল। তারপর সেই মণ্ডপ ছেড়ে বেরিয়ে আগের মতো চত্বর প্রদক্ষিণ শুরু করল। একসময় সে দূর থেকে সেই বৃদ্ধ ভাস্কর মাহবাকে দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল।

একই জায়গাতে অন্যদের থেকে কিছুটা তফাতে বসে কাজ করে লোকটা। সেদিনের কথাবার্তার পর ইতিমধ্যে আর রাহিলের সঙ্গে বাক্যালাপ হয়নি তার। যদিও চত্বরে টহল দেবার সময় প্রায় নিয়মিত প্রতিদিন পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়। রাহিলকে দেখে তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে নীরব সম্ভাষণ জানান। কখনও বা তাঁর ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি ফুটে ওঠে। তারপর আবার তিনি মনোনিবেশ করেন নিজের কাজে।

রাহিল এদিন কিন্তু তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল না। লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধ ভাস্কর মাহবা যে মূর্তি নির্মাণ করছিলেন সে কাজ সম্পন্ন হবার পর মূর্তিটাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর তার পরিবর্তে মজুরের দল সেখানে রেখে গেছে মানুষের উচ্চতার এক পাথরখণ্ড। তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাথরের গায়ে কখনও ঝুঁকে পড়ে আবার কখনও বা হাত বুলিয়ে কী যেন পরীক্ষা করছিলেন বৃদ্ধ ভাস্কর। রাহিলের পদশব্দে একবার তিনি ফিরে তাকালেন, প্রতিদিনের মতোই আবছা হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে পাথরের গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন।

রাহিল তাঁকে প্রশ্ন করল, 'এ পাথর দিয়ে কী হবে?'

তিনি জবাব দিলেন, 'সুরসুন্দরীদের মূর্তি নির্মাণ হবে। তার আগে পাথরটা পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছি পাথরে কোনও সূক্ষ্ম ফাটল আছে কিনা। মূর্তি নির্মাণ শুরু হবার পর হাতুড়ির আঘাতে সেই ফাটল প্রকট হয় তারপর মূর্তি ভেঙে যায়। কাজেই তার আগে পাথরটা ভালো করে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।' এই বলে আবার পাথরের গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন তিনি।

BanglaBook.org

রাহিলের হঠাৎ মনে হল, এই বৃদ্ধ হয়তো তাকে একটা ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারেন। ইনি তো মন্দির নির্মাণের সূচনাকাল থেকেই আছেন এখানে। তাকে প্রশ্ন করাটা সঠিক হবে কিনা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত সে বৃদ্ধ ভাস্করকে বলল, 'আপনার থেকে একটা ব্যাপার জানার ছিল আমার।'

'কী ব্যাপার? যদি জানা থাকে তবে জানাব।' পাথরের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে জবাব দিলেন তিনি।

রাহিল একটু ইতস্তত করে বলল, 'মন্দিরের পিছনের অংশে মাথার ওপরে মন্দিরের শীর্ষদেশের কাছাকাছি একটা তাকে এক যক্ষিনী অথবা অপ্সরার মূর্তি আছে। তার ঠিক উলটোদিকের তাকে নাকি মধ্যরাতে একজন মানুষ বা প্রেতাত্মাকে দেখা যায়! কেউ কেউ নাকি দেখেছে তাকে! এ ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি কোনও আলোকপাত করতে পারেন? ইতিপূর্বে ওই জায়গাকে কেন্দ্র করে কোনও ঘটনা কি ঘটেছিল?'

কথাটা কানে যেতেই মাহবা চমকে উঠে তাকালেন রাহিলের দিকে। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

রাহিল তাকে আবার প্রশ্ন করল, 'আপনি কিছু জানেন এ-ব্যাপারে?'

বৃদ্ধ ভাস্কর জবাব দিলেন, 'এ ব্যাপারে আলোচনা করা নিষেধ। প্রধান পুরোহিতের কানে গেলে শাস্তি পেতে হবে।'

রাহিল তার কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ-ব্যাপারে কেউ কিছু জানবে না।'

রাহিলের কথায় সম্ভবত আশ্বস্ত হলেন বৃদ্ধ ভাস্কর। তিনি তাকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন কিছুটা তফাতে মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকা একটা শার্দূল মূর্তির আড়ালে। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'সে বেশ অনেকদিন আগের কথা। মন্দিরের শীর্ষদেশ নির্মাণের কাজ তখন শুরু হয়ে গেছে। যে তাকে ওই নারীমূর্তি বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছে সে পর্যন্ত কাজ সঠিকভাবে হয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি উচ্চতায় পাথর গাঁথার কাজ শুরু হতেই বিপত্তি দেখা গেল। সেদিকে পাথর বসালেই অন্য কোনও অংশের পাথর খসে পড়ে। মন্দির-শিখরের একটা অংশ নির্মিত হচ্ছে তো অন্য অংশ খসে পড়ছে। কিছুতেই ঠিকভাবে বসানো যাচ্ছে না পাথর।

BanglaBook.org

নির্মাণকার্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

'মন্দিরের প্রধান স্থপতি ও ভাস্কর চিত্রবান শেষ পর্যন্ত হিসাব কষে দেখলেন মন্দির নির্মাণের ভরকেন্দ্রে গন্ডগোল হয়েছে। সূক্ষ্ম চ্যুতির কারণে সামান্য একটু হেলে গেছে ভরকেন্দ্র। ভিত্তি স্থাপনের সময় কোনও ত্রুটির কারণে বা তার কিছুদিন আগে বিন্ধ্যপর্বতাঞ্চলে ভূ-কম্পনের কারণেও ব্যাপারটা ঘটে থাকতে পারে। চিত্রবান আর প্রধান কারিগররা অনেক ভেবে, অনেক চেষ্টা করেও ব্যাপারটার সমাধান সূত্র খুঁজে পেলেন না। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, হয় মন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিতে হবে অথবা ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দির ভেঙে তা আবার নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যা প্রায় অসম্ভব কাজ। সবচেয়ে বড় কথা এই ত্রুটির পিছনে যে কারণই থাক না কেন তার দায়িত্ব বর্তাবে প্রধান স্থপতি চিত্রবান ও প্রধান পুরোহিত অনুদেবের ওপর। রাজরোষ বর্ষিত হবে তাঁদের ওপর, মৃত্যুদণ্ডও অস্বাভাবিক নয়। কাজেই তারা দুজনই সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এরপর আরও বিপদ হল। নির্মাণকাজ বন্ধ থাকলেও আপনা থেকেই পাথর খসে পড়া শুরু হয়ে গেল। ঠিক এমন সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎই একদিন এখানে উপস্থিত হলেন একজন...।'

এ পর্যন্ত বলে থামলেন ভাস্কর। শার্দূল মূর্তির আড়াল থেকে উঁকি মেরে সেদিকে কেউ আসছে কিনা দেখে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন—'আপনি হয়তো জানেন যে ওই বিন্ধ্যপর্বতমালার পাদদেশে অনেক যোগীপুরুষ থাকেন যাঁরা তন্ত্রসাধনা করেন। অনেক অলৌকিক ক্ষমতা থাকে তাঁদের। তেমনই একজন রক্তাম্বর পরিহিত শশ্রুমণ্ডিত যোগীপুরুষ এসে হাজির হলেন মন্দির-চত্বরে। তবে তার বয়স খুব একটা বেশি নয়। আর তাঁর সঙ্গে পরমা সুন্দরী এক যুবতী, তাঁর সাধন-সঙ্গিনী।

তন্ত্রসাধকরা বামাচারী হন, সাধন-সঙ্গিনীদের নিয়ে ঘোরেন। যাইহোক, সেই যোগী মন্দির-ভিতের ওপর কাঠকয়লার আঁক কষে এক অদ্ভুত কথা বললেন। মন্দিরের ভিত্তি নির্মাণের সময় বলি দেওয়া হয়েছিল চারজন অষ্টমবর্ষীয় বালককে। আর তারপর তাদের ছিন্ন মুণ্ডগুলোকে প্রোথিত করা হয়েছিল মন্দির-কাঠামোর চার কোণে চার প্রধান স্তম্ভর নীচে

BanglaBook.org

যাতে মন্দির নির্মাণে উৎসর্গীকৃত ওই বালকদের প্রেতাত্মারা ধরে থাকে মন্দির-কাঠামোকে। কিন্তু মুণ্ড প্রোথিত করার কাজ নাকি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তাই স্তম্ভের তলদেশ ছেড়ে ওই বালকদের প্রেতাত্মারা নাকি বাইরে বেরিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে মন্দিরের নির্মীয়মাণ চূড়ায়। তারা নাকি তাদের মা-দের খুঁজছে! যতদিন তারা মাতৃস্নেহ না পেয়ে হাহাকার করবে ততদিন হেলে থাকবে মন্দির, খসে পড়বে পাথর। তাদের অদৃশ্য হাহাকারে ধ্বংস হবে এই মন্দির।

'তাহলে, এর প্রতিবিধান কী?

'তান্ত্রিক বললেন, সে পথ তার জানা আছে। কোনও নারীর পাথরের মূর্তি আগে রচনা করতে হবে। সেই মূর্তি স্থাপন করতে হবে মাথার ওপরে যে পর্যন্ত মন্দির উঠেছে তেমন কোনও জায়গাতে। তারপর তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে কোনও নারীর প্রেতাত্মাকে আহ্বান করবেন তিনি। সেই প্রেতাত্মাকে তিনি আবদ্ধ করবেন মন্দিরের শীর্ষদেশে ওই প্রস্তরমূর্তিতে। সেই প্রেতাত্মা ওই চার বালকের প্রেতাত্মাকে মাতৃস্নেহ দেবে। এভাবেই সংকট মোচন হবে। তখন চিত্রবান আর অনুদেবের কাছে অন্য কোনও পথ খোলা নেই। কাজেই তারা ভাবলেন, দেখা যাক না কী হয়? তারা সম্মত হলেন যোগীর প্রস্তাবে। কিন্তু নারীমূর্তি রচনার জন্য তো নারী দরকার। কোথা থেকে তা সংগ্রহ হবে।

'দাসবাজার থেকে নারী সংগ্রহ করা তো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া তখন যুদ্ধ চলছে কলচুরিদের সাথে। সীমান্তপথ বন্ধ। অনুদেব তখন যোগীকে বাস্তব অবস্থা জানিয়ে প্রস্তাব রাখলেন যদি তার সাধন সঙ্গিনীর মূর্তি রচনা করা যায়। প্রস্তাব মেনে নিলেন সেই তান্ত্রিক। কারণ, এক পক্ষকাল পরই অমাবস্যা তিথি। সেই তিথিতেই ওই প্রস্তরমূর্তিতে প্রেতাত্মাকে আবদ্ধ করতে চান তিনি।

'কাজ শুরু হয়ে গেল। ভাস্কর চিত্রবানের নেতৃত্বে আমি আর ক'জন প্রবীণ ভাস্কর মূর্তি রচনার কাজ শুরু করলাম। জীবনে বহু সুন্দরী দেখেছি, বহু মূর্তিও রচনা করেছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী অমন সুন্দরী নারী আমি আগে আর কোনওদিন দেখিনি। সে যেন সত্যিই স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনও অপ্সরা। যাই হোক নির্দিষ্ট সময় মূর্তি নির্মাণের

BanglaBook.org

কাজ শেষ হল।

অমাবস্যার দিন সকালে তাকে স্থাপন করা হল মন্দিরগাত্রে ওই শীর্ষদেশের তাকে। যোগী সারাদিন ব্যস্ত থাকলেন অনুষ্ঠানের উপচার সংগ্রহর কাজে। দিন কেটে গেল একসময়, মজুর-শিল্পীর দল ঘরে ফিরে গেল, শুধু মন্দির-চত্বরে রয়ে গেলাম চিত্রবান সহ আমরা ক'জন ভাস্কর যারা ওই মূর্তি নির্মাণ করেছিলাম। কারণ শাস্ত্রাচারের জন্য আমাদের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল...।'

আবার একটু থামলেন বৃদ্ধ ভাস্কর। দম নিয়ে ফের বলতে শুরু করলেন, 'মন্দির-চত্বর ঢেকে গেল অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে। মধ্যরাতে ওই মূর্তি যেখানে স্থাপন করা হয়েছে ঠিক তার নীচে নরকরোটি, মদিরা ইত্যাদি নানা উপচার সাজিয়ে প্রেতাত্মাকে আহ্বান করে ওই মূর্তিতে বন্দি করার জন্য অগ্নিকুণ্ড জ্বালালেন সেই তান্ত্রিক যোগী। আর সেই কুণ্ড ঘিরে বসলাম উপস্থিত আমরা ক'জন।

'অন্ধকার রাত্রিতে যোগীর উচ্চ কণ্ঠের মন্ত্রাচ্চারণ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল মন্দির-চত্বরে। সেই শব্দে মাঝে মাঝে কর্কশ চিৎকারে ডানা ঝাপটাতে লাগল মন্দিরের তাকগুলোতে আশ্রয় নেওয়া শ্যেনপক্ষীর দল। মন্দির-চত্বরের হোমাগ্নির আলোক কীভাবে যেন ওপরে পৌঁছেছে। সেই আলোতে অস্পষ্ট দৃশ্যমান তাকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সেই নারীমূর্তি। কেমন যেন ভৌতিক পরিবেশ রচিত হল মন্দির চত্বরে।

'রাত্রি দুই প্রহরে যখন শেয়াল ডেকে উঠল তখন যজ্ঞের কাজ শেষ হল। আমাদের নরকরোটিতে মদিরা পরিবেশন করার পর যোগী বললেন, "এবার আপনারা প্রত্যেকে কোনও মৃত নারীর কথা মনে মনে চিন্তা করুন।"—এই বলে তিনি স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন অগ্নিকুণ্ডর দিকে। হয়তো তিনিও মনে মনে ভাবতে লাগলেন কোনও মৃত নারীর কথা। তিনি কোনও মৃত নারীর কথা ভাবতে বললেও আমার চোখে খালি ভেসে উঠতে লাগল সেই নারীর মুখ, যার মূর্তি রচনা করেছি আমি। ভাবলাম, দিনের পর দিন মূর্তি রচনা করার জন্য সে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যই এ ঘটনা ঘটছে। একসময় সেই যোগী অগ্নিকুণ্ডর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি এসেছ?"

BanglaBook.org

'তাঁর কথার প্রত্যুত্তরেই যেন মাটি ছেড়ে কয়েক হাত লাফিয়ে উঠল।

'যোগী এরপর বললেন, "তবে তোমাকে আমি আবদ্ধ করলাম মন্দিরশীর্ষের ওই নারী মূর্তিতে। তোমার প্রেতযোনীর আবাসস্থল হল ওই মূর্তি। যুগযুগ ধরে ওখানেই থাকবে তুমি। মাতৃস্নেহ দেবে ক্রন্দনরত শিশুপ্রেতদের।"—এই বলে তিনি তাকালেন মাথার ওপরের সেই মূর্তির দিকে।

'আমরাও তাকালাম সেদিকে। আমার দৃষ্টিবিভ্রম বা আলো-ছায়ার খেলা কিনা জানি না, নীচ থেকে আমার মনে হল তাঁর কথা শুনে মূর্তিটা যেন নড়ে উঠল। হাসি ফুটে উঠল যোগীর মুখে। প্রেতাত্মাকে ওই প্রস্তরমূর্তিতে আবদ্ধ করতে পেরেছেন তিনি। তান্ত্রিক এরপর নরকরোটিতে মদিরা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে করোটিটা মূর্তির উদ্দেশ্যে তুলে ধরে বললেন, "তোমার নাম বলো? এই সুরা তোমাকে উৎসর্গ করে তোমার তৃষ্ণামোচন করব আমি।"

'তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকুণ্ড দপ করে জ্বলে উঠে একেবারে নিভে গেল। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক। আতঙ্কে একযোগে ডানা ঝাপটে চিৎকার করে উঠল মন্দিরের তাকে বসা শ্যেনপক্ষীরা। সেই চিৎকারের মধ্যে কোনও নারীকণ্ঠ মিশে ছিল কিনা জানি না কিন্তু এরপরই সেই তান্ত্রিক যোগী হাতের করোটি ছুড়ে দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, "এ আমি কার আত্মাকে প্রতিস্থাপিত করলাম মূর্তিতে!"—এ কথা বলেই "আমার বামা কোথায়? বামা কোথায়? বলতে বলতে তার খোঁজে অন্ধকার মন্দির-চত্বরে ছুটতে শুরু করলেন।"

'একটা মশাল নিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম আমরা। অনেক খোঁজার পর শেষরাতে পাওয়া গেল তাকে। মন্দিরের ভিতর এক কুঠুরিতে পাওয়া গেল সেই রূপসির নগ্ন মৃতদেহ। তার সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন। রক্তধারা গড়িয়ে পড়ছে তার ক্ষতবিক্ষত যোনি বেয়ে। ধর্ষণের পর গলা টিপে মারা হয়েছে তাকে। প্রাথমিকভাবে সেটা কোনও মানবী লোলুপ কৃষ্ণবানরের কাণ্ড। তেমন একটা বানর খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে মন্দির-চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ধরা যাচ্ছিল না তাকে। সেটাই প্রমাণিত হত যদি-না মৃতার হাতে মিলত একটা জিনিস!' এই বলে থেমে গেলেন মাহবা।

BanglaBook.org

'সেটা কী জিনিস?' জানতে চাইল রাহিল।

একটু চুপ করে থেকে বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'একটা ছিন্ন উপবীত। হত্যাকারী ধর্ষকের চিহ্ন।'

জবাব দিয়ে রাহিলের দিকে তাকিয়ে কাহিনির শেষ অংশ বলতে শুরু করলেন বৃদ্ধ—'ওই বীভৎস দৃশ্যর দিকে স্থির হয়ে যোগী তাকিয়ে রইলেন। ভোরের আলো ফুটতেই তিনি সে জায়গা ছেড়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন, তারপর আমরা তাঁকে বাধা দেবার আগেই তিনি মন্দিরগাত্র বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন, এবং পৌঁছে গেলেন মূর্তিটা যে-তাকে বসানো হয়েছে তার উলটোদিকের তাকে। হয়তো মূর্তিটা যে-তাকে বসানো হয়েছিল সেখানেই তিনি পৌঁছোতেন কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল দুই তাকের মধ্যে হাত-কুড়ির ব্যবধান। কাজেই সে তাকে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বামার জন্য কখনও আর্তনাদ করতে লাগলেন, কখনও আবার বা অভিসম্পাত বর্ষণ করতে লাগলেন নীচে দাঁড়িয়ে-থাকা আমাদের প্রতি। তবে তারই মধ্যে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে মন্দিরশীর্ষ থেকে পাথর খসে পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

'ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই রোজকার মতো মজুর-ভাস্করের দল সমবেত হল মন্দির-প্রাঙ্গণে। তারা সমবেত হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মাথার ওপরের সেই দৃশ্য।

'একসময় মন্দিরে এসে হাজির হলেন অনুদেবও। আগের দিন তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি বললেন, "এ নির্ঘাত সেই দুষ্ট বানরের কীর্তি। মানবী-যোনির লোভে সে আক্রমণ করেছিল তাকে। বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বামার।" তিনি মৃতদেহটা জঙ্গলে ফেলে আসার ও যোগীকে নীচে নামানোর আদেশ দিলেন। মৃতদেহ বাইরে ফেলে আসা হলও ঠিকই, কিন্তু যোগীকে নীচে নামানো গেল না। কেউ তাকে নীচে নামানোর জন্য ওপরে উঠতে গেলেই তিনি ওপর থেকে পাথরখণ্ড ছুড়ে মারেন। আর তার সঙ্গে বর্ষিত হয়ে চলল অভিসম্পাত। বিশেষত, অনুদেব আর চিত্রবানের প্রতি।

'এভাবেই কেটে গেল তিনদিন, তিনরাত। একই জায়গাতে রয়ে গেলেন যোগী। পাথর খসে পড়া কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে তার

BanglaBook.org

জন্য কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। মজুররা ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেই তিনি পাথরবৃষ্টি করেন। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন অনুদেব। চতুর্থদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই অনুদেব একজন তিরন্দাজকে নিয়ে হাজির হলেন মন্দিরে। তির নিক্ষেপ করা হল তাকের ওপর যোগীকে লক্ষ্য করে। তিরবিদ্ধ যোগী মজুরদের চোখের সামনেই ছিটকে পড়লেন নীচে।

'মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তান্ত্রিকের ঠোঁটের কোণে। তিনি অনুদেবের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, "এভাবে আমাকে নামানো যাবে না। ওখানেই আমার বামার সঙ্গে থাকব আমি। তোর মৃত্যু দেখব ওপর থেকে।"—এ কথাগুলো বলার পরই আকাশে ঘূর্ণায়মান শ্যেনপক্ষীদের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল তাঁর চোখের মণি। তান্ত্রিকের দেহটা বাইরে ফেলে আসার পর ওপরে উঠে পাথর বসানোর কাজ শুরু করল মজুরের দল। আর কোনওদিন ওপর থেকে পাথর খসে পড়েনি ঠিকই, কিন্তু কোনও কোনও রাতে আজও কেউ কেউ নাকি ওই তাকে দেখতে পায় সেই যোগী তান্ত্রিককে। প্রধান পুরোহিত অনুদেবের কঠোর নির্দেশ, যে ঘটনা ঘটেছিল তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। মজুরের দল ওই তাকটাকে এড়িয়ে চলে। ওখানে কোনও প্রয়োজন থাকলে দলবদ্ধভাবে ওখানে কাজ করতে ওঠে।'—দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর কথা শেষ করলেন বৃদ্ধ ভাস্কর মাহবা।

রাহিল তাঁর উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি খবর পেয়েছি যে আমি এখানে আসার পরও নাকি মন্দির-রক্ষীবাহিনীর অন্তত দুজন নাকি দুদিন দেখেছে সেই প্রেতমূর্তি। আচ্ছা আপনি বিশ্বাস করেন এ ব্যাপারটা?'

কয়েক মুহূর্ত রাহিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বৃদ্ধ ভাস্কর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, কারণ, আমিও তাঁকে দেখেছি।'

রাহিল অবাক হয়ে গেল তার কথা শুনে। কিন্তু রাহিলকে এরপর আর কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে শার্দূল-মূর্তির আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে মাথা নীচু করে কী যেন ভাবতে ভাবতে বৃদ্ধ ভাস্কর এগোলেন তাঁর কাজের জায়গাতে রাখা পাথরটার দিকে।

BanglaBook.org

মন্দির-চত্বরেই রাহিলের দিন কাটে। প্রতিদিন সূর্যোদয় হয় বিন্ধ্যপর্বতের মাথায়। তার আলো মন্দির-প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মজুর-ভাস্কররা উপস্থিত হয় মন্দিরে। আগের মতোই চত্বর জেগে ওঠে ছেনি-হাতুড়ি, পাথরখণ্ড ঘসটে টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দে। খুব দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। আরও চারজন সুরসুন্দরীর মূর্তি নির্মাণ শুরু হয়েছে। মাহবাও একজন নগ্নিকার মূর্তি গড়ছেন। শিল্পী ভাস্কররা নিষ্প্রাণ পাথরের বুকে গড়ে তুলছেন সুন্দরীদের মূর্তি। মন্দিরের মাথার ওপর শার্দূল মূর্তি, পশুপাখিদের মূর্তি বসানোর কাজও চলছে।

রাহিল ও তার লোকেরা ঘুরে দেখে সব কিছু। রাহিল নিজেও দিনে এবং রাতে পর্যায়ক্রমে পাহারা দেয় মন্দির-চত্বরে। রাত-পাহারার সময় মাঝে মাঝে সে হাজির হয় মন্দিরের পিছনের সেই অংশে। তাকিয়ে দেখে মাথার ওপরের পাথরের তাকে দাঁড়ানো সেই মূর্তির দিকে। মাহবার মুখে শোনা গল্পটা ওই নিঃসঙ্গ মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায় তার। যদিও রাহিল সেখানে অন্য কাউকে দেখতে পায়নি কোনওদিন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে মজুরের দল, শিল্পীদের দল। তারপর শ্রান্ত শরীরে তারা ফিরে যায় নিজের কুটীরে।

প্রখর সূর্যালোকে সারাদিন উত্তপ্ত থাকে মন্দির চত্বর। মজুরদের ঘাম শুষে নেয় রুক্ষ পাথর। কিন্তু দূরে পাহাড়শ্রেণির আড়ালে সূর্য ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পাথর ঠান্ডা হতে শুরু করে। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থাকা বনাঞ্চলের থেকে বাতাস প্রবাহিত হয় মন্দিরের দিকে। দিনের এই সময়টা বড় মনোরম। নিজেদের কক্ষ ছেড়ে সেইসময় দল বেঁধে মন্দির-চত্বরে বেরিয়ে আসে সুরসুন্দরীরা। তারা এখন অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। হাতুড়ি-ছেনির শব্দ থেমে যাওয়ার পর, মজুররা চলে যাবার পর তাদের নূপুরের শব্দ বাজে মন্দির-প্রাঙ্গণে। কখনও দল বেঁধে পরিক্রমণ করে মন্দির-চত্বর, কখনও বা গোলক নিয়ে খেলা করে। দিনশেষে কলহাস্যে মুখরিত হয়ে

BanglaBook.org

ওঠে মন্দির-প্রাঙ্গণ। এমনকী তাদের দু-একজন কুশল বিনিময়ও করে রাহিল বা প্রহরারত অন্য সৈনিকদের সঙ্গেও।

সূর্য ডোবার পর আকাশে চাঁদ উঠলে তারা মন্দির-প্রাঙ্গণে থাকে আরও কিছুক্ষণ। চন্দ্রিমাও যেন ম্লান হয়ে যায় তাদের রূপের কাছে। নচেৎ তারা ফিরে যায় মন্দিরের অন্তঃপুরের কুঠুরিতে। অদ্ভুত এক আঁধার নেমে আসে মন্দির-চত্বরে। এখন শুধু মন্দির-চত্বরে মশাল হাতে পাহারা দেয় রাহিলের সেনারা। তাদের মশালের আলোতে মন্দিরের অন্ধকার কাটে না। বরং চারপাশের অন্ধকারকে যেন আরও গাঢ় বলে মনে হয় রাহিলের। অন্ধকার-আবৃত মন্দিরের স্তম্ভ, মূর্তি, মণ্ডপের আড়াল থেকে কাদের যেন দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়! হয়তো এইসব দীর্ঘশ্বাস সেইসব শিল্পী-মজুরদের। যাদের আর কোনওদিন ঘরে ফেরা হল না, যাদের অদৃশ্য হাতের ছাপ খোদিত আছে এই নির্মীয়মাণ কান্ডারীয় মন্দিরের স্তম্ভে, প্রস্তরগাত্রে, অন্ধকার গর্ভগৃহে।

মন্দিরের কঠিন পাথর শুষে নিল যাদের জীবন। রাত-পাহারার সময় এক-একদিন বেশ অস্বস্তি হয় রাহিলের। মনে হয় অন্ধকারের ভিতর থেকে কারা যেন চেয়ে আছে তার দিকে। মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকা অন্ধকার মণ্ডপগুলোতে, শার্দূল মূর্তির আড়ালে কারা যেন চাপা স্বরে কথা বলছে! তারপর একসময় ধীরে ধীরে শুকতারা ফুটে ওঠে, লাল হতে শুরু করে পূবের আকাশ, আর একটা দিন শুরু হয়। এইভাবেই কাটে রাহিলের দিন।

সেদিন দ্বিপ্রহরে মন্দির-চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল রাহিল। এখানে ওখানে নিজেদের কাজে ব্যস্ত মজুর-ভাস্করদের দল। কেউ মূর্তি গড়ছে, কেউ পাথর ভাঙছে, একদল মজুর আবার মাথার ওপর মন্দিরগাত্রে উঠে মূর্তি স্থাপন করছে। প্রচণ্ড রোদের তেজ। ঘাম ঝরছে তাদের শরীর বেয়ে।

ঘুরতে ঘুরতে রাহিল উপস্থিত হল সে জায়গাতে, যেখানে মণ্ডপের ভিতর সুরাকন্যাদের তালিম দিচ্ছে বিকর্না। কখনও নিক্কন ধ্বনি, কখনও সুন্দরীদের হাসির তরঙ্গ, কখনও বা বিকর্নার কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে মণ্ডপের ভিতর থেকে। তার কিছুটা তফাতে মন্দিরগাত্রের গা ঘেঁসে তার ছায়ায় বিশ্রাম নেবার জন্য দাঁড়াল রাহিল।

BanglaBook.org

রাহিলের ঠিক মাথার ওপরে একটা তাকে মূর্তি বসানোর কাজ করছে কয়েকজন মজুর। ছায়াতে দাঁড়িয়ে মণ্ডপের দিকে তাকিয়ে তার ভিতর থেকে ভেসে আসা কলহাস্য শুনতে শুনতে রাহিল ভাবতে লাগল এইসব নারীদের ভবিতব্য কী? মূর্তি নির্মাণের কাজ তো একদিন শেষ হয়ে যাবে, তারপর কি মুক্তি পাবে এরা? পেলেও কী সুদূর কোনও দেশে নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে পারবে এইসব নারীর দল? তাদের কি গ্রহণ করবে পরিজনরা, নাকি রূপোপজীবিনী হিসাবে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে তাদের? আবার হয়তো এমনও হতে পারে মূর্তি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবার পর আবার দাসের হাটে বেঁচে দেওয়া হবে তাদের।

রাহিল ভাবল এ ব্যাপারটা নিয়ে একবার সে জানতে চাইবে চিত্রবান বা অনুদেবের কাছে। এই নারীর দল মন্দির ত্যাগ করলে রাহিলকেও নিশ্চই আবার ফিরে যেতে হবে সীমান্ত রক্ষার কাজে। এই সুরসুন্দরীদের প্রহরার জন্যই তো রাহিল আর তার ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে এখানে। সীমান্তে ফিরে যাওয়াই তার পক্ষে ভালো। হয়তো সীমান্ত-প্রহরার কাজ অনেক বেশি বিপজ্জনক, মৃত্যু সেখানে সবসময় অনুসরণ করে সৈনিকদের, যে-কোনও সময় তির এসে বিঁধতে পারে বুকে। কিন্তু তাহলেও সেখানে কিছুটা হলেও মুক্তির আনন্দ আছে। উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে পাহাড়-জঙ্গলে বিচরণ করা যায়। কিন্তু এ জায়গাতে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে আজকাল হাঁফিয়ে উঠছে রাহিল। বিশ্রামের কুঠুরি আর মন্দির চত্বর, এর বাইরে কোথাও যেতে পারে না সে।

এক-এক সময় তার ওই সুরসুন্দরীদের মতোই বন্দি বলে মনে হয়, কখনও মনে হয় বাকি জীবনটা তাকে এই মন্দির-চত্বরেই কাটিয়ে দিতে হবে একঘেয়ে বৈচিত্রহীন জীবনের ওপর ভর করে। আবার কোনও সময় সে ভাবে, তার এই দায়িত্ব সম্পন্ন হলেই সৈন্যবাহিনীর কাজ ছেড়ে দেবে সে। সামান্য হলেও কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছে রাহিল। তা দিয়ে সে স্বাধীন কোনও জীবিকা গ্রহণ করবে, কারও সঙ্গে ঘর বাঁধবে।

রাহিলের কোনও পরিবার পরিজন নেই। কৈশোর থেকে এই যুবা বয়স পর্যন্ত সে সীমান্তেই যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েছে। সীমান্তে যখন উত্তেজনা স্তিমিত থাকে তখন সৈন্যদের ছুটি মঞ্জুর হয় ঘরে ফেরার জন্য। রাহিলের

BanglaBook.org

কোনও ঘর নেই, তার কোথাও ফেরার প্রয়োজন হয় না। সে তখন সীমান্তেই থাকে। ফিরে এসে গল্প শোনায় সৈনিকেরা। বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথা, তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা। সেসব আলোচনা শুনতে শুনতে রাহিলের তখন মনে হয় যদি কোথাও তার একটা ঘর থাকত...

এসব কথাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল রাহিল। হঠাৎ একজন সেই মণ্ডপ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে মৃদু চমকে উঠল রাহিল।

সেই নারী! যে বন্দিনী ছিল ভূগর্ভস্থ কুঠুরিতে। যে চেপে ধরেছিল রাহিলের গলা! তার নামটাও মনে পড়ে গেল রাহিলের—মিত্রাবৃন্দা। তার পরনে এখন অন্য সুরসুন্দরীদের মতোই মেখলা আর সুতো বাঁধা বক্ষবন্ধনী। সে-ঘটনার পর আর সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে যায়নি রাহিল। একজন সৈনিককে সে নিয়োজিত করেছিল তাকে দেখে আসার জন্য। সে সৈনিক তাকে এই নারীর মুক্তির ব্যাপারে কিছু জানায়নি। সম্ভবত আজই মুক্তি পেয়েছে এই নারী। অর্থাৎ সে সম্মত হয়েছে সুরসুন্দরী হতে।

মিত্রাবৃন্দা কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাহিলের দিকে। রাহিল মৃদু হাসল তার উদ্দেশ্যে। সে কিন্তু হাসল না। আগের মতোই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। রাহিল তার মনের ভাব পাঠ করতে পারল না। তবে কি এখনও রাহিলের প্রতি আক্রোশ জেগে আছে এই নারীর মনে? সেদিনের ঘটনাটা রাহিল সবার অগোচরেই রেখেছে। কারণ, ঘটনাটা চিত্রবান বা অনুদেবের ক্ষতি হতে পারত এই নারীর দ্বারা। রাহিল সেটা চায়নি। তাকে ওইভাবে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হল রাহিলের। সে অন্যদিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা।

ঝড়ের বেগে তার দিকে ছুটে এল সেই নারী। রাহিল কিছু বুঝে ওঠার আগেই সজোরে তাকে ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলল কয়েক হাত তফাতে পাথুরে মাটিতে। আর এর পরমুহূর্তেই অন্য একটা প্রচণ্ড শব্দ কানে এল রাহিলের।

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল রাহিলের। সে দেখতে পেল সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেখানেই খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ে আছে

BanglaBook.org

একটা পাথরের শার্দূল মূর্তি। মাথার ওপর মন্দিরগাত্রের তাকে ওই মূর্তিটা বসানোর কাজ করছিল মজুরেরা। রজ্জুবন্ধনী ছিন্ন হয়ে ওপর থেকে খসে পড়েছে মূর্তি। এক পলকের জন্য মৃত্যুকে পাশ কাটিয়েছে রাহিল।

শব্দ শুনে আশপাশ থেকে ছুটে এল মজুরের দল, মণ্ডপ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল বিকর্না। তার পিছন পিছন কয়েকজন সুরকন্যাও। কিন্তু ভূ-পতিত রাহিলকে উঠে দাঁড়াবার জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে গিয়েও কী দেখে যেন তারা থমকে দাঁড়াল। রাহিল অবশ্য নিজেই উঠে দাঁড়াল দ্রুত। তারপর অন্যদের দৃষ্টি অনুসরণ করে সে-ও থমকে দাঁড়াল।

রাহিল ভূ-পতিত হবার সময় চর্মবন্ধনী থেকে মুক্ত হয়ে কিছুটা দূরে ছিটকে পড়েছিল তার তলোয়ার। সেটা তুলে নিয়েছে মিত্রাবৃন্দা। কোষমুক্ত করেছে সে তলোয়ার। মিত্রাবৃন্দার দৃঢ় মুঠিতে ধরে থাকা ইস্পাতের তলোয়ার ঝিলিক দিচ্ছে সূর্যের আলোতে।

যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা সৈনিক রাহিলের তলোয়ার, যার সামান্য আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করা যায় যে-কোনও মানুষকে! তলোয়ারটা সূর্যালোকে উঁচিয়ে ধরে স্থির দৃষ্টিতে অন্যদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তলোয়ার থেকে বিচ্ছুরিত সূর্যকিরণের মতোই মিত্রাবৃন্দার চোখ জ্বলছে। সে কি আক্রমণ করবে কাউকে? এ ব্যাপারটার জন্যই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সবাই।

একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে মিত্রাবৃন্দা। অন্য সবাইও পাথরের মূর্তির মতো তাকিয়ে আছে তার দিকে। মুহূর্তর পর মুহূর্ত কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথা মাথায় এল রাহিলের। না, এই নারী আক্রমণ করবে না, তাহলে সে প্রাণ বাঁচাত না রাহিলের। তবে কি সে নিজের বুকেই বিঁধিয়ে দিতে চলেছে তলোয়ার? মুক্ত হতে চাচ্ছে তার অপমানিত লাঞ্ছিত অভিশপ্ত জীবন থেকে? এ কাজ আগে একবার করার চেষ্টা করেছিল সে। নিজের অজান্তেই যেন রাহিলের ডান হাতটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেল তাকে থামতে বলার জন্য। সেই হাতের দিকে তাকাল মিত্রাবৃন্দা।

রাহিলের উদ্যত দক্ষিণ হস্ত সে নারীর চোখে কোনও বরাভয় মুদ্রা রচনা করল কিনা তা রাহিলের জানা নেই, কিন্তু মিত্রাবৃন্দার চোখের

BanglaBook.org

দৃষ্টি কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে কোষবদ্ধ করল তলোয়ারটা। কাছে এসে সুন্দরী কোষবদ্ধ তলোয়ার তুলে দিল সৈনিকের হাতে। রাহিল দেখল মুহূর্তের জন্য তার ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি ফুটে উঠল তলোয়ারটা তার হাতে তুলে দেবার সময়। তারপর সে মাথা নত করে ধীর পায়ে বিকর্নার পাশ কাটিয়ে অন্তর্হিত হল মণ্ডপের ভিতর।

বিকর্নাও বেশ বিস্মিত ব্যাপারটাতে। রাহিল তার দিকে তাকাতেই সে একবার হাসল তার দিকে চেয়ে। তারপর করতালি দিয়ে অন্য সুরসুন্দরীদের সঙ্গী করে প্রবেশ করল মন্ডপের ভিতর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাহিলের চারপাশ ফাঁকা হয়ে গেল। মজুরের দল ফিরে গেল নিজেদের কাজে। মণ্ডপের ভিতর থেকে আবার ভেসে আসতে লাগল নুপূরের শব্দ, সুন্দরীদের চপল উচ্ছ্বাস।

বিকর্না আবার তাদের তালিম দিতে শুরু করেছে। রাহিলের একবার কেন জানি মনে হল একবার মণ্ডপের ভিতরে গিয়ে দেখে আসে সেই নারীকে। কিন্তু এ ব্যাপারটা সঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে রাহিল সে ইচ্ছা ত্যাগ করে অন্যদিকে এগোল।

রাহিল গিয়ে দাঁড়াল মন্দির-ভিতের অনুচ্চ প্রাচীরের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল ঘটনাটা। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছে সে। পাথরের মূর্তিটা ওই নারীর ওপরও পড়তে পারত তাকে ধাক্কা দেবার সময়। তাকে বাঁচাবার জন্য এতটা ঝুঁকি নিল সেই নারী! সে কি রাহিলের তলোয়ার হাতে দ্বিতীয়বার আত্মহত্যার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল? এসব কথা, আরও নানা কথা সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল রাহিল।

মাথার ওপর সূর্য হাঁটতে শুরু করল পশ্চিমে। কাছেই একটা বেদি দেখে এরপর সেখানে বসল রাহিল। সেখানে দীর্ঘসময় বসে বসে রাহিল লক্ষ রাখতে লাগল চারপাশে। একসময় সূর্যের তেজ কমে এল, ধীরে ধীরে সে মুখ লোকাতে শুরু করল পর্বতমালার আড়ালে। মন্দিরগাত্রের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হতে শুরু করল, স্তিমিত হয়ে এল মজুরদের হাঁকডাক, পাথরের ওপর লৌহকীলকের আঘাতের শব্দ। দলবদ্ধ হয়ে চত্বর ছেড়ে নিজেদের কুঁড়েতে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করল মজুরদের দল।

BanglaBook.org

মন্দিরের শীর্ষদেশের ছায়া যখন তার পা স্পর্শ করল তখন নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাহিল। কিছুটা এগোবার পরই তার ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীর সবাই এসে দাঁড়াল তার সামনে। যে পাঁচজন দিনের বেলা চত্বরে প্রহরার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল তারা ছাড়াও অন্য পাঁচজন বিশ্রামরত সৈনিক উপস্থিত হয়েছে সেখানে। পাহারা বদল হবে এবার। দিনমানে কর্তব্যরত সৈনিকদের বিশ্রামে পাঠিয়ে সামান্য কিছু কথা বলে নতুন দলকে রাত-প্রহরার কাজে নিযুক্ত করল সে।

একদল সৈনিক এদিনের মতো বিশ্রাম নেবার জন্য ফিরে গেল মন্দির সংলগ্ন সৈনিকদের জন্য নির্ধারিত কক্ষে, আর পাঁচজনের নতুন দলটা ছড়িয়ে গেল মন্দির-চত্বরের নানা প্রান্তে রাত-প্রহরার প্রস্তুতির জন্য। রাহিল নিজে কিন্তু অন্যদিনের মতো প্রথম দলের সঙ্গে বিশ্রাম নেবার জন্য ফিরল না।

সূর্য ডুবে গেছে বিন্ধ্যপর্বতমালার আড়ালে। বিদায়ী সূর্যের লাল আভাটুকু শুধু ছড়িয়ে আছে আকাশের বুকে। অরণ্যের দিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করেছে মন্দিরের দিকে। সব শব্দ থেমে গেছে। প্রায় নিস্তব্ধ পরিবেশ। বেশ মনোরম লাগছে চারপাশ। বিশ্রামকক্ষ মানেই তো বদ্ধ জায়গা। তাই সৈনিকদের সঙ্গে বিশ্রামকক্ষে না ফিরে আরও কিছু সময় বাইরে থাকার জন্য রয়ে গেল রাহিল। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই শীতল হয়ে আসছে মন্দির-প্রাঙ্গণ। শীতল হয়ে আসছে রাহিলের দেহ-মনও। ধীর পায়ে সে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল।

কিছুটা এগিয়েই সে দেখতে পেল একটা স্তম্ভের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভাস্কর চিত্রবান। তাঁর দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ। তাঁকে দেখে তার দিকে এগোল রাহিল। তাঁর কাছাকাছি পৌঁছেই সে দেখতে পেল আরও কিছুটা তফাতে নিজেদের কক্ষ ছেড়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে সুরসুন্দরীরা। এই একটা সময়ই তারা বাইরে আসে কিছু সময়ের জন্য উন্মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে, নিজেদের মতো করে সামান্য কিছু সময় অতিবাহিত করতে। তাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন চিত্রবান।

রাহিল গিয়ে দাঁড়াল তাঁর পাশে। রাহিলের দিকে তাকিয়ে চিত্রবান একবার হাসলেন, তারপর আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন ক্রীড়ারত নারীদের

BanglaBook.org

দিকে। ছোট একটা গোলক নিয়ে খেলছে ওরা। একজন ছুড়ে দিচ্ছে গোলক। মাটিতে পড়ে সেটা আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠছে। সেই গোলক ধরার জন্য ছুটছে সবাই। নূপুরের শব্দ আর সুরসুন্দরীদের হাসির মূর্ছনা সে জায়গা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। দিনশেষের আলোতে এক ক্ষুদ্র নন্দনকানন যেন সৃষ্টি হয়েছে মন্দির-চত্বরে। গোধূলি আলোতে একদল অপ্সরা যেন নেমে এসেছে মর্তের বুকে। রাহিলও ভাস্করের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সেই দৃশ্য। একসময় তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'খুব সুন্দর!'

চিত্রবানও জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর!'

এ কথা বলার পর চিত্রবান তাঁকে প্রশ্ন করল, 'আপনি সাহিত্য পাঠ করেছেন কিছু?'

তার প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হয়ে রাহিল জবাব দিল, 'না, ওসব পাঠ করার সুযোগ আমার হয়নি কোনওদিন। সামান্য অক্ষরজ্ঞান আছে। সামান্য সৈনিকের জীবনে অস্ত্র শিক্ষা ছাড়া অন্য কিছু জানার তেমন প্রয়োজন হয় না, সুযোগও হয় না। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?'

নারীদের দিকে চোখ রেখেই ভাস্কর চিত্রবান বললেন, 'আমার একসময় কাব্য পাঠের সামান্য সুযোগ ঘটেছিল। কালিদাস নামের এক প্রাচীন সংস্কৃত কবি এই গোলক নিয়ে লিখেছিলেন—'গোলক তুমি লাফাও, আরও উঁচুতে লাফাও প্রিয়ার ওষ্ঠাধার স্পর্শ করার জন্য। কিন্তু প্রতিবারই ভুল করে নীচে নেমে আসো। তোমার অন্তর্বেদনার সাক্ষী হয়ে থাকি আমি...'

সুন্দর কাব্য। কিন্তু অনুদেবের সঙ্গী স্থপতি ভাস্কর চিত্রবানের মুখে কাব্য শুনে বেশ অবাক হয়ে গেল রাহিল। হয়তো রাহিলের চোখে ফুটে ওঠা বিস্ময় ভাব লক্ষ করেই ভাস্কর চিত্রবান তাঁর জানার কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন, 'হাতুড়ি-ছেনি দিয়ে ভাস্কর্য শিক্ষার সময় আমাদের শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেই কিছু সাহিত্য পাঠ করতে হয়েছিল। বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্যের বেশ কিছু স্থানে নারী-পুরুষের অঙ্গসৌষ্ঠবের বা সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে। বিশেষত ঋষি বাৎসায়নের রচনাতে তো বহুবিধ যৌনক্রীড়ারও নিখুঁত বর্ণনা আছে। সে জন্য মূর্তি রচনার স্বার্থে বাৎসায়ন, কালিদাস

BanglaBook.org

সহ আরও কয়েকজনের রচনা আমাদের পাঠ করতে হয়েছিল। বহু প্রাচীন পাঠ। কিন্তু তার কিয়দংশ আমার এখনও মনে আছে। তবে পুনর্বার বাৎসায়ন পাঠে মনোনিবেশ করেছি আমি। এই কান্ডারীয় মন্দির হবে অনন্ত যৌবনের প্রতীক। এই মন্দিরে শুধু থাকবে যৌবনের উচ্ছ্বাস। তার প্রধান অনুসঙ্গ হিসাবে মন্দিরগাত্রে চিত্রিত হবে মিথুন মূর্তি, নগ্নিকাদের মূর্তি। শিশুক্রোড়ে মাতৃমূর্তি বা ও-ধরনের কোনও নারীমূর্তি স্থান পাবে না এখানে। ওইসব মিথুন-মূর্তি রচনার জন্য বাৎসায়ন পাঠ প্রয়োজন। এখানের কিছু প্রবীণ ভাস্কর এবং বিকর্নাও এ-পাঠে অত্যন্ত দক্ষ। এখন নগ্নিকা মূর্তি রচিত হচ্ছে, এরপর রচিত হবে মিথুনমূর্তি।'

রাহিল জানতে চাইল, 'আচ্ছা, মূর্তি রচনার পর এইসব নারীদের ভবিষ্যৎ কী?'

ভাস্কর বললেন, 'নারীদের তিনটে দল এখানে আসার কথা। একই দল দিয়ে সব মূর্তি রচনা করলে মূর্তি নির্মাণে পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এরা প্রথম দল। এদের মূর্তি নির্মাণ সম্পন্ন হবার পর মুক্তি দেওয়া হবে। তারপর আবার নতুন সুন্দরীদের দল আসবে। তাদের নির্বাচন করে আবার কাজ শুরু করবে ভাস্কররা।'

আরও দুটো দল আসবে! তার মানে আরও বেশ অনেকদিন তাদের প্রহরার কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে রাহিলকে। এ কথা ভেবে রাহিলের মন একটু বিষণ্ণ হয়ে গেলেও একটা কথা জেনে বেশ ভালো লাগল যে মুক্তি দেওয়া হবে এইসব নারীদের।

রাহিল জবাব দিল, 'মুক্তিলাভের পর এই নারীরা দল কোথায় যাবে?'

চিত্রবান জবাব দিলেন, 'বহু দূর দেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে এদের। ওসব দূর দেশে কারো পক্ষেই আর ফেরা সম্ভব নয়। রূপের জন্য এদের দু-একজনকে হয়তো বিবাহ করবে ধাঙর, কশাই, চর্মকার, ব্যাধ—এসব নিম্নশ্রেণীর লোক। তবে এদের অধিকাংশই গণিকা হবে, বার্ধ্যক্ষে ভিখারিনী। মন্দির চত্বর ত্যাগ করার পর কিন্তু এদের আর কোনওদিন প্রবেশাধিকার নেই এ মন্দিরে। ওই যে দূরে লক্ষণমন্দিরের শীর্ষদেশ দেখা যাচ্ছে ওখানে কোনওদিন গিয়ে থাকলে দেখবেন মন্দিরের নীচের চত্বরে একপাশে সার বেঁধে বসে থাকে লোলচর্ম, শীর্ণ চেহারার

BanglaBook.org

কিছু অতিবৃদ্ধা। পূণ্যার্থীদের ভিক্ষান্নে প্রতিপালিত হয় তারা। কোনও সময় হয়তো বা মন্দিরের পূজারি বা সেবকরা তাদের উদ্দেশ্যে ওপর থেকে ছুড়ে দেয় কিছু ফলমূল। মন্দির চত্বরে ওঠার অধিকার নেই তাদের। অথচ তাদের ফেলে-আসা-যৌবন কিন্তু ধরা আছে ওই মন্দিরগাত্রেই। আমাদের সামনের গোলক নিয়ে ক্রিড়ারত নারীদের কেউ কেউ হয়তো একদিন লোলচর্ম নিয়ে এসে বসবে এই কান্ডারীয় মন্দিরের সোপানশ্রেণির নীচে ওই চত্বরে।'

রাহিলের মনে পড়ে গেল মিত্রাবৃন্দার কথা। তাকেও কী একদিন লোলচর্ম নিয়ে নীচের ওই চত্বরে এসে বসতে হবে? ক্রীড়ারত নারীদের ভিড়ে সে নেই। আশেপাশে তাকিয়েও রাহিল তাকে দেখতে পেল না।

রাহিল বলল, 'এই সুন্দরীরা এখন আপনাদের বশ্যতা পুরোপুরি গ্রহণ করে নিয়েছে বলে মনে হয়। এমনকী যাকে ভূগর্ভস্থ কক্ষে বন্দি রাখা হয়েছিল তাকেও তো আজ বিকর্নার কাছে তালিম নিতে দেখলাম।'

রাহিলের কথা শুনে তার মুখের দিকে তাকালেন চিত্রবান। কেমন অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। অনেক চেষ্টা করে, অনাহারে রেখে এমনকী মৃত্যুভয় দেখিয়েও রাজি করানো যাচ্ছিল না তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুদেবের কৌশলে কাজ হল। অবশেষে রাজি হল সেই বাঘিনী।'

রাহিল জানতে চাইল, 'কী কৌশল?'

পাহাড়ের আড়ালে দিনের শেষ আলোটাও মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের চাদর ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে চারপাশ। মন্দির-চত্বরেও আঁধার নামছে। খেলা সাঙ্গ হল রমণীদের। চিত্রবান-রাহিলকে বললেন, 'আমাকে এবার ফিরতে হবে। চলুন, তার আগে আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাই অনুদেব কী কৌশলে বশ করলেন ওই নারীকে।' চিত্রবানের কথা শুনে তাকে অনুসরণ করল রাহিল।

চিত্রবান রাহিলকে এনে দাঁড় করালেন মন্দিরগাত্রের সামনে এক জায়গাতে। আবছা আলোয় জায়গাটা জেগে আছে তখনও। কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে যাবে অন্ধকারের আড়ালে। সে জায়গাতে দেওয়ালগাত্রের ভাস্কর্যগুলোর দিকে আঙুল তুলে চিত্রবান বললেন 'ভালো করে দেখুন'

BanglaBook.org

অস্পষ্ট আলোতে দেওয়ালগাত্রে ফুটে আছে মিথুন-ভাস্কর্য। না, মানব-মানবীর মিথুন নয়। ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানবীর মিথুন-ভাস্কর্য। এ ভাস্কর্য মন্দিরগাত্রে আরও বেশ কিছু জায়গাতে খোদিত আছে খেয়াল করেছে রাহিল। মানবীর সঙ্গে বানরের মিথুন, এমনকী অশ্ব, ষণ্ড, ব্যাঘ্রের সঙ্গেও মানবীর মিথুন-দৃশ্য খোদিত আছে কোথাও কোথাও। রাহিলের সামনে আঁধো-অন্ধকারে দেওয়ালগাত্রে খোদিত আছে বানরের সঙ্গে এক রমণীর মিথুন-দৃশ্য। রাহিল সেদিকে তাকাতেই চিত্রবান বললেন, 'অন্যান্য ইতরপ্রাণী শুকর, ষণ্ড, অশ্ব ইত্যাদির সঙ্গে যে মিথুন-দৃশ্য আছে সেগুলো কল্পিত হলেও এ দৃশ্য কিন্তু কল্পিত নয়। ওই পর্বতমালার পাদদেশের অরণ্যে এই বৃহৎ কৃষ্ণবানর পাওয়া যায় যার স্বভাব, দেহের গঠন অনেকটাই মানুষের মতো। লক্ষ করে দেখুন চিত্রের বানরের গোঁফ-দাড়িও অনেকটা মানুষের মতো। কেউ কেউ বলেন এ জাতীয় বানরেরা নাকি আমাদের আদি পূর্বপুরুষ। এই পুরুষবানররা যৌন সম্ভোগের জন্য মানবীকেও আক্রমণ করে। সেই জঙ্গলপ্রদেশে একা কোনও নারীকে পেলে পুরুষ বানরেরা দল বেঁধে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নারী যদি বাধা না দেয় তাহলে হয়তো তার প্রাণরক্ষা হয়। আর বাধা পেলে বানরের দল আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দেয় তাকে। ভাস্কর্যের প্রয়োজনে এ মন্দিরেও তেমন কিছু বানর আছে। মজুরদের থাকার জায়গাতে একস্থানে তাদের বন্দি রাখা আছে। তিনটি পুরুষবানর। দীর্ঘদিন ধরে মিথুন-স্বাদ থেকে বঞ্চিত তারা। ভূগর্ভে যে নারী বন্দিনী ছিল তাকে মৃত্যুভয় দেখিয়েও যখন কাজ হল না তখন অনুদেবের পরামর্শমতো ওই নারীকে হাজির করা হল এই চিত্রের সামনে। অনুদেব তাকে এই চিত্রের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে বললেন, সে যখন নগ্নিকা হতে রাজি নয় তখন তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু তার আগে ওই তিন কৃষ্ণবানরকে ছেড়ে দেওয়া হবে তার কক্ষে। আর এতেই কাজ হল, সুরসুন্দরী হতে রাজি হল ওই নারী।'

স্থপতি চিত্রবানের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আঁধারে ঢেকে গেল মন্দির-চত্বর। কথা শেষ করে চিত্রবান পা বাড়ালেন সেদিনের মতো মন্দির ত্যাগ করার জন্য। তিনি মন্দির ছেড়ে চলে যাবার পরও একই জায়গাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রাহিল। তারপর একসময় বিন্ধ্যপর্বতের

BanglaBook.org

মাথার ওপর চাঁদ উঠতে শুরু করল, আবছা আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল মন্দির-চত্বরে, রাহিল তখন নিজের কক্ষে ফেরার জন্য পা বাড়াল।

মন্দিরের যে অংশে সুরসুন্দরীদের থাকার জায়গা, যে জায়গাতে বেলাশেষের আলো মেখে গোলক নিয়ে খেলছিল নারীরা, সে জায়গার পাশ দিয়ে নিজের কক্ষে ফেরার জন্য এগোতে এগোতে মুহূর্তের জন্য একবার চত্বরের সে জায়গাটায় থমকে দাঁড়াল রাহিল। শূন্য প্রাঙ্গণ, নিজেদের কক্ষে ফিরে গেছে সুরসুন্দরীদের দল। শুধু চত্বরের এক কোণে একজনকে দেখতে পেল রাহিল। একাকী চাঁদের দিকে মুখ তুলে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে আছে সে। রাহিল তাকে চিনতে পারল—'মিত্রাবৃন্দা'।

৫

কাজ করে চলে শিল্পী, মজুরদের দল। বেশ দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। ভাস্করের দল প্রাণ সঞ্চার করছে কঠিন পাথরে। গড়ে উঠছে সুরসুন্দরীদের নগ্নিকামূর্তি। মিথুনমূর্তি নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। মাহবাসহ আরও কয়েকজন প্রবীণ ভাস্কর সুরসুন্দরীদের মূর্তি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সে-কাজেও নিযুক্ত। সাধারণত মিথুনমূর্তিগুলো রচিত হচ্ছে সূর্যোদয়ের পর কিছুসময় তারপর সূর্যাস্তের আগে। মিথুনমুদ্রায় নরনারীদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। একদণ্ড সময় তারা একটানা মিলিতভাবে থাকতে পারে। সকাল সন্ধ্যা মিলে দু-দণ্ড সময়। ওই সময়টুকু ভাস্কররা শুধু তাদের মূর্তি নির্মাণ করে। বাকি সময় তারা ব্যস্ত থাকে অন্য মূর্তি নির্মাণে।

মাঝে মাঝে মিথুনমূর্তিগুলো যেখানে নির্মিত হচ্ছে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় রাহিল। ভাস্করদের কাজ দেখে। সূর্যোদয়ের সময় মন্দির-পূর্বভাগে, সূর্যাস্তের সময় পশ্চিম প্রান্তের চত্বরে মিথুনমূর্তি নির্মাণের কাজ হয়। যাতে সূর্যালোক ভালোভাবে এসে পড়ে মিথুনরত নরনারীর ওপর। সে জায়গা দুটো পশুচর্ম দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।

যে ভাস্কররা সেখানে কাজ করছেন তারা, চিত্রবান, অনুদেব, বিকর্না

BanglaBook.org

ও সৈনাধ্যক্ষ রাহিল ছাড়া অন্যদের প্রবেশ নিষেধ ওই মিথুনমূর্তি নির্মাণের জায়গাতে। যাতে ভাস্করদের মনোসংযোগ নষ্ট না হয়, অথবা মিথুনরত যুগল কোনও অস্বস্তি বোধ না করে সে জন্যই এই ব্যবস্থা। তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে ওই জায়গাকে আবৃত করে রাখার। শ্রমিক মজুরের দল কামোদ্দীপক হয়ে উঠতে পারে ওই মিথুন-দৃশ্য দেখে। যা ভবিষ্যতে অন্য কোনও দুর্ঘটনার জন্ম দিতে পারে।

সেদিন বিকালে রাহিল মন্দির-চত্বর পরিভ্রমণ করতে করতে প্রথমে উপস্থিত হল পশ্চিম প্রাঙ্গণের সেই পশুচর্ম-ঘেরা জায়গার ভিতর। তিন জোড়া নরনারী সেখানে মিথুনরত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম যুগল দণ্ডায়মান 'ব্যায়ত সম্মুখ' মিথুন ভঙ্গিমায়, দ্বিতীয় যুগল 'জানু কর্পূরা' মিথুনরত অবস্থায় আর তৃতীয় জোড়ের পুরুষ একটা থামকে আশ্রয় করে নারীর সঙ্গে সঙ্গমরত 'অবিলম্বতক আসনে'।

তিনজন বৃদ্ধ ভাস্কর তাদের সামনে রাখা প্রস্তরখণ্ডে ফুটিয়ে তুলছেন মিথুন মূর্তি। আরও একজন সেখানে উপস্থিত, সে বিকর্না। একটা থামের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

দিনশেষের শেষ উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে তিন জোড়া মিথুনরত নরনারীর গায়ে। সোনালি-মায়াবী আলো গায়ে মেখে সঙ্গমরত নারী-পুরুষরা দাঁড়িয়ে আছে। অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক থেকে তিনজন নগ্ন পুরুষও কম সুন্দর নয়। তাদের পেশিবহুল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছে ঘর্মবিন্দু আর সূর্যালোক। এই পুরুষরাও আসলে তার সঙ্গিনীদের মতো ক্রীতদাস। শ্রমিক-মজুরদের কাজের জায়গাতেই তারা থাকে। সুরকন্যাদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য শুধু একটাই, মাঝে মাঝে মন্দির-রক্ষীবাহিনীর তত্ত্বাবধানে চত্বরের বাইরে যাবার অনুমতি মেলে।

মিথুনরত নারী-পুরুষের মূর্তিগুলোকে হঠাৎ দেখলে কারো পাথরের মূর্তি বলে ভ্রম হতে পারে। পাথরের বুকে খোদিত হবার আগে তারা নিজেরাই যেন পাথর বনে গেছে। রাহিলের খুব বিস্ময়বোধ হয় ওদের দেখলে। কীভাবে এক দণ্ড সময় অমন নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা! অনেক সময় দণ্ডায়মান অবস্থাতেই নারী অথবা পুরুষকে অপরের দেহ ভার বহন করতে হয়। ওই তো রাহিলের চোখের সামনে যে পুরুষ

BanglaBook.org

অবলম্বিতক আসন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে সেই তো তার সঙ্গিনীর নিতম্ব বেষ্টন করে তার শরীরের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছে নিজের বাহুযুগলের ওপর। অথচ সে কত স্থির, অচঞ্চল। শুধু তার বাহু চুঁইয়ে মাঝে মাঝে সোনালি ঘর্মবিন্দু নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে মাটিতে। রাহিল ঠিক বুঝতে পারে না এইসব মিথুনযুগল পরস্পরের স্পর্শে এই দণ্ডায়মান অবস্থায় কোনও রোমাঞ্চ অনুভব করে কিনা? এভাবে এতগুলো মানুষের চোখের সামনে মিলিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলেও কি তাদের রক্তে কামনার আগুন প্রবাহিত হয়? নাকি তাদের শরীর রক্ত পাথরের মতোই শীতল থাকে, কোনও উত্তেজনা প্রবাহিত হয় না তাদের শরীরে? আর তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেও ভাস্করদের চোখগুলোও কেমন যেন স্থির। তাঁদের চোখগুলো মিথুনরত নারী-পুরুষের সৌন্দর্য শুষে নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কোনও কামনার আগুন নেই। কাম যেন তাদের স্পর্শ করতে পারে না। পাথরের গায়ে শলাকা-হাতুড়ি দিয়ে কাজ করে চলেছেন তাঁরা।

রাহিল সেখানে উপস্থিত হলেও তার দিকে ভাস্কররা ফিরে তাকাল না। তাকাল শুধু একজন, বিকর্না। রাহিল বেশ কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে মিথুনরত নারী-পুরুষদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল বিকর্না একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত একটা হাসি।

আজকাল বিকর্নাকে দেখলে রাহিলের কেমন যেন অস্বস্তি হয়। বিকর্না অদ্ভুত হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকে রাহিলের দিকে। এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। একবার তার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেও রাহিল বুঝতে পারল বিকর্না তাকেই দেখছে! রাহিলের শেষ একবার চোখাচোখি হল বিকর্নার সঙ্গে। এবার বিকর্না চোখের ইশারায় কিছুটা তফাতে জানু কর্পূরা মিথুনযুগলের দিকে ইঙ্গিত করল। রাহিল সেদিকে তাকাল ঠিকই কিন্তু বিকর্না কী বলছে বুঝতে পারল না। বিকর্নার হাসিটা যেন ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। অস্বস্তিবোধের কারণে রাহিল আর সে জায়গাতে না দাঁড়িয়ে সেই ঘেরা জায়গার বাইরে বেরিয়ে আবার চত্বর প্রদক্ষিণ শুরু করল। রাহিলের চোখে পড়ল ভাস্কর আর প্রধান পুরোহিত মন্দির ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য ডুবতে শুরু করল। প্রাঙ্গণ থেকে নিজেদের

BanglaBook.org

কুঁড়েতে সার বেঁধে ফিরে চলল মজুরদের দল। চত্বর ফাঁকা হতেই নিজেদের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এল সুরসুন্দরীদের দল। সামান্য অবসরে তারা মেতে উঠল গোলক নিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে সে জায়গাতে কিছুক্ষণের জন্য থামল রাহিল, তারপর আবার এগোল সামনের দিকে। বাঁক নিয়ে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে রাহিল দেখতে পেল একাকী দাঁড়িয়ে থাকা এক নারীকে।

মন্দির-ভিতের শেষ প্রান্তে কারুকাজমণ্ডিত একটা থামের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিত্রাবৃন্দা। শেষ বিকালের কনে-দেখা-আলো এসে পড়েছে তার মুখে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন কোনও সাধারণ নারী নয়, এক অপ্সরা যেন দাঁড়িয়ে আছে সেই স্তম্ভর সামনে। সূর্যদেবও যেন বিশ্রাম নেবার জন্য অস্তমিত হতে গিয়েও হঠাৎ কয়েক মুহূর্তর জন্য থমকে দাঁড়িয়েছেন এই সুন্দরীকে দেখে, বিদায়ের আগে আরো ভালো করে তার সৌন্দর্য চাক্ষুষ করার জন্য তার শেষ আলোটুকু ছড়িয়ে দিচ্ছেন মিত্রাবৃন্দার মুখমণ্ডলে। রাহিলের তাকে দেখে আজ মনে হল যত নারীদের এখানে আনা হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী এই মিত্রাবৃন্দাই।

রাহিলের লোহার বেড়অলা ভারী পাদুকার শব্দেই সম্ভবত ফিরে তাকাল মিত্রাবৃন্দা। তার ঠোঁটের কোণে ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল। মৃদু বিষণ্ণতা থাকলেও খুব সুন্দর সেই হাসি। সেদিনের সেই মূর্তি খসে পড়ার ঘটনার পর এত কাছাকাছি রাহিলের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি তার। মাঝে কয়েকবার অবশ্য রাহিল তাকে দূর থেকে দেখেছে। কখনও অন্য নারীদের সঙ্গে বিকর্নার কাছে তালিম নিতে, কখনও আবার দিনশেষে এক ঝলকের জন্য কোথাও নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে। রাহিল মাঝে মাঝে দেখার চেষ্টা করে গোলক নিয়ে ক্রীড়ারত নারীদের ভিড়ে সে আছে কিনা? কিন্তু সেখানে সে থাকে না।

রাহিল কিছুক্ষণ আগে মন্দিরের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে দেখেছে চিত্রবান আর অনুদেব মন্দির-চত্বর ছেড়ে চলে গেলেন। ভাস্কর-মজুরদের দলও প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করেছে।

চত্বরে এখন শুধু আছে গোলক নিয়ে ক্রীড়ারত সুরসুন্দরীরা। তারা সচরাচর এদিকে আসে না। তাদের চলাচল সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে

BanglaBook.org

তাদের বাসস্থানের সম্মুখে মন্দির-প্রাঙ্গণের সেই ক্ষুদ্র অংশে যেখানে গোলক নিয়ে খেলা করে তারা। মিত্রাবৃন্দার সঙ্গে বাক্যালাপ করলে এই মুহূর্তে তা কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। যদিও এ ব্যাপারে রাহিলের ওপর কোনও বিধিনিষেধ আরোপিত নেই। তবু...

মিত্রাবৃন্দার কাছ থেকে একটা বিষয় জানার আছে রাহিলের। একটু ইতস্তত করে রাহিল কয়েক-পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে। তারপর তার সঙ্গে বাক্যালাপ শুরুর উদ্দেশ্যে বলল, 'গোলক নিয়ে ক্রীড়ারত নারীদের সঙ্গে তুমি থাকো না কেন? তুমি কি ক্রীড়ায় আগ্রহী নও?'

মিত্রাবৃন্দা হেসে জবাব দিল, 'আমার একা থাকতেই ভালো লাগে।'

রাহিল তার জবাব শুনে মৃদু হাসল। তারপর বলল, 'অন্য নারীরা তো গোলক নিয়ে একসঙ্গে আমোদ করে। তোমার একা থাকতে ভালো লাগে কেন?'

মিত্রাবৃন্দা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'ওরা ওদের ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছে।'

'আর তুমি? তুমি মানোনি?' জানতে চাইল রাহিল।

এ-প্রশ্নর জবাব দিল না মিত্রাবৃন্দা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি এখানে "মাহবা" নামের কোনও ভাস্করকে চেনো?'

রাহিল প্রশ্নটা শুনে কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, চিনি। কিন্তু, কেন?'

মিত্রাবৃন্দা বলল, 'বিকর্না বলেছে আগামীকাল থেকে ওই ভাস্কর আমার মূর্তি রচনা করবেন সূর্যোদয় থেকে।' মৃদু শঙ্কার রেশ ফুটে উঠল তার কণ্ঠে। হাসিটা মুছে গেল। বিষণ্ণতা ফুটে উঠল তার চোখের তারায়।

রাহিল একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, 'ভাস্কর মাহবা বৃদ্ধ মানুষ। বেশ ভালো মানুষ। তার দিক থেকে তোমার কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।'

রাহিলের কথা শুনে মিত্রাবৃন্দা কিছুটা আশ্বস্ত হল বলে মনে হল রাহিলের। মিত্রাবৃন্দার ঠোঁটের কোণে মুছে যাওয়া হাসিটা আবার ধীরে ধীরে ফুটে উঠল। সে রাহিলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, 'সৈনিক, এ মন্দিরে কতকাল আছ?'

রাহিল জবাব দিল, 'তোমার মতোই মাসাধিক কাল। যেদিন তোমাদের

BanglaBook.org

এখানে আনা হল সেদিন প্রত্যুষেই আমিও এখানে উপস্থিত হয়েছি সীমান্তপ্রদেশ থেকে। মহাসৈনাধ্যক্ষ উগ্রায়ুধ নির্দেশ পাঠালেন এখানে আসার। চলে এলাম। ভ্রাম্যমান জীবন সৈনিকদের। যেখানে যাবার নির্দেশ পাই সেখানে যাই। তবে এতদিন সীমান্তের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটেই কেটেছে। মন্দিরের কাজে এই প্রথম নিযুক্ত হলাম।'

'তোমার ঘর? পরিবার?' জানতে চাইল মিত্রাবৃন্দা।

তার এই প্রশ্নটা এখানে কেউ তাকে করেনি। মৃদু হেসে রাহিল বলল, 'ওর কোনওটাই আমার নেই। বহুদিন আগে একবার কলচুরিরা সীমান্ত অতিক্রম করে দখল করে নিয়েছিল এ রাজ্যের কিয়দংশ। এই খর্জ্জুরবাহক বা কাজুরাহোর সিংহাসনে তখন মহারাজ বিদ্যাধরের পিতা মহারাজ গণ্ডবর্মন। তিনি তাদের বিতাড়ন করলেন ঠিকই, কিন্তু পশ্চাদপসরণের সময় কলচুরিরা তাদের অধিগৃহীত গ্রামগুলোকে জ্বালিয়ে দিল, সমর্থ পুরুষদের হত্যা করল, নারীরা ধর্ষিতা হল, ছোট ছোট শিশুদের ধরে নিয়ে যাওয়া হল দাস-হাটে বিক্রি করার জন্য। অবশ্য এসব ব্যাপার বোঝার মতো বয়স আমার তখন ছিল না। কথাগুলো আমি পরে আমার প্রতিপালকের মুখে শুনেছি। সে ছিল একজন সৈনিক। গণ্ডরাজের সৈনিকদের সঙ্গে কলচুরিদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে এক বনাঞ্চলে সওয়ারীবিহীন এক ঘোটকের পিঠে বাঁধা চামড়ার থলি থেকে সে উদ্ধার করে আমাকে। তখন আমার বছর দুই বয়স হবে। পরিজনহীন সেই সৈনিক প্রতিপালন করে আমাকে। 'আরোহী' বা 'রাহী'হীন অশ্বে আমাকে পাওয়া যায় বলে আমার নাম হয় রাহিল। চোদ্দো বছর বয়সে সে আমাকে সেনাদলে ভর্তি করে দেয়। এর কিছুদিনের মধ্যে সেই বৃদ্ধ সৈনিকেরও মৃত্যু হয়। আমি ঘুরে বেড়াতে থাকি যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা সীমান্ত প্রহরার কাজে। এই সেনাদলেও দেখতে দেখতে এক যুগ কেটে গেল। আমার কোনও ঘর নেই। যখন যেখানে পাঠানো হয় সেখানে যাই...'

নিজের কথা শেষ করে রাহিল তাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার ঘর কোথায়? তুমি কীভাবে উপস্থিত হলে এখানে?'

বিন্ধ্যপর্বতের মাথায় সূর্য ডুবে গেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে মন্দির-প্রাঙ্গণে। স্তম্ভ, মূর্তির নীচে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে

BanglaBook.org

অন্ধকার। মিত্রাবৃন্দার মুখের উজ্জ্বলতাও ম্রিয়মান হয়ে আসছে। গোলক নিয়ে ক্রীড়ারত নারীদের অস্পষ্ট কোলাহলের শব্দও থেমে গেছে। রাহিলের প্রশ্ন শুনে মন্দিরগাত্রের কোণের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'তুমি সোমনাথ নগরীর নাম শুনেছ?'

রাহিল জবাব দিল, 'হ্যাঁ, শুনেছি। সে তো অনেক দূরদেশ, শুনেছি সেখানে বিশাল এক মন্দির আছে।'

রাহিলের কথা শুনে মুহূর্তর জন্য যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিত্রাবৃন্দার মুখ। সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, স্বর্ণখচিত বিশাল মন্দির। সোমনাথ মন্দির। সে মন্দিরের নামেই নগরীরও নামকরণ। এ মন্দিরের চেয়েও অনেক অনেক বিশাল মন্দির!'

রাহিলের মনে হল, একথা বলার সময় মিত্রাবৃন্দার চোখে যেন ভেসে উঠল রাহিলের অদেখা সেই মন্দিরের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কথাগুলো বলেই আবার থেমে গেল মিত্রাবৃন্দা। নিষ্প্রভ হয়ে এল তার চোখের দ্যুতি।

রাহিল বলল, 'কী বলছিলে সেই মন্দিরের ব্যাপারে?'

মিত্রাবৃন্দা বলল, 'হ্যাঁ, ওই মন্দিরেই থাকতাম। আরও অনেক মানুষ-লোকজন সেখানে থাকত। প্রতিদিন হাজারে হাজারে মানুষের সমাগম হত সেখানে। আমার বাবা ছিলেন মন্দিরের সেবায়েত পূজারি ব্রাহ্মণ। এক সহস্র ব্রাহ্মণ নিয়োজিত ছিল সেই মন্দিরের কাজে। আমরা নারীরা সেখানে ফুল সঞ্চয় করতাম, মালা গাঁথতাম, নৃত্যগীত করতাম, তবে আমরা দেবদাসী ছিলাম না। আমরা স্বাধীন ছিলাম সেই রত্নখচিত মন্দিরে। সেখানে গর্ভগৃহে একটা বিশাল সোনার শিকল ছিল। তার ওজন পাঁচ মন। সেই শিকল ঘণ্টার কাজ করত। সেই শিকল বাজিয়ে সূর্যোদয়ের আগে ব্রাহ্মণদের ঘুম ভাঙাতেন প্রধান পুরোহিত। আর সে শেকল বাজানো হত সন্ধ্যারতির সময়। একদিন মাঝরাতে বেজে উঠল সেই স্বর্ণশিকল। ব্রাহ্মণরা ঘুম ভেঙে উঠে দেখলেন দিগন্ত দিনের আলোর মতো রাঙা হয়ে গেছে মশালের আলোতে। পরদিন নগরীতে হানা দিল যবন মামুদের তুর্কী বাহিনী। যুদ্ধ শুরু হল। আমরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়লাম মন্দিরে। পঞ্চাশ হাজার মানুষ নিহত হল তুর্কীদের হাতে। তুর্কীরা হাজির হল মন্দির-চত্বরে। দ্বার বন্ধ করে পূজারি ব্রাহ্মণরাও মন্দির রক্ষার চেষ্টা

BanglaBook.org

করল। কিন্তু তাদের কাছে কোনও অস্ত্র ছিল না। বিল্বফল, কোষাকুষি, প্রদীপ দণ্ডকে অস্ত্র বানিয়ে তুর্কী তরবারির সঙ্গে কতক্ষণ লড়া যায়?

'তুর্কীরা প্রবেশ করল মন্দিরে। ব্রাহ্মণদের রক্তে লাল হয়ে গেল মন্দির প্রাঙ্গণ। বিগ্রহ ভেঙে মন্দির লুঠ হল, কত শিশুকে যে বর্শা ফলকে গাঁথা হল, কত নারী যে ধর্ষিতা হল তার হিসাব নেই। ভূগর্ভস্থ এক কক্ষে আমরা কয়েকজন নারী লুকিয়ে ছিলাম, তুর্কীরা খুঁজে বার করল আমাদের। ক'জনের সেখানেই প্রাণ গেল দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়ে। বাকিদের অন্য সম্পদের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলল তুর্কীরা। নারীও তো সম্পদ তাই না?' এই বলে থামল মিত্রাবৃন্দা।

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে মন্দির-চত্বরে। সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে চারপাশে। অস্পষ্ট মিত্রাবৃন্দার মুখও। রাহিল প্রশ্ন করল, 'তারপর?'

মিত্রাবৃন্দা জবাব দিল, 'যে দলটা আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল সেটা তুর্কীদের পশ্চাদ্‌বর্তী এক ক্ষুদ্র বাহিনী। এক রাতে জঙ্গলে তুর্কীদের তাঁবু থেকে পালালাম আমরা কয়েকজন নারী। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ধরা পড়ে গেলাম এক দস্যুদলের হাতে। এই নারীদেহ ছাড়া আমাদের কাছে লুঠ করার মতো তেমন কিছু ছিল না। আমরা ব্রাহ্মণকন্যা শুনে নীচু জাতের অরণ্যদস্যুরা আমাদের স্পর্শ করল না ঠিকই কিন্তু আমাদের তারা বেঁচে দিল এক দাসব্যবসায়ীর কাছে। তারপর এ-দাসবাজার থেকে ও-দাসবাজারে মালিকানা বদল হল আমার।

'সবশেষে আমি এসে উপস্থিত হলাম উজ্জয়িনীর দাসবাজারে। ততদিনে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি আমার সোমনাথ মন্দিরের সঙ্গিনীদের থেকে। অন্যত্র বিক্রি হয়ে গেছে তারা। আমিও হয়তো তাদের সঙ্গে বিক্রি হয়ে যেতাম, হইনি কারণ আমি অক্ষত যোনি বলে। বিত্তশালী লোকেরা অক্ষত যোনির দাসী বা অনেক মন্দিরের পুরোহিতরা অক্ষত যোনির দেবদাসী খোঁজে তাকে দেবতার কাছে উৎসর্গ করে নিজেরা ভোগ করার জন্য। অক্ষত যোনির সুন্দরীর দাম তাই দাসের হাটে সর্বাধিক। ক্রেতারা অনেকেই আমাকেই প্রথমে পছন্দ করত কিন্তু তাদের আমাকে ক্রয়ক্ষমতা থাকত না। উজ্জয়িনী থেকে যে দাসব্যবসায়ী আমাকে কিনল তার দলের সঙ্গে বৎসরকাল ঘুরে বেড়ালাম আমি।

BanglaBook.org

'অবশেষে ভালো দাম পেয়ে অন্যদের সঙ্গে সে আমাকে এখানে এনে অনুদেবের কাছে বেচে দিল। সে জানে আমি অক্ষত যোনি। দাস-ব্যবসায়ী তাকে বলেছে সে কথা। আমার মূর্তি তাই নাকি অন্য সুরাকন্যাদের সঙ্গে স্থান পাবে না মন্দিরগাত্রে, স্থান পাবে মন্দিরের গর্ভগৃহর প্রবেশমুখে। হয়তো সেজন্য আমাকে অন্য সুরসুন্দরীদের সঙ্গে না রেখে বেশ তফাতে একলা এক কক্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে।'—কথা শেষ করল মিত্রাবৃন্দা।

অন্ধকারে ঢেকে গেছে মিত্রাবৃন্দার মুখ। রাহিল তার মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি বুঝতে না পারলেও শেষ কথাগুলো বলার সময় স্পষ্ট বিষণ্ণতা ধরা পড়ছিল তার কণ্ঠে।

রাহিল এবার তাকে তার আসল প্রশ্নটা জিগ্যেস করল—'তুমি তো আমাকে প্রথমে হত্যা করতে গেছিলে, তবে সেদিন আমার প্রাণরক্ষা করলে কেন? ওই মূর্তি সেদিন আমার ওপর খসে পড়লে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।'

মিত্রাবৃন্দা তার এ প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে সে বলল, 'অন্ধকার নেমে গেছে। কক্ষে ফিরতে হবে আমাকে। নচেৎ বিকর্না অভিযোগ জানাতে পারে। আবার হয়তো আমাকে পাঠানো হবে মন্দিরের ভূগর্ভস্থ সেই কক্ষে, এমনকী তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে পারে। কাল এখানে এলে আবার দেখা হবে।' এই বলে মিত্রাবৃন্দা ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে গেল তার নূপুরের নিক্কনধ্বনি। অন্ধকারে হারিয়ে গেল মিত্রাবৃন্দা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রাহিল ভাবতে লাগল মিত্রাবৃন্দার কথা। কোথায় সেই সুদূরের সোমনাথ নগরী, আর কোথায় এই খর্জুরবাহক-কাজুরাহো! নারী বলেই হয়তো তার এই পরিণতি। মন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ হলে এরপর কোথায় যাবে মিত্রাবৃন্দা? অক্ষত যোনির এই নারী হয়তো বহুভোগ্যা নারী হবে। তারপর একদিন যৌবন চলে যাবে তার। সে হয়তো তখন স্থান পাবে কান্ডারীয় মন্দিরের নীচের চত্বরে ভিখারিনীদের দলে। মন্দিরের গর্ভগৃহর সামনে শুধু সূর্যালোকে বা চাঁদের আলোতে জেগে থাকবে তার অক্ষতযোনিমূর্তি। সে মূর্তি দর্শনের অধিকারিনী হবে না ভিখারিনী মিত্রাবৃন্দা। তার কথা ভাবতে ভাবতে রাহিলের মন তার প্রতি

BanglaBook.org

কেমন যেন আদ্র হয়ে উঠল। আচ্ছা, রাহিল যদি পুরুষ না হয়ে নারী হত তবে বড় হয়ে ওঠার পর তার পরিণতিও কি একই হত? অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবতে লাগল রাহিল। অন্ধকার কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠতে শুরু করল একসময়। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল রাহিল।

এসবই নানা কথা ভাবছিল সে। হঠাৎ নিক্কনধ্বনিতে চিন্তা-জাল ছিন্ন হল তার। মিত্রাবৃন্দা কি আবার তবে ফিরে এল! সে চলে যাবার পর সেই স্তম্ভর গায়েই ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাহিল। নূপুরধ্বনি শুনে সে পিছনে ফিরে দেখতে পেল তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বিকর্না। তার ঠোঁটে সেই অদ্ভুত অদ্ভুত হাসি। সে রাহিলকে প্রশ্ন করল, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? কোনও নারীর কথা ভাবছ?'

রাহিল মৃদু চমকে উঠে জবাব দিল, 'সারা দিন মন্দির চত্বর প্রদক্ষিণ করে এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করছি।'

বিকর্না তার পুরুষালি কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নরম করে বলল, 'তা বটে। আমাকেও ওই নারীদের তালিম দেবার জন্য পরিশ্রম করতে হয় সারাদিন। সূর্য ডোবার পর অবসর মেলে।'

রাহিল মৃদু হাসল তার কথা শুনে। তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে দেখে বিকর্নার হাসিটাও যেন চওড়া হল। সে এরপর বলল, 'তুমি তো সারাদিন মন্দির প্রদক্ষিণ করে বেড়াও। যেখানে মিথুনমূর্তি রচিত হচ্ছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াও। তোমার ওই মিথুনমূর্তি দেখতে ভালো লাগে তাই না? তুমি যেমন স্তম্ভ ধরে দাঁড়িয়ে আছ তেমনই স্তম্ভ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা অবলম্বতিক সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষের সঙ্গমমূর্তি খুব সুন্দর তাই না?'

রাহিল এবার বেশ অস্বস্তি বোধ করল বিকর্নার কথা শুনে। সে জবাব দিল, 'সুরসুন্দরীদের প্রতি নজরদারীর জন্য আমাদের এখানে আসা। তাই যেখানে সুরসুন্দরীরা থাকে সেখানে দৃষ্টি রাখা আমার কর্তব্য। মিথুনমূর্তি দেখার জন্য আমি সেখানে উপস্থিত হই না।' এ কথা বলে সে বিকর্নার সঙ্গে আর কথা না-বাড়াবার জন্য অন্যদিকে এগোল।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় সে পৌঁছে গেল মন্দিরের পিছনের অংশে।

BanglaBook.org

প্রথমে একবার সে তাকাল চাঁদের আলোতে মন্দিরের নীচে কিছুটা দূরে প্রাচীরঘেরা মজুরদের কুঁড়েগুলোর দিকে। কোনও আলো জ্বলছে না সেখানে, কোনও শব্দও ভেসে আসছে না সেখান থেকে। দিনের শেষে অক্লান্ত পরিশ্রমের শেষে ওই সার সার কুঁড়েগুলোতে ঘুমাচ্ছে মজুরের দল। হয়তো তারা স্বপ্ন দেখছে ফেলে আসা প্রেয়সীর, সন্তানের, পরিজনের। যাদের কাছে হয়তো আর কোনওদিন ফেরা হবে না অনেকেরই। যে মন্দিরে তারা প্রাণ সঞ্চার করছে সে মন্দিরই হয়তো একদিন শুষে নেবে তাদের প্রাণবায়ু। এ মন্দিরের কোথাও কোনও প্রস্তরগাত্রে খোদিত থাকবে না তাদের নাম। শুধু তাদের অতৃপ্ত প্রেতাত্মারা সবার অলক্ষে দীর্ঘশ্বাস বয়ে বেড়াবে অন্ধকার নামার পর এই মন্দির প্রাঙ্গণে। ফেলে আসা যে প্রিয়জনের কাছে তারা আর কোনওদিন পৌঁছোতে পারবে না তাদের কাছে এই নিঝুম চন্দ্রালোকিত রাতে ক্ষণিকের স্বপ্নে হয়তো পৌঁছোবার চেষ্টা করছে ঘুমন্ত মজুর-ভাস্করদের দল।

মজুরদের ঘুমন্ত কুঁড়েগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রাহিল মুখ তুলে তাকাল মন্দিরের শীর্ষগাত্রের দিকে। চন্দ্রালোকে সেই নির্জন তাকে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা সেই নারীমূর্তিও দৃষ্টিগোচর হল রাহিলের। সেদিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তর মধ্যেই রাহিলের মনে হল সেই প্রস্তর মূর্তি যেন কাঁপছে!

হ্যাঁ, কাঁপছে সেই মূর্তি। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাহিল বুঝতে পারল ব্যাপারটা। ওই মূর্তির উলটোদিকের তাকেই কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। তার কম্পমান ছায়া এসে পড়েছে প্রস্তরমূর্তির ওপর। তাই মনে হচ্ছে মূর্তিটা কাঁপছে।

কে ও! সেই কাপালিকের প্রেতাত্মা, নাকি অন্য কেউ? হ্যাঁ, রাহিল দেখতে পাচ্ছে চাঁদের আলোতে সেই তাকে অস্পষ্ট এক মূর্তিকে! রাহিল নিশ্চিত সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে! রাহিল মাটি থেকে একটা ছোট পাথরখণ্ড তুলে নিল। সেই তাক লক্ষ্য করে সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'কে ওখানে?'

ঠিক সেই মুহূর্তে একখণ্ড মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদটাকে। অন্ধকার নেমে এল মন্দিরের মাথায়, চারদিকে। রাহিল এবার হাঁক দিল, 'ওখানে

BanglaBook.org

কে?' তারপর অন্ধকারে সেই তাক অনুমান করে সেই পাথরখণ্ড সজোরে ছুড়ে মারল ওপরদিকে। তাকের গায়ে পাথরখণ্ডর আঘাত আর রাহিলের কণ্ঠস্বর অনুরণিত হল অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণে। আর এরপরই মেঘ কেটে গেল। উন্মুক্ত চাঁদের আলো আগের থেকে একটু বেশি যেন ছড়িয়ে পড়ল মন্দিরগাত্রে। রাহিল দেখল শূন্য তাক। কেউ কোথাও নেই। অথচ রাহিল নিশ্চিত চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে থাকা ওই বিষণ্ণ নারীমূর্তির উলটোদিকের তাকেই দাঁড়িয়ে ছিল কেউ একজন।

রাহিলের চিৎকার শুনেই মনে হয় মশাল হাতে নীচ থেকে ওপরে উঠে এল মন্দির-রক্ষীবাহিনীর একজন। রাহিলকে সে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে?'

বিব্রত বোধ করল রাহিল। আসল কথাটা সে এড়িয়ে গিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণের একটা অন্ধকার অংশতে আঙুল নির্দেশ করে বলল, 'ওখানে একটা ছায়া দেখলাম মনে হল তাই হাঁক দিলাম। তেমন কিছু ব্যাপার নয়।'

তার কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে আবার নীচে ফিরে গেল মন্দির-রক্ষী। সে ফিরে যাবার পর মন্দিরের সেই শূন্য তাকটা আরও একবার ভালো করে দেখে নিয়ে রাহিল ফিরে চলল বিশ্রাম নেবার জন্য।

৬

প্রতিদিনের মতো ভোরের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই কুক্কুটের ডাকে ঘুম ভাঙল রাহিলের। ঘুম ভাঙার পরই রাহিলের মনে পড়ল মিত্রাবৃন্দার কথা। শেষ রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছে সে। স্বর্ণখচিত বিশাল এক মন্দির-চত্বরে মিত্রাবৃন্দার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাহিল। অপরিচিত সেই মন্দির-চত্বরে হাজার হাজার মানুষের সমাগম। মিত্রাবৃন্দা রাহিলকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সেই মন্দির। ফুলমালাশোভিত সে মন্দিরে দিনের বেলাতেও সার সার প্রদীপ জ্বলছে। ঘৃত-ধূপ-ফুলমালার গন্ধে সুরভিত মন্দির-চত্বর ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত। লোকজনের ভিড়ে মন্দিরের

BanglaBook.org

এ-প্রাঙ্গণ থেকে ও-প্রাঙ্গণ, এ-কক্ষ থেকে ও-কক্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছে রাহিল। কত অদ্ভুত আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি স্থাপিত সেই মন্দিরে। স্বর্ণালঙ্কার, হীরকখচিত সেইসব মূর্তি।

চন্দনকাঠের মণ্ডপের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সেসব দেবদেবীর মূর্তি থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মিত্রাবৃন্দা এক সময় তাকে বলল, 'চলো, তোমাকে গর্ভগৃহ দেখাব।' রাহিল তার সঙ্গে এসে দাঁড়াল গর্ভগৃহর সামনে। তার ভিতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। ভিতর থেকে ভেসে আসছে গম্ভীর কণ্ঠে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ আর চন্দনের গন্ধ। আর সেই গর্ভগৃহ থেকে অজগর সাপের মতো বিরাট এক সোনার শিকল বাইরে বেরিয়ে এসেছে। অন্ধকার গর্ভগৃহর দিকে তাকিয়ে মিত্রাবৃন্দা বলল, 'ভয় নেই, ভিতরে এসো।'

রাহিল তার সঙ্গে চন্দনকাঠের চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ঝনঝন শব্দে পায়ের সামনে বেজে উঠল সেই সোনার শিকল। মন্ত্রোচ্চারণ থামিয়ে গর্ভগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে এল মুণ্ডিত মস্তক শিখাধারী পুরোহিতের দল। তাদের চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ। রাহিলদের প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তারা ছুটল বাইরের মন্দির প্রাঙ্গণে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্কের কোলাহল ভেসে এল প্রাঙ্গণ থেকে 'যবন এসেছে! যবন এসেছে!'

সেই চিৎকার কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তরবারি কোষমুক্ত করল রাহিল। আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছে মিত্রাবৃন্দার মুখে। রাহিল তাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'আমি থাকতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি গর্ভগৃহে প্রবেশ করো, আত্মগোপন করো। আমি না-ফেরা পর্যন্ত তুমি গর্ভগৃহর অন্ধকারেই থাকো।'

তার কথা শুনে মিত্রাবৃন্দা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল গর্ভগৃহে। আর রাহিল তলোয়ার হাতে ছুটল মন্দির-প্রাঙ্গণে। শয়ে-শয়ে তুর্কী সেনা উঠে আসছে মন্দিরে। আতঙ্কিত নারীদের আর্ত চিৎকার, শিশুদের ক্রন্দনে মুখরিত মন্দির-চত্বর। মন্দির রক্ষীরা, শিখাধারী পুরোহিতরা প্রতিহত করার চেষ্টা করছে তুর্কীদের।

রাহিল ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই যুদ্ধে। ভয়ংকর সেই যুদ্ধ! সারাদিন ধরে

BanglaBook.org

চলল সেই যুদ্ধ। রাহিলের তরবারির আঘাতে কতজন তুর্কীর যে পাগড়িসহ মুণ্ড উড়ে গেল তার কোনও হিসাব নেই। অবশেষে সূর্য ডোবার কিছু আগে যুদ্ধ থামল। পশ্চাদপসরণ করল পরাজিত তুর্কীরা। রাহিল দেখল সে একা জীবিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে। তার চারপাশে শুধু শবের পাহাড়। পাগড়িধারী তুর্কীর শব, শিখাধারী ব্রাহ্মণের শব, নারীর শব, শিশুর শব।

রাহিল এরপর ছুটল গর্ভগৃহর দিকে মিত্রাবৃন্দার খোঁজে। অন্ধকার গর্ভগৃহ, শুধু কোথা থেকে যেন ক্ষীণ আলো আসছে ভিতরে। গর্ভগৃহর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট বিগ্রহ। বিশাল গর্ভগৃহর ভিতরে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাহিল সেই আধো অন্ধকারে চিৎকার করল, 'মিত্রা তুমি কোথায়? আমি এসেছি। তুর্কীরা পরাজিত হয়েছে।'

তার কথার প্রত্যুত্তর মিলল নূপুরধ্বনিতে। গর্ভগৃহর অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে রাহিলের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল অবগুণ্ঠনে ঢাকা এক নারীমূর্তি। হ্যাঁ, ওই তো মিত্রাবৃন্দা। রাহিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। দু-হাত প্রসারিত করল রাহিলকে আলিঙ্গন করার জন্য। রাহিলও তলোয়ার কোষবদ্ধ করে তার দিকে বাহু প্রসারিত করে বলল, 'অবগুণ্ঠন উন্মোচন করো। আর শঙ্কার কোনও কারণ নেই।'

মুহূর্তর জন্য থমকে দাঁড়াল সেই নারী। তারপর মুখমণ্ডলের আবরণ উন্মোচন করে এগিয়ে এল রাহিলকে আলিঙ্গন করার জন্য। রাহিলও তাকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই সময় কোথা থেকে যেন আলো এসে পড়ল অবগুণ্ঠন খসে পড়া মুখের ওপর। রাহিল দেখল যে মুখে সে চুম্বন করতে যাচ্ছিল তা মিত্রাবৃন্দার মুখ নয়, বিকর্নার মুখ। আর এরপরই অট্টহাস্য করে উঠল বিকর্না। সভয়ে পিছিয়ে এল রাহিল। বিকর্নার অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল অন্ধকার গর্ভগৃহে। তাকে আলিঙ্গন করার জন্য বিকর্না এগিয়ে আসতে লাগল। রাহিল সে জায়গা থেকে সরতে গেল, কিন্তু অন্ধকার স্বর্ণশিকলে জড়িয়ে গেল তার পা...

ঠিক এ পর্যন্ত স্বপ্নটা দেখে কুক্কুটের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল রাহিলের। প্রথমে তার মনে পড়ল মিত্রাবৃন্দার কথা, তারপর স্বপ্নর কথা। অদ্ভুত স্বপ্ন। রাহিলের মনে হল গত সন্ধ্যায় সে মিত্রাবৃন্দার কাছে, মন্দির-সোনার

BanglaBook.org

শিকল-তুর্কী হানার কথা শুনেছে। আর সে জন্যই সে এই স্বপ্ন দেখেছে। তবে স্বপ্নের শেষ অংশটা সত্যিই বড় অদ্ভুত!

ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণের মধ্যেই রোজকার মতো সঙ্গী সৈনিকদের নিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল রাহিল। মজুর-ভাস্করদের দল উপস্থিত হতে শুরু করেছে মন্দিরে। দৈনন্দিন ব্যস্ততা শুরু হতে চলেছে। রাত-পাহারায় যে সৈনিকদল নিয়োজিত ছিল তাদের বিশ্রামে পাঠিয়ে নতুন সৈনিকদলকে কর্তব্য বুঝিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্দির পরিভ্রমণ শুরু করল রাহিল।

বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরার পর রাহিলের হঠাৎ খেয়াল হল মিত্রাবৃন্দা তাকে বলেছিল আজ তার মূর্তি নির্মাণ শুরু করবেন ভাস্কর মাহবা। এ কথাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা দেখার জন্য রাহিল এগোল যেখানে নগ্নমূর্তি নির্মিত হয় সে জায়গার দিকে। সেখানে অন্য একজন অন্য এক নারীমূর্তি রচনা করছেন। রাহিল এরপর এগোল মাহবার কাজের জায়গার দিকে। সেদিকে এগোতে এগোতে রাহিল ভাবল, মাহবার কাজের জায়গা তো উন্মুক্ত, তবে কি লোকচক্ষুর সামনেই মিত্রাবৃন্দার নগ্ন মূর্তি নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান স্থপতি ভাস্কর চিত্রবান বা প্রধান পুরোহিত অনুদেব? মিত্রাবৃন্দার প্রাথমিক অবাধ্যতার জন্য তারা কি এভাবে তাকে মানসিক শাস্তি দিচ্ছেন? এসব কথা ভাবতে ভাবতে রাহিল পৌঁছে গেল মাহবার কাজের জায়গাতে। হ্যাঁ, আর সেখানেই সে দেখতে পেল মিত্রাবৃন্দাকে।

কোনও আচ্ছাদন নেই সে জায়গায়। ভাস্কর মাহবা, প্রধান পুরোহিত অনুদেব, বৃহন্নলা বিকর্না সবাই সেখানে উপস্থিত। রাহিল গিয়ে দাঁড়াল সে জায়গাতে। ভাস্কর মাহবার সামনে পূর্ণাবয়ব মানুষের আকৃতি রচনা করা যায় এমন এক প্রস্তরখণ্ড দণ্ডায়মান। তার ওপর কাঠকয়লা আঁচড়ে প্রথমে মিত্রাবৃন্দার চিত্র এঁকেছেন বৃদ্ধ ভাস্কর। তারপর ছেনির আঘাতে পাথরে রচনা করছেন মিত্রাবৃন্দার বহিঃঅবয়ব। তারা তিনজনই তাকিয়ে ছিল মিত্রাবৃন্দার দিকে। কিন্তু রাহিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই বিকর্না তাকাল রাহিলের দিকে। তার মুখে সেই অদ্ভুত হাসি।

একবার তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে রাহিল তাকাল মিত্রাবৃন্দার দিকে।

BanglaBook.org

কিন্তু তার বেশ দেখে রাহিল বেশ অবাক হয়ে গেল। ভূষণসজ্জিত মিত্রাবৃন্দা। মাথায় তার খোঁপা বাঁধা। সেখানে আলগোছে গোঁজা এক পদ্মকুঁড়ি। সিঁথিতে চূড়ামণি, কর্ণে কর্ণফুল, কণ্ঠে মুক্তাহার, চন্দ্রাহার, অঙ্গদ, বাহুতে কঙ্কন, কটিদেশে কটিকিঙ্কিনী, পায়ে নূপুর, পরনে সূক্ষ্ম রেশমবস্ত্রে সজ্জিতা মিত্রাবৃন্দা। তবে রাহিল তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পারল সেই সূক্ষ্ম কাঁচুলি-শাড়ি মিত্রাবৃন্দার দেহকে আড়াল করার জন্য পরানো হয়নি বরং তার দেহসৌষ্ঠবকে যেন আরও সুপ্রকট করার জন্য পরানো হয়েছে সেই স্বচ্ছ রেশমবস্ত্র। নগ্নিকা অপেক্ষা অনেক কামোদ্দীপক লাগছে এই নারীশরীরকে। কারণ মিত্রাবৃন্দার শরীর প্রায় দৃশ্যমান হলেও তার মধ্যে জেগে আছে অজানার হাতছানি। যা আকৃষ্ট করে পুরুষের কামভাবনাকে।

অমলিন রেশমখণ্ড ভেদ করে পরিস্ফুট তার বিম্বস্তনের চন্দ্র অবয়ব। গভীর নাভি সহ উদর অনাচ্ছাদিত তার। ওই অমলিন কাপড়ের ঘাগড়ার আড়ালেই প্রকটিত তার কলস নিতম্ব, কামভাবে পূর্ণ উরু জঙ্ঘা। এত সুন্দর নারীদেহ কোনওদিন দেখেনি রাহিল। এমনকী পুরোহিত অনুদেবও মন্ত্রমুগ্ধর মতো চেয়ে আছেন সেই নারীদেহের দিকে। রাহিল নিশ্চিত হল সুরকন্যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী এই নারী।

ছন্দময় ভঙ্গিমাতে পাথরের নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে মিত্রাবৃন্দা। শুধু তার চোখের তারা মাঝে মাঝে কাঁপছে। পাথরের মূর্তির সঙ্গে শুধু এইটুকু পার্থক্য তার। ভালো করে লক্ষ না করলে তা খেয়াল করা যায় না। রাহিলও মন্ত্রমুগ্ধর মতো একবার তাকাতে লাগল মিত্রাবৃন্দার দিকে, আর একবার সেই প্রস্তরখণ্ডর দিকে। যেখানে বৃদ্ধ ভাস্কর মাহবার ছেনির আঁচড়ে ফুটে উঠছে মিত্রাবৃন্দার অবয়ব। দেখতে লাগল রাহিল। হঠাৎ মিত্রাবৃন্দার ঘূর্ণায়মান চোখের তারা রাহিলের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আরক্ত হয়ে উঠল মিত্রাবৃন্দার মুখমণ্ডল।

পাথরের মতো অচঞ্চল মিত্রাবৃন্দা রাহিলকে দেখে যেন কেঁপে উঠল কোনও গোপন সঙ্কোচে-লজ্জায়। তার কবরীবন্ধন থেকে খসে পড়ল পদ্মকোরক। থেমে গেল ভাস্করের কাজ।

মাহবা এবং অনুদেব দুজনেই মিত্রাবৃন্দার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালেন

BanglaBook.org

রাহিলের দিকে। পুরো ব্যাপারটাতে বেশ অস্বস্তিবোধ করল রাহিল। তারা দুজন কি ভাবছেন যে তাকে দেখেই কেঁপে উঠল মিত্রাবৃন্দা? তার দিকে তাকিয়েই আবার মিত্রাবৃন্দার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ব্রাহ্মণ অনুদেব। ততক্ষণে অবশ্য মিত্রাবৃন্দার দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়ে স্থির হয়ে গেছে। মাহবা এরপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন সেই রমণীর কাছে। তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা সেই পদ্মকোরক সংগ্রহ করে তা যথাস্থানে স্থাপিত করে ফিরে এসে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন।

রাহিল এরপর পা বাড়াল অন্যদিকে। কিন্তু কিছুটা এগোবার পরই পিছন থেকে ডাক শুনে সে তাকিয়ে দেখল অনুদেব তার পিছনে আসছেন। অনুদেব তার মুখোমুখি হয়ে প্রথমে বললেন, 'পরিস্থিতি কেমন বুঝছেন?'

'কী ব্যাপারে?' জানতে চাইল রাহিল।

পুরোহিত জবাব দিলেন, 'এইসব নারীদের আচরণের ব্যাপারে? মজুর-ভাস্করদের ব্যাপারে?'

রাহিল জবাব দিল, 'সবই স্বাভাবিক বলেই তো মনে হয়। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে ওরা। কেউ পালাবার প্রচেষ্টা করছে বলে মনে হয় না। শেষজনও তো বশ্যতা স্বীকার করল। আর ভাস্কর-মজুরদের আচরণেও কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ করিনি।'

রাহিলের শেষ কথাটা শুনে একটা অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠল অনুদেবের ঠোঁটে। তিনি বললেন, 'এইসব নারীদের মূর্তি নির্মাণের কাজ আর এক পক্ষকালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তারপর আবার নতুন দল আসবে। খেয়াল রাখবেন তার মধ্যে যেন কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। বর্ষা নামার আগে দ্রুতগতিতে কাজ শেষ করার জন্য সূর্য ডোবার পরও কোনও কোনও মজুর বা ভাস্কর মন্দিরে থাকবে। তাদের ওপর বিশেষ নজর রাখবেন। আপনি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে মহাসৈনাধ্যক্ষ উগ্রায়ুধের কাছে পদোন্নতির সুপারিশ করব আমি।'

রাহিল জানতে চাইল, 'মূর্তি নির্মাণের পর এসব নারীদের নিয়ে কী করা হবে?'

পুরোহিত জবাব দিলেন, 'নতুন নারীদের যে দল আসবে তাদের ক্রয়

BanglaBook.org

করার জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য কিছুদিনের মধ্যেই মহারাজ বিদ্যাধরের সাথে সাক্ষাৎ করব আমি। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

অনুদেবের কথা শেষ হয়ে গেছে ভেবে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে এগোতে যাচ্ছিল রাহিল। কিন্তু অনুদেব বললেন, 'দাঁড়ান আর একটা ব্যাপার জানার আছে। কাল সূর্য ডোবার পর আপনি মন্দির-চত্বরে কি কিছু দেখেছিলেন?'

রাহিল বুঝতে পারল তার চিৎকার শুনে মন্দির-রক্ষীবাহিনীর যে লোকটা নীচ থেকে ওপরে উঠে এসেছিল সে বা তাদের প্রধান প্রকটাক্ষ ব্যাপারটা সম্বন্ধে অবগত করেছে তাকে। রাহিল বুঝতে পারল অনুদেব সূর্য ডোবার পর মন্দির পরিত্যাগ করলেও তার অনুপস্থিতির সময়কার প্রতিটা বিষয় সম্বন্ধে অবগত থাকেন তিনি।

রাহিল জবাব দিল, 'তেমন কিছু নয়, শুধু একটা ছায়া দেখেছিলাম মন্দির-চত্বরে।'

রাহিলের উত্তর শুনে অনুদেব কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'মন্দির-চত্বরে রাতে সতর্ক নজর রাখবেন। বিশেষত মন্দির-চত্বরের পিছনের অংশে। কোনও সময় সন্দেহজনক কিছু দেখলেই পরদিন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন।' একথা বলে তিনি আবার এগোলেন মাহবার কাজের জায়গার দিকে।

রাহিল ভাবতে ভাবতে হাঁটতে শুরু করল—এই যে অনুদেব বারবার সতর্ক করেন তা কি শুধু আগাম সতর্কতা হিসাবে? না কি এর পিছনে কাজ করে অনুদেবের মনের কোণে জমে থাকা কোনও শঙ্কা? সবার অগোচরে তাহলে মন্দির-চত্বরে এমন কিছু কি ঘটে চলেছে যা অনুদেবের মনে শঙ্কার উদ্রেক ঘটাচ্ছে? সেই প্রেতাত্মার মূর্তির ব্যাপারটা কী? রাহিলের স্থির ধারণা গত রাতে সে কাউকে সেখানে দেখেছিল। সে কে? ব্যাপারটা রাহিলেরও ভালো করে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

রাহিল ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে উপস্থিত হল মন্দিরের পিছনের অংশে। দ্বিপ্রহরের সূর্যালোকে মন্দিরের শীর্ষগাত্রে একাকী দাঁড়িয়ে আছে সেই নারীমূর্তি। তার উলটোদিকের তাকটাও সূর্যালোকে স্পষ্ট। দিনের আলোতে

BanglaBook.org

কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই, অথচ রাত হলেই ও জায়গা কেমন রহস্যময় বলে মনে হয়! মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে নীচের চত্বরে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রাহিলের মনে হল ওপরে উঠে কাছ থেকে ভালো করে ও জায়গাটা দেখে আসা যেতে পারে। মন্দিরের ভিতর থেকে একটা সোপানশ্রেণি ওপরে উঠতে দেখেছে সে। ব্যাপারটা তার মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে জায়গা ছেড়ে উঠে রাহিল কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবেশ করল মন্দিরের ভিতর।

তারপর এ-কক্ষ সে-কক্ষ অতিক্রম করে সেই সোপানশ্রেণি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। সংকীর্ণ সোপান ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেছে। পাশে কোনও আগল নেই। একটু অসতর্ক হলেই মৃত্যু নিশ্চিত। সাবধানে একটার পর একটা ধাপ অতিক্রম করে একসময় বেশ ওপরে উঠে একজায়গায় থামতে হল রাহিলকে। আর ওপরে ওঠার পথ নেই তার সামনে একটা পাথুরে দেওয়াল, আর একপাশে দেওয়ালে একটা গবাক্ষের মতো জায়গা। সম্ভবত ওই গবাক্ষ দিয়ে মন্দিরগাত্রের বাইরের তাকে পৌঁছোনো যায়। গুড়ি মেরে সেই ফোঁকড় দিয়ে বাইরে বেরিয়ে রাহিল দেখল সত্যি সে মন্দিরের শীর্ষগাত্রে এক উন্মুক্ত তাকে পৌঁছে গেছে। তবে সেই মূর্তির কাছে সে পৌঁছোতে পারেনি। তার মাথার ওপর হাত-কুড়ি তফাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই মূর্তি আর তার বিপরীত দিকের শূন্য তাকটা।

মন্দিরের মাথার অংশটা নিরেট। বহিঃগাত্রের খাঁজ বেয়ে একমাত্র আরও ওপরে ওঠা যায়। যা রাহিলের পক্ষে সম্ভব নয়। ভালো করে মূর্তিটা যথাসম্ভব দেখার পর রাহিল তাকাল সামনের দিকে। এত উঁচু থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। দূরের পাহাড়-বনানী এ সব কিছুই যেন কাছে মনে হচ্ছে। নীচের চত্বরের অনেকটাও দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে। নীচে যারা ঘোরাফেরা করছে তাদের অনেকটা পুতুলের মতো লাগছে। কেউ অবশ্য তাকাচ্ছে না রাহিল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে। ওপর থেকে একবার চিত্রবান আর অনুদেবকেও দেখতে পেল রাহিল।

মন্দিরের পশ্চাদভাগের চত্বর অতিক্রম করে তারা অন্যত্র চলে গেলেন। রাহিল বুঝতে পারল এ জায়গা নজরদারির জন্য আদর্শ। মন্দিরের

BanglaBook.org

পশ্চাদভাগ আর পশ্চিম অংশের চত্বরের প্রায় পুরোটাই দেখা যায় তাকের এ অংশ থেকে। দীর্ঘক্ষণ সে জায়গা থেকে রাহিল নীচের চত্বরে সবার কাজকর্ম লক্ষ করল। তারপর সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়ল রাহিল তখন নীচে নেমে এল। রাহিলের মনে হল মিত্রাবৃন্দার কথা। সে বলেছিল আজও সে একই জায়গাতে সূর্য ডোবার আগে আসবে। রাহিল বুঝতে পারছে সে কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করছে মিত্রাবৃন্দার প্রতি। তবে কারণটা তার সঠিক জানা নেই।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রাহিল বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল মন্দির-চত্বর ফাঁকা হবার জন্য। ধীরে ধীরে ফাঁকা হল চত্বর। সে দেখতে পেল ছত্রধরদের সঙ্গে নিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করলেন চিত্রবান ও অনুদেবও। এ দৃশ্য দেখার পরই রাহিল এগোল নির্দিষ্ট জায়গার দিকে। দিনের শেষ আলোতে যথারীতি একই জায়গাতে গোলক নিয়ে মেতে আছে সুরসুন্দরীরা। কলহাস্য মুখরিত সে-স্থান অতিক্রম করে রাহিল একসময় উপস্থিত হল সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে। হ্যাঁ, সেখানে সেই স্তম্ভর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে মিত্রাবৃন্দা। তবে সে আগের দিনের মতো অন্যদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে নয়, তাঁর দৃষ্টি রাহিল যে বাঁক অতিক্রম করে এল সেদিকেই নিবদ্ধ ছিল। রাহিলের মনে হল সে যেন তার আসার জন্যই প্রতীক্ষা করছিল।

রাহিল তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। বিষণ্ণ নয়, নির্মল এক হাসি। রাহিলও হাসল। সে এরপর প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আজ সকালে আমাকে দেখতে গেছিলে?'

রাহিল একটু ইতস্তত করে বলল, 'তেমন ব্যাপার নয়। আসলে আমি মন্দির-প্রাঙ্গণে সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে ভাস্করদের কাজ দেখি। তেমনই পৌঁছে গেছিলাম যেখানে মাহবা তোমার মূর্তি রচনা করছেন সেখানে। তোমার অভিজ্ঞতা কেমন?'

মিত্রাবৃন্দা প্রথমে জবাব দিল, 'বৃদ্ধ ভাস্কর লোক ভালো। অনুদেব আর বিকর্নার অনুপস্থিতিতে তিনি আমার পরিচয় জানলেন, দুঃখ প্রকাশ করলেন আমার পরিণতির জন্য। সূর্য ডোবার পর মন্দির-প্রাঙ্গণে, অথবা মন্দিরের কোনও কক্ষে আমাকে একাকী না থাকতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন আমাকে সাতদিন দাঁড়াতে হবে তাঁর সামনে।

BanglaBook.org

বাকি কাজটা তিনি নিজেই করে নেবেন।' এ কথা বলার পর একটু থেমে সে বলল, 'আজ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তোমাকে দেখতে পেয়ে বেশ লজ্জাবোধ হচ্ছিল।'

রাহিল মৃদু বিস্মিত হয়ে বলল, 'এতজনের মধ্যে আমাকে দেখেই তোমার লজ্জাবোধ হল কেন?'

মিত্রাবৃন্দা তার কথার জবাব দিল না। দিনশেষের মায়াবী আলোতে শুধু একরাশ হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। এরপর সে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, মূর্তি রচনা শেষ হয়ে গেলে কি মুক্তি দেওয়া হবে আমাদের? নাকি আবার দাসের হাটে বেঁচে দেওয়া হবে আমাদের?'

রাহিল বলল, 'আমি এ ব্যাপার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু জানি না। তবে শুনেছি ব্যাপারটা নিয়ে সম্রাট বিদ্যাধর আর পুরোহিত সিদ্ধান্ত নেবেন। এরপর নতুন নারীদের দল আসবে মন্দিরে।'

সূর্য ডুবে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে। রাহিলের কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ ভাবার পর মিত্রাবৃন্দা বলল, 'আচ্ছা, ধরো যদি মূর্তি রচনার পর আমাকে বিক্রি করা হয় তখন তুমি আমাকে কিনে নিতে পারো না? আমি তো অক্ষত যোনি।'

রাহিল চমকে উঠল মিত্রাবৃন্দার প্রস্তাব শুনে। সে কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মিত্রাবৃন্দা প্রতীক্ষা করতে লাগল রাহিলের জবাবের।

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য রাহিল একসময় বলল, 'কাল তুমি সোমনাথ মন্দিরের কথা বলছিলে। সে মন্দিরের গল্প বলো।'

সোমনাথ মন্দিরের কথা শুনেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিত্রাবৃন্দার চোখ। সে বলল, 'হ্যাঁ, বিশাল ছিল সেই সোমনাথ মন্দির। সবচেয়ে বড় কথা গর্ভগৃহে শূন্যে ভাসমান ছিল বিগ্রহ। কত সোনা-রুপো, হীরা-পান্না! দশ সহস্র গ্রাম ছিল সেই মন্দিরের সম্পত্তি। পাঁচশো তরুণী মন্দিরের প্রবেশদ্বারে নৃত্যগীত করত। অনেক দূরের গঙ্গানদী থেকে প্রত্যহ জল এনে সেই জলে মন্দির-চত্বর ধৌত করে ফুলমালা দিয়ে সাজানো হত সেই মন্দির। তীর্থযাত্রীদের দেখাশোনা ও পূজা-অর্চনা করার জন্য এক সহস্র ব্রাহ্মণ থাকত মন্দিরে। চন্দ্রগ্রহণের দিন এক লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাবেশ

BanglaBook.org

হোত সেখানে। কত মানুষ...'

অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। ওপাশের প্রাঙ্গণে থেমে গেছে সুরকন্যাদের শব্দ। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল মিত্রাবৃন্দা। একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে যেতেই রাহিল পিছনে ফিরে দেখল বিকর্না সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত মিত্রাবৃন্দার অনুসন্ধানেই সে এখানে এসেছে। সে একটু সন্দিগ্ধভাবে তাকাচ্ছে দুজনের দিকে। তাকে দেখে মিত্রাবৃন্দা আর দাঁড়াল না। সে দুজনকেই পাশ কাটিয়ে ফিরে চলল নিজের কক্ষে। মিত্রাবৃন্দার অপসৃয়মান ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বিকর্না রাহিলকে বলল, 'কী কথা বলছিল ও?' তার কণ্ঠস্বরে যেন সন্দেহের রেশ।

তাকে আশ্বস্ত করার জন্য রাহিল বলল, 'ওর ঘটনা তো জানো। ও ছুরিকাঘাত করতে গেছিল। তাই ওর সঙ্গে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে ওর আরও কোনও অপ্রীতিকর অভিসন্ধি আছে কিনা?'

তার কথা বিকর্নার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হল কিনা তা ঠিক বুঝতে পারল না রাহিল। সে এগোল মন্দিরের পিছনের অংশে যাবার জন্য। নিজের কক্ষে ফেরার আগে জায়গাটা একবার দেখে যাবে সে। ও-জায়গার ওপর বিশেষ নজরদারি প্রয়োজন। কিন্তু কিছুটা এগোবার পর রাহিল বুঝতে পারল বিকর্না তাকে অনুসরণ করছে। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিকর্নাকে বলল, 'তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?'

বিকর্না জবাব দিল, 'না, তেমন কিছু নয়। সারাদিন তো সুরসুন্দরীদের তালিম দিতে সময় কাটে। তাই তোমার সঙ্গে একটু চত্বর প্রদক্ষিণ করছি।'

অন্ধকার নেমে গেছে মন্দির-প্রাঙ্গণে। আর কোনও কথা না বাড়িয়ে এগোতে থাকল রাহিল। আর তার সঙ্গে বিকর্না। চলতে চলতে বিকর্না একসময় প্রশ্ন করল, 'সৈনিকের কাজে কত পারিশ্রমিক পাও তুমি?'

রাহিল জবাব দিল, 'মাসিক পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা।'

বিকর্না বলল, 'তাহলে আমার পারিতোষক তোমার দ্বিগুণ। দশ স্বর্ণমুদ্রা। আমার প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার আছে। রাজধানীর প্রধান পথে বাটিকা আছে। তা ছাড়া রূপোপজীবিনীদের এক আস্তানার কর্ত্রী আমি। সেখান থেকে আরও বিশ স্বর্ণমুদ্রা আয় হয় আমার। ওই দেহোপজীবিনীরা আমার ক্রীতদাস।'

BanglaBook.org

নিঃসন্দেহে রাহিলের থেকে অনেক সম্পদশালী এই বৃহন্নলা। কিন্তু সে কেন হঠাৎ তাকে তার সম্পদের গল্প বলছে তা বোধগম্য হল না রাহিলের। তার কথা শুনতে শুনতে হাঁটতে লাগল সে।

বিকর্না এরপর তাকে বলল, 'এখানে আর থাকতে ভালো লাগছে না আমার। আনন্দহীন জীবন। আমি স্বাধীন, ক্রিতদাসী নই। প্রধান ভাস্কর চিত্রবান আমাকে এখানে এনেছিলেন। আমি যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলাম তা সফল হল না।'

রাহিল একবার ভাবল সে প্রশ্ন করে তার উদ্দেশ্যটা কী ছিল? কিন্তু কথা না বাড়াবার জন্য প্রশ্ন করার থেকে বিরত রইল সে। এমনিতেই বিকর্নার উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করছে সে।

রাহিল একসময় কিছুটা তফাত থেকে দেখতে পেল মাহবার কাজের জায়গাতে আলো জ্বলছে। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে যাবার আগে সে একবার এগোল সেদিকে। ঠিক এমন সময় বিকর্না হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আমাকে তোমার কেমন লাগে?'

প্রশ্নটা শুনে রাহিল বেশ ঘাবড়ে গেলেও সৌজন্যতাবশত সে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—'ভালো'।

জবাব শুনে অন্ধকারে যেন হাসি ফুটে উঠল বিকর্নার মুখে। সে এরপর আর রাহিলকে অনুসরণ করল না। যে পথে সে এসেছিল সে পথেই ফিরে গেল অন্ধকারে।

রাহিল এসে দাঁড়াল মাহবার কাজের জায়গাতে। মশালের আলোতে কাজ করছেন বৃদ্ধ ভাস্কর। প্রস্তরখণ্ডের গায়ে মিত্রাবন্দার প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে। ছেনি দিয়ে খুব সাবধানে আঁচড় কাটছেন ভাস্কর মাহবা।

রাহিলকে দেখে বৃদ্ধ শিল্পী মৃদু হেসে বললেন, 'সম্রাটের নির্দেশ, দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে। তাই সূর্য ডোবার পরও মন্দির-প্রাঙ্গণে থাকতে হবে আমাকে।'

রাহিল জবাব দিল, 'হ্যাঁ, অনুদেব আমাকে বলেছেন যে সূর্য ডোবার পরও মন্দির-প্রাঙ্গণে কাজ করবে শিল্পীরা।'

সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কাজ দেখার পর রাহিল এগোল মন্দিরের পশ্চাদ্‌ংশের দিকে।

BanglaBook.org

৭

বেশ ক'টা দিন কেটে গেল। মন্দির নির্মাণ, মূর্তি নির্মাণের কাজ স্বাভাবিক নিয়মেই চলছে। তবে আগের চেয়েও ভাস্করদের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। মাহবা সহ বেশ কিছু ভাস্কর গভীর রাত পর্যন্তও এক-একদিন কাজ করছেন। মন্দিরের শীর্ষগাত্রে সেই ছায়ামূর্তিরও দেখা পায়নি কেউ। রাহিল দু-দিন মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে তাকে দেখার জন্য।

তবে সেদিন বিকালের পর মিত্রাবৃন্দার সঙ্গে আর বাক্যালাপের সুযোগ হয়নি রাহিলের। সূর্য ডোবার সময় সে আর সেই স্তম্ভর কাছে আসে না, ক্রীড়ারত নারীদের দলেও থাকে না। মন্দিরের ভিতরে নিজের কক্ষেই থাকে সে। রাহিলের জানা নেই এটা কি তার স্বেচ্ছা নির্বাসন নাকি কেউ তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে!

সূর্য ডোবার সময় প্রতিদিন রাহিল রোজ গিয়ে দাঁড়ায় সেই শূন্য প্রাঙ্গণে। একাকী দাঁড়িয়ে থাকে সে। একসময় অন্যপাশের চত্বরে সুরসুন্দরীদের কলহাস্য স্তিমিত হয়ে আসে, অন্ধকার নামতে থাকে মন্দির-প্রাঙ্গণে। কিন্তু মিত্রাবৃন্দা আসে না।

আজকাল রাহিল একটা ব্যাপার অনুভব করে, মিত্রাবৃন্দার প্রতি একটা প্রগাঢ় আকর্ষণ অনুভব করে। যে আকর্ষণ সূর্য ডোবার সময় টেনে নিয়ে যায় সেই শূন্য প্রাঙ্গণে। যেখানে এসে দাঁড়াত সেই নারী। তবে মিত্রাবৃন্দাকে সে একবার রোজ দেখতে পায় মাহবার কাজের জায়গাতে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত থাকেন অনুদেব। মিত্রাবৃন্দার সঙ্গে সেখানে বাক্যালাপ সম্ভব নয়। নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা মিত্রাবৃন্দার চোখের তারা মুহূর্তর জন্য এসে স্থির হয় রাহিলের ওপর। তারপর আবার অন্যদিকে ঘুরে যায়। তার মুখের অভিব্যক্তিতে তেমন কিছু ধরা দেয় না।

এদিন বেশ রাতে নিজের কক্ষে ফিরে ঘুমাতে গেছিল রাহিল। সূর্য ডোবার আগে মন্দির-চত্বর পরিত্যাগ করার সময় অনুদেব রাহিলকে ডেকে

BanglaBook.org

জানিয়ে গেছেন, তিনি পরদিন সকালে মন্দির-চত্বরে আসবেন না। সম্রাট বিদ্যাধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন রাজপ্রাসাদে, তাঁর ফিরতে দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যাবে। অনুদেব যদি না থাকেন আর বিকর্নাকে যদি কাজের অছিলায় দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় তবে মূর্তি নির্মাণের জায়গাতেই বাক্যালাপ করা যেতে পারে মিত্রাবৃন্দার সঙ্গে। রাহিল জানতে পারে তার অনুপস্থিতির কারণ।

বৃদ্ধ ভাস্কর মাহবা নিশ্চই অনুদেব, চিত্রবানের থেকে ব্যাপারটা গোপন রাখবেন। এসব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাহিল। কিন্তু শেষ রাতে হঠাৎ বাইরে থেকে প্রহরী সৈনিকদের চিৎকার চেঁচামেচির শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে বসল সে। তার পরমুহূর্তেই এক সৈনিক তার কক্ষে প্রবেশ করে উত্তেজিতভাবে জানাল মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে ওপর থেকে নেমে আসা পাথরখণ্ডর আঘাতে মারাত্মক জখম হয়েছে একজন! কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষবদ্ধ করে রাহিল ছুটল সেখানে।

ক্ষীণ চাঁদের আলোতে মাথার ওপরে যেখানে সেই প্রস্তরমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার নীচেই সে জায়গা। জায়গাটা মশালের আলোতে আলোকিত, রাহিলের সৈনিকরা ও মন্দির-রক্ষীবাহিনীর সবাই জড়ো হয়েছে সেখানে। রাত জাগা কয়েকজন ভাস্করও উপস্থিত আছেন। বৃত্তাকারে জায়গাটা ঘিরে রেখেছে তারা। সেই বেষ্টনি ঠেলে রাহিল প্রবেশ করল সে জায়গাতে।

মশালের আলোতে মাটিতে পড়ে আছে একজন। মাথার খুলি চুরমার হয়ে গেছে তার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। তবে এখনও সামান্য প্রাণ আছে তার দেহে। মৃদু মৃদু কাঁপছে তার দেহ। একটা বেশ বড় ভারী প্রস্তরখন্ড পড়ে আছে তার দেহের পাশে। এত বড় প্রস্তরখণ্ড পাশ থেকে ছুড়ে মারা যায় না। নিশ্চই তা ওপর থেকে পড়েছে লোকটার মাথায়। লোকটা বাঁচবে না। রক্তাক্ত মুখমণ্ডল হলেও রাহিল চিনতে পারল তাকে। এ হল সেই লোক যে ক'দিন আগে রাহিলের চিৎকার শুনে ঠিক এ জায়গাতে উঠে এসেছিল। সে জায়গাতে মন্দির-রক্ষীবাহিনীর প্রধান প্রকটাক্ষও দাঁড়িয়ে আছে। তার বিস্ফারিত চোখ দুটোতে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। কে যেন একসময় বলল, 'মৃত্যুপথযাত্রীকে জল দাও।' রাহিল দেখল

BanglaBook.org

ভিড়ের মধ্যে মাহবাও আছেন। তিনিই সম্ভবত বললেন কথাটা।

রক্ষীদলের একজন এগিয়ে কোমরের জল ভর্তি চামড়ার থলি থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে লাগল তার মুখে। জলের স্পর্শেই মনে হয় শেষবারের মতো চোখ মেলল লোকটা। তার ডান হাতটা একবার মন্দির শীর্ষের দিকে নির্দেশ করেই মাটিতে খসে পড়ল। বিস্ফারিত চোখ দুটো আকাশের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। অন্ধকার কান্ডারীয় মন্দির শুষে নিল লোকটার প্রাণবায়ু। কী ইঙ্গিত করে গেল লোকটা? রাহিল একজনের হাত থেকে মশাল নিয়ে সেটা তুলে ধরল ওপর দিকে। আর তার দেখাদেখি আরও কয়েকজন একইভাবে মশাল তুলে ধরল মাথার দিকে। সম্মিলিত মশালের আলোতে মন্দিরের শীর্ষগাত্রের অস্পষ্টতা কিছুটা কেটে গেল।

রাহিল দেখতে পেল সেই নারীমূর্তির বিপরীত দিকের শূন্য তাকটার একটু নীচে পাথরখণ্ডের খাঁজে একটা বর্শা গাঁথা আছে! সম্ভবত ওই তাক লক্ষ্য করে নীচ থেকে ওই বর্শা ছুড়ে মেরেছিল লোকটা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেটা গেঁথে আছে পাথরের খাঁজে। কাকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুড়েছিল সে? সে কী সেই প্রেতাত্মা? সেই কী ওপর থেকে পাথর ছুড়ে হত্যা করল লোকটাকে? সেই বর্শাটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মন্দির-রক্ষীবাহিনীর অন্যদের মধ্যেও আতঙ্ক সঞ্চারিত হল। তাদের একজন কম্পিত স্বরে বলে উঠল, 'এ নিশ্চই সেই প্রেতাত্মার কাজ!'

রাহিল এক ধমকে থামিয়ে দিল তাকে। রাহিল উপস্থিত সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল হঠাৎই একজন টহলরত সৈনিক এ-জায়গা থেকে লোকটার আর্ত চিৎকার ও ভারী কিছু পতনের শব্দ শুনতে পায়। সে ছুটে এসে দেখতে পায় মাটিতে পড়ে থাকা রক্তাক্ত লোকটাকে। তারপর সৈনিকের চিৎকারে অন্যরা সমবেত হয় সেখানে।

রাহিল একটু ভেবে নিয়ে বলল, যদি লোকটাকে কেউ পাথর ছুড়ে মেরে থাকে তবে খুঁজে দেখতে হবে সে আততায়ী এখনও মন্দিরে আছে কিনা? আমার ধারণা সে কোনও প্রেতাত্মা নয়, হয়তো কোনও মানুষ। হয়তো সে এখনও মন্দিরেই আছে। তার অনুসন্ধান প্রয়োজন এখন। আর কিছু সময় পর ভোরের আলো ফুটবে। প্রধান ভাস্কর চিত্রবান উপস্থিত

BanglaBook.org

হবেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

রাহিল একটা মশাল হাতে সেই মৃতদেহ আগলে দাঁড়িয়ে রইল আর সেনা ও মন্দির-রক্ষীবাহিনীর লোকরা ছড়িয়ে পড়ল মন্দির-চত্বরে ঘাতককে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্য। যে ক'জন ভাস্কর সেখানে ছিল তারাও ফিরে চলল। শুধু যেতে গিয়েও রাহিলের ইশারায় দাঁড়িয়ে পড়লেন মাহবা।

সবাই সে জায়গা ত্যাগ করার পর রাহিল তাকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি সারারাত্ মন্দির-প্রাঙ্গণেই ছিলেন? আপনার নজরে কি অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়েছে?'

মাহবা বললেন, 'হ্যাঁ, ছিলাম। ফেরার কথা ছিল কিন্তু কাজ করতে করতে বিশ্রাম লাভের জন্য একটু বসতেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' এরপর তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছিলাম। অবশ্য তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সেটা আমার মনের ভুলও হতে পারে।

'আমি যেন দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি চত্বর পেরিয়ে মন্দিরগাত্র বেয়ে ওপরে উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সেটা মধ্যরাতের ঘটনা হবে হয়তো। তারপর কিছুক্ষণ আগে সৈনিকের চিৎকারে আমার ঘুম ভাঙে। অন্য সবার মতো আমি এখানে উপস্থিত হই।'

তার জবাব শুনে রাহিল আর কিছু বলল না। মাহবা পা বাড়ালেন অন্যদিকে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশে শুকতারা ফুটে উঠল। তারপর একসময় সেই তারা ক্ষীণ হতে হতে মুছে গিয়ে পুবের আকাশ লাল হতে শুরু করল। রাহিলের সৈনিকদল আর মন্দির-রক্ষীবাহিনীর লোকেরা এসে জানাল মন্দির-চত্বরে তারা কারো সন্ধান পায়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ল মন্দির চত্বরে। পর্ণকুটীর ছেড়ে দল বেঁধে ওপরে মন্দির-চত্বরে উঠে আসতে লাগল মজুর-শিল্পীর দল। খবরটা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, জায়গাটাতে ভিড় জমাতে শুরু করল তারা।

বিভৎস মৃতদেহটা দেখে কারও চোখে ফুটে উঠল ভয়ার্ত ভাব, কেউ বা আবার উত্তেজিতভাবে চাপাস্বরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে

BanglaBook.org

করতে তাকাতে লাগল ভোরের আলোতে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সেই মূর্তি আর তাকটার দিকে। আর এর কিছুক্ষণের মধ্যে প্রধান ভাস্কর চিত্রবান এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। আর তার সঙ্গে বিকর্নাও। চিত্রবান সেখানে উপস্থিত হয়েই প্রথমে মজুর-শিল্পীদের নিজেদের কাজে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন। ফিরে গেল তারা। চিত্রবান এরপর রাহিলের কাছে জেনে নিলেন ঘটনাটা। চিন্তার স্পষ্ট ভাঁজ ফুঁটে উঠল তার কপালে।

রাহিল জানতে চাইল, 'এই মৃতদেহর কী ব্যবস্থা করবেন?'

চিত্রবান বললেন, 'সূর্যোদয়ের আগে মৃত্যু হয়েছে বল্লভের। মৃতদেহ বাসী হয়ে গেছে। আপাতত দেহটা নীচের চত্বরে স্থানান্তরিত করা হোক। তবে প্রধান পুরোহিতকে এই সংবাদ প্রেরণ করতে হবে। তিনি নগরীর অভ্যন্তরে রওনা হয়ে গেছেন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। বিকর্না আর প্রকটাক্ষ তোমরা নগরীতে যাও। প্রধান পুরোহিতকে এ সংবাদ জানিয়ে বলো যে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যথাসম্ভব দ্রুত তিনি যেন মন্দিরে ফিরে আসেন। আর সেনাধ্যক্ষ রাহিল, মৃতদেহ স্থানান্তরিত হওয়ার পর আপনার সৈন্যরা মন্দিরের অভ্যন্তরে আর একবার অনুসন্ধান চালাক কোথাও কেউ লুকিয়ে আছে কিনা তা দেখার জন্য।'

প্রধান স্থপতির নির্দেশ পালনের জন্য তৎক্ষণাৎ বিকর্না আর বিকটাক্ষ রওনা হল নগরীর উদ্দেশ্যে। যাবার আগে বিকর্না চিত্রবানের অলক্ষ্যে পিছনে তাকিয়ে একটা হাসি ছুড়ে দিয়ে গেল রাহিলের দিকে। রাহিল খেয়াল করল সেটা।

বল্লভ নামে মৃত লোকটার প্রতি একটু বাড়তি সম্মান প্রদর্শন করা হল। মজুরদের মতো পায়ে দড়ি বেঁধে তাকে স্থানান্তরিত করা হল না। মন্দির-রক্ষীদের কয়েকজন একটা বাঁশের চালি নিয়ে এল। তার ওপর মৃতদেহটাকে শুইয়ে নীচের চত্বরে নামানো হল সেটা।

রাহিল এরপর তার সৈন্যদের নিয়ে এগোতে যাচ্ছিল আরও একবার মন্দির-চত্বর, মন্দিরের অভ্যন্তর ভালো করে খুঁজে দেখার জন্য। কিন্তু হঠাৎ মন্দির-প্রাঙ্গণের এক অংশ থেকে শোরগোলের শব্দ শোনা গেল। রাহিল, চিত্রবান আর তার সৈন্যদলকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটল সেদিকে।

মন্দির-প্রাঙ্গণের সে অংশে কাজ থামিয়ে জড়ো হয়েছে মজুরদের

BanglaBook.org

একাংশ। তাদের দৃষ্টি মন্দিরের মাথার দিকে নিবদ্ধ। রাহিলরা সেখানে উপস্থিত হতেই একজন মজুর মন্দিরগাত্রের মাথার দিকে আঙুল তুলে বলল 'ওই! ওই!—'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রাহিল সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। প্রাঙ্গণ থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে মন্দিরগাত্রে বসে আছে অদ্ভুত এক জীব। আকারে সে সম্ভবত মানুষের চেয়ে বড়, ঘন কৃষ্ণবর্ণের লোমে ছাওয়া দেহ, লম্বা গোঁফ অলা মুখমণ্ডল অনেকটা মানুষেরই মতো। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা মজুরদের উদ্দেশ্যে দাঁত খিঁচোচ্ছে প্রাণীটা। শ্বাপদের মতো হিংস্র দাঁত তার চোয়ালে। রাহিল এই অদ্ভুত জীব ইতিপূর্বে কোনওদিন দেখেনি। স্বগতোক্তির স্বরে সে বলে উঠল, 'এ কোন জীব!'

উত্তরটা মিলল তার পাশে দাঁড়ান চিত্রবানের মুখ থেকেই। তিনি বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ! কীভাবে মুক্ত হল প্রাণীটা! এ হল নারী-যোনি-লোভী কৃষ্ণবানর। মজুররা যেখানে থাকে সেখানেই এক পিঞ্জরে আটক ছিল প্রাণীগুলো।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একইরকম দেখতে আরও দুটো প্রাণী কাছেই একটা তাকের আড়াল থেকে লাফিয়ে এসে হাজির হল সেখানে। তিনটে প্রাণী মিলে দাঁত খিঁচোতে লাগল সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে।

প্রধান স্থপতি ও প্রধান ভাস্কর চিত্রবান উদ্বিগ্নভাবে বলে উঠলেন, 'ওদের এখান থেকে হঠাতে হবে। সুরকন্যাদের মূর্তি নির্মাণ চলছে, যোনির লোভে তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে এই কামুক নর-বানরেরা।'

তাঁর কথা শুনেই মনে হয় মন্দির-রক্ষীবাহিনীর একজন একটা প্রস্তরখণ্ড কুড়িয়ে নিয়ে সেটা সজোরে ছুড়ে মারল সেই অবমানবদের লক্ষ্য করে। সেটা তাদের গায়ে লাগল না। গিয়ে পড়ল তাদের কাছাকাছি একটা তাকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে এক কৃষ্ণবানর সেটা সংগ্রহ করে নিয়ে সেটা মানুষের মতো নীচের দিকে ছুড়ে মারল। তারপর লম্বা লাফে পুরো দলটাই এ-তাক ও-তাক অতিক্রম করে অন্তর্হিত হল অন্যদিকে।

রাহিলের মনে পড়ে গেল ভাস্কর মাহবার বলা কথা। অন্য একটা ভাবনাও এল তার মনে। সে চিত্রবানকে বলল, 'এই কৃষ্ণবানররা মানুষের

BanglaBook.org

সমগোত্রীয় বলে মনে হয়। এমন হতে পারে যে মৃত মন্দিররক্ষী তাদের লক্ষ্য করেই বর্শা নিক্ষেপ করেছিল, আর এই কৃষ্ণবানরের দল পাথর নিক্ষেপ করেছিল তার উদ্দেশ্যে?'

চিত্রবান বললেন, 'এমনটা হতেই পারে। এই বানরদের আচরণ মানুষের মতো। সম্ভবত কোনওভাবে মুক্তিলাভ করে তারাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে।'

চিত্রবানের কপালে স্পষ্টই চিন্তার ভাঁজ ফুটে উঠল। তিনি এরপর বললেন, 'এই বানররা সুযোগ পেলেই নারীদের আক্রমণ করবে। পিঞ্জরবদ্ধ অবস্থায় থাকার কারণে দীর্ঘকাল ধরে মানবযোনির স্বাদ থেকে ওরা বঞ্চিত। সে স্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করবে ওই কামুক অবমানব, নগ্ন নারীরা আরও বেশি আকর্ষণ করবে তাদের। উন্মুক্ত স্থানে নারীমূর্তি নির্মাণ আর সমীচীন হবে না। কিন্তু কাজও অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ভাস্করদের মূর্তি নির্মাণের বাকি কাজ বদ্ধ জায়গাতে করতে হবে। এ মর্মে তাদেরকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি।'

কথাটা শুনে রাহিলের মনে হল, 'তাহলে এদিনও আর তার মিত্রাবৃন্দার সঙ্গে দেখা হল না।

চিত্রবান এরপর রাহিলের কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনার সৈন্যরা কি পশু ধরতে পারদর্শী?'

এত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যেও তার কথা শুনে রাহিল হেসে ফেলে বলল, 'যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা অনেক সময় শত্রুসেনাদের ধরে ঠিকই, কিন্তু এ বিদ্যায় আমার সৈন্যরা পারদর্শী নয়।'

চিত্রবান জবাব দিলেন, 'আচ্ছা। অনুদেব ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে ব্যাপারটা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

এরপর কিছুটা স্বগতোক্তির স্বরেই তিনি আবার বললেন, 'কিন্তু ওদের মুক্ত করল কে?'

কথাগুলো বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না। উপস্থিত মজুরদের নিজেদের কাজে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে তিনি চিন্তান্বিতভাবে অন্যদিকে এগোলেন, সম্ভবত ভাস্করদের তার কথা জানাবার জন্য।

মৃতদেহ আগের জায়গা থেকে সরানো হয়ে গেছে, এ জায়গা থেকে

BanglaBook.org

মজুরদের জমায়েত ফাঁকা হয়ে গেল। রাহিল একই জায়গাতে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল যে সেই অদ্ভুত প্রাণীগুলোকে আবার দৃষ্টিগোচর হয় কিনা? তারপর সে এগোল মাহবার কাজের জায়গার দিকে। রাহিল জায়গাটাতে গিয়ে দেখল মাহবা আর বেশ কজন মজুর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। মজুররা রজ্জুবদ্ধ করছে মিত্রাবৃন্দার অর্ধসমাপ্ত মূর্তিটাকে। মাহবা রাহিলকে বললেন, 'প্রধান ভাস্কর নির্দেশ দিয়ে গেলেন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আর এ মূর্তি নির্মাণ হবে না। মন্দিরের অভ্যন্তরে এক কক্ষে নিয়ে যাচ্ছি মূর্তিটাকে। বাকি কাজ সেখানেই সম্পন্ন হবে।'

কথাটা শুনে রাহিল আবার হাঁটতে শুরু করল। এগোতে এগোতে সে ভাবতে লাগল ওই মন্দির রক্ষীবাহিনীর লোকটাকে হত্যা করল কে? ওই নারী-যোনি-লোভী অবমানব? নাকি কোনও মানুষ? যদি ওই বানরও তাকে হত্যা করে থাকে তবে তাদের মুক্ত করল কে? চিত্রবানকেও মন্দির-রক্ষীর মৃত্যুর চেয়েও এ ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবিত বলে মনে হল। তাহলে কি নির্দিষ্ট কোনও কারণ আছে তাদের মুক্ত করার পিছনে? দিনের বেলায় মন্দিরের অভ্যন্তর একবার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। উন্মুক্ত, নির্জন সব কক্ষ। সেখানে কোনও লোকের আত্মগোপন করা অসম্ভব নয়।—এসব কথা চিন্তা করে রাহিল কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবেশ করল মন্দিরের অভ্যন্তরে।

মজুর-ভাস্করের দল সাধারণত বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। কয়েকটি কক্ষ বর্তমানে বিকর্নার তত্ত্বাবধানে আছে। বাকি কক্ষগুলো মানবশূন্য। রাহিল আর তার সৈন্যদের থাকার জায়গা মূল মন্দিরের বাইরের চত্বরে কয়েকটি কক্ষ আছে সেখানে।

ভিতরে প্রবেশ করে রাহিল একটার পর একটা কক্ষ, অলিন্দ ধীর পায়ে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। কোথাও কেউ নেই, পুরু ঘাসের দেওয়ালের গায়ে জেগে আছে নানা দেবদেবী, পশুপাখির নানা মূর্তি। মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন হলে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর কক্ষগুলো নানা কাজে ব্যবহৃত হবে। কোনওটা হবে পুরোহিতদের বিশ্রাম কক্ষ, কোনওটা দেবদাসীদের আবাসস্থল, কোথাও ফুল, পূজার উপাচার সংগ্রহ করে রাখা হবে, কোথাও হবে দীপ প্রজ্বলনের ব্যবস্থা, কোথাও বা রন্ধনাগার। এই নির্জন কক্ষগুলো পরিপূর্ণ

BanglaBook.org

হয়ে উঠবে লোক সমাগমে। কিন্তু আপাতত সবই শূন্য, সবই নির্জন। আলো-আঁধারি খেলা করছে নির্জন কক্ষগুলোতে।

এ-কক্ষ ও-কক্ষ পরিভ্রমণ করতে করতে হঠাৎই একটা কক্ষর ভিতর থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ পেয়ে রাহিল সেই কক্ষের সম্মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কান খাড়া করতেই কয়েক মুহূর্তর মধ্যেই আবারও একটা মৃদু শব্দ ভেসে এল কক্ষর ভিতর থেকে।

নিশ্চিত কেউ আছে ভিতরে! রাহিল বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, 'ভিতরে কে?' কোনও জবাব দিল না।

তাহলে কি সেই আততায়ী লুকিয়ে আছে এই কক্ষে? মানুষ নাকি সেই কামুক বানর? রাহিল চকিতে তার তলোয়ার কোষমুক্ত করল। তারপর বেশ উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল, 'কে আছ?'

কক্ষ থেকে দ্বারের সামনে যে বেরিয়ে এল তাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল রাহিল; সে মিত্রাবৃন্দা! মিত্রাবৃন্দা তাকে হাতের ইশারায় চুপ করতে বলে তাকে কক্ষে প্রবেশ করতে বলল।

রাহিল কক্ষে প্রবেশ করল। মিত্রাবৃন্দা তার সামনে দাঁড়িয়ে। মৃদু হাঁফাচ্ছে সে। তার সুডৌল স্তনযুগল মৃদু ওঠানামা করছে। মিত্রাবৃন্দা বলল, বিকর্না বা অনুদেব মন্দিরে কেউ নেই। সেই সুযোগে তোমাকে মন্দিরে ঢুকতে দেখে কথা বলতে এলাম।'

রাহিল বলল, 'সায়াহ্নে, সূর্যাস্তের সময় তুমি আসো না কেন? আমি সেখানে তোমার প্রতীক্ষায় থাকি।'

মিত্রাবৃন্দা মৃদু হেসে জবাব দিল, 'জানি, তুমি আমার প্রতীক্ষা করো। কিন্তু অনুদেবের নিষেধে আমার ওই সময় প্রাঙ্গণে বেরোনো নিষেধ। বিকর্না বেরোতে দেয় না আমাকে। ভাস্কর মাহুবা যখন আমার মূর্তি নির্মাণ করেন, যখন তুমি এসে দাঁড়াও সেখানে, তখন মনে হয় তোমার দিকেই শুধু চেয়ে থাকি। কিন্তু সাহস হয় না। পাছে ব্যাপারটা অনুদেবের চোখে ধরা পড়ে তাই।'

মিত্রাবৃন্দার কথা শুনে বিস্মিত রাহিল জানতে চাইল, 'পুরোহিত অনুদেব হঠাৎ তোমার গতিরোধ করলেন কেন? তাঁর অভিপ্রায় কী?'

মিত্রা জবাব দিল, 'তিনি সবসময় চোখে চোখে রাখছেন আমাকে।

BanglaBook.org

তোমাকে দেখে আমি যে কম্পিত হয়েছিলাম, আমার কবরীবন্ধন থেকে পদ্মকোরক যে খসে পড়েছিল তা-ও খেয়াল করেছেন তিনি। আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের খবরও তার অগোচর নয়। বিকর্নাই হয়তো তাকে জানিয়েছে সেকথা। হয়তো তিনি আশঙ্কা করছেন যে তোমার সঙ্গে প্রেমজ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছি আমি। তাই এই প্রতিবন্ধকতা।'

রাহিল তাতে বিস্মিতভাবে বলল, 'কিন্তু তাতে কী যায় আসে প্রধান পুরোহিতের। যদি এ ঘটনা সত্যিও হয় তবে তাতে মন্দির রচনার কাজে তো বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা নেই?'

মৃদু চুপ করে থেকে মিত্রাবৃন্দা জবাব দিল, 'তা নেই। তবে অন্য কারণ আছে।'

'কী কারণ?'

একটু ইতস্তত করে মিত্রা বলল, 'প্রধান পুরোহিত আমার দেহের প্রতি আকর্ষিত। তিনি আমাকে শয্যাসঙ্গিনী রূপে পেতে চান। সে মর্মে তিনি ইঙ্গিতও দিয়েছেন আমাকে। তিনি চান না আমি অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করি।'

মিত্রার কথা শুনে চমকে উঠল রাহিল। সে বলল, 'তুমি কি তার প্রস্তাবে সম্মত?'

মিত্রা মৃদু হেসে বলল, 'না, সম্মত নই। আমি তাঁকে সে কথা জানিয়েও দিয়েছি। আমি আমার হৃদয় সঁপেছি অন্য কাউকে। এই শেষ কথাটা আমি অবশ্য তাঁকে অবগত করিনি।'

রাহিল প্রশ্ন করল, 'কাকে?'

বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। মিত্রা মাথা নত করে রইল। তারপর লজ্জিতভাবে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে বলল, 'এক সৈনিককে। তোমাকে।'

মিত্রার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক শিহরণ অনুভূত হল রাহিলের বুকের ভিতর। কোনও নারী তো দূরস্থ, কোনও পুরুষও তাকে বলেনি এ কথা! এক অনাস্বাদিত অনুভূতি যেন গ্রাস করল তাকে। যুদ্ধব্যবসায়ীর জীবন রাহিলের। রক্ত, মৃত্যু, এ নিয়েই তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে।

আজ এক নতুন কথা শুনল রাহিল। মিত্রার কথা যেন তার সৈনিকের কঠিন বর্ম খসিয়ে দিল। রাহিলের মনে হল তার সৈনিকের জীবন, তার

BanglaBook.org

শৌর্য্য, রক্তস্নান সব মিথ্যা। তার জীবনের একমাত্র সত্য তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে মিত্রা। কান্ডারীয় মন্দিরের ক্রীতদাসী মিত্রাবৃন্দা! রাহিল কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে না পেরে আঁধো অন্ধকারে মিত্রার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে মিত্রা মৃদু শঙ্কিতভাবে বলে উঠল, 'আর ক'দিনের মধ্যেই মূর্তি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে। তারপর হয় আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে নচেৎ ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রি করা হবে আমাকে। স্ত্রীর মর্যাদায় না হলেও তুমি কি ওই ক্রীতদাসী হিসাবে স্থান দেবে না আমাকে? ওই প্রস্তরখণ্ড আমারও মৃত্যুর কারণ হতে পারত, তবু আমি প্রাণরক্ষার চেষ্টা করেছি তোমার। সামান্য ক্রীতদাসী রূপেও কি তুমি আশ্রয় দেবে না আমাকে?'

মিত্রাবৃন্দার কাতর কণ্ঠস্বর অনুরণিত হতে লাগল রাহিলের কানে। রাহিলের জবাবের প্রত্যাশায় তার দিকে তাকিয়ে আছে মিত্রাবৃন্দা। রাহিল একসময় জবাব দিল, 'না, মিত্রা ক্রীতদাসী নয়, তোমাকে আমার হৃদয়ে স্থান দিয়েছি আমি। আমি রক্ষা করব তোমাকে। এই সৈনিকের জীবন, যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তস্রোত আমার ভালো লাগে না। তোমাকে নিয়ে এই মন্দির ত্যাগ করে অনেক দূরে চলে যাব। সৈনিকের সামান্য যেটুকু সঞ্চয় তা দিয়ে ঘর বাঁধব আমরা।' এই বলে মিত্রার গণ্ডদেশ স্পর্শ করল রাহিল। এই প্রথম সে স্পর্শ করল কোনও নারীদেহ। যৌনতা নয়, এক অপার ভালো লাগা যেন অনুভূত হল মিত্রার গণ্ডদেশ স্পর্শ করে। এ অনুভূতি যেন মিত্রার মধ্যেও সঞ্চারিত হল। চোখের পাতা মুদে কেঁপে উঠল সে। হয়তো এর নামই ভালোবাসা।

রাহিল বাম হস্তে স্পর্শ করেছে মিত্রার গণ্ড, ডান হস্তে ধরা আছে তার তরবারি। দীর্ঘদিন সে সেই তরবারি ধরে আছে। সে তরবারি যেন আজ খুব ভারী মনে হচ্ছে রাহিলের। তার ইচ্ছা হচ্ছিল সে তরবারি দূরে ছুড়ে ফেলে আলিঙ্গন করে মিত্রাকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংযত করল রাহিল। সে বুঝল তার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সহযোগী সে তরবারির এখনও প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে মিত্রাবৃন্দাকে রক্ষা করার জন্যই।

BanglaBook.org

একসময় রাহিল তার হাত খসিয়ে নিল মিত্রার গণ্ডদেশ থেকে। কিন্তু তার অঙ্গুলি যেন কেমন সিক্ত লাগছে। মিত্রার অশ্রু লেগে আছে সে হাতে। রাহিল বুঝতে পারল ব্যাপারটা।

মিত্রা চোখ মেলল। তারপর বলল, 'এখন আমি যাই। কেউ আমার অনুসন্ধানে আসতে পারে।' এই বলে মিত্রা ধীর পায়ে অন্তর্হিত হল কক্ষের অপর পার্শ্বে এক দ্বারের অন্তরালে। রাহিলও এরপর সে কক্ষ ত্যাগ করে, মন্দিরের অন্তঃপুর ত্যাগ করে এসে দাঁড়াল আলোকোজ্জ্বল মন্দির-প্রাঙ্গণে। আবারও অন্য সময়ের মতো মন্দির-চত্বর পরিভ্রমণ করতে লাগল সে। তবে এক ঘোরের মধ্যে।

মন্দির-চত্বরে মজুর-ভাস্করদের কোলাহল, হাতুড়ি-ছেনির শব্দ অতিক্রম করে তার কানে বাজতে লাগল মিত্রার কথাগুলো। রাহিল হিসাব কষতে লাগল কত সঞ্চয় আছে তার। প্রয়োজনে সে জীবনের সব সঞ্চয় দিয়ে ক্রয় করবে মিত্রাবৃন্দাকে।

বৈকালের কিছু আগে ব্যস্তসমস্ত হয়ে মন্দিরে ফিরলেন অনুদেব। তার সঙ্গে বিকর্না আর প্রকটাক্ষ। তিনি যখন মন্দিরে পদার্পণ করলেন তখন আবার মজুরদের মধ্যে শোরগোল উঠল, 'ওই! ওই!'

আবার মন্দিরগাত্রে দেখা গেল সেই তিন অবমানবকে। মন্দিরের এক তাকে এসে বসেছে তারা। প্রথমবার ভোরবেলা দর্শন দেওয়ার পর ইতিমধ্যে বার কয়েক দর্শন দিয়েছে প্রাণীগুলো। তাদের দেখে প্রতিবারই শোরগোল উঠেছে। সেই চিৎকারে অন্তর্হিত হয়েছে কমিক অবমানবের দল। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। চিৎকার শুনে কোথায় যেন প্রাণীগুলো লুকাল। কিন্তু তার আগেই অনুদেব দেখতে পেলেন তাদের। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল অনুদেবের। তিনি রক্ষীবাহিনীর লোকটার মৃত্যুর কথা শুনেছেন বিকর্নার কাছে, কিন্তু কৃষ্ণবাঁদরের মুক্তির ব্যাপারটা তিনি জানতেন না। কারণ, বিকর্নাদেরও জানা ছিল না ব্যাপারটা।

অনুদেব মন্দির-চত্বরে উপস্থিত হতেই প্রায় একইসঙ্গে রাহিল আর চিত্রবান উপস্থিত হল তাঁর সামনে। প্রধান পুরোহিত বেশ উত্তেজিতভাবে জানতে চাইলেন, 'কখন, কীভাবে মুক্ত হল কৃষ্ণবানররা? কে মুক্ত করল?'

চিত্রবান বললেন, 'ভোরের আলো ফোটার পরই ওদের দেখা যায়।

BanglaBook.org

হয়তো বা রাতেই মুক্ত হয়েছে। গতকাল দ্বিপ্রহরে যখন মন্দির-রক্ষীবাহিনীর বল্লারী ওদের খাবার দিতে যায়, তখনও ওরা নাকি বন্দিই ছিল।'

অনুদেব বললেন, 'কোথায় বল্লারী?'

মাঝবয়সি একজন লোক এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল তাদের সামনে। কাঁপছে লোকটা।

অনুদেব তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কীভাবে মুক্ত হল বানরেরা? নির্ঘাত খাবার দেবার পর তুমি পিঞ্জরের অর্গল বন্ধ করোনি। তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দেব।'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে অনুদেবের পায়ে পড়ে কেঁদে উঠে বলতে লাগল, 'বিশ্বাস করুন প্রভু, আমি নিশ্চিত অর্গল বন্ধ করেছিলাম। কোনও গাফিলতি করিনি। ওরা কীভাবে মুক্ত হল জানি না। বিশ্বাস করুন প্রভু...'

অনুদেব রুষ্টভাবে বলে উঠলেন, 'তাহলে কি বলতে চাচ্ছিস ওরা নিজেরাই অর্গল মুক্ত করল? ভালো চাস তো দোষ স্বীকার কর!'

বল্লারী অনুদেবের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি সত্যিই অর্গল বন্ধ করেছিলাম প্রভু। দোহাই আমাকে দণ্ড দেবেন না। হয়তো অন্য কেউ মুক্ত করেছে ওদের...'

কী যেন একটা বলতে গিয়েও তার কথা শুনে কেমন যেন থমকে গেলেন অনুদেব। তারপর এক লাথিতে বল্লারীকে দূরে ছিটকে ফেলে খড়মের শব্দ তুলে হাঁটতে শুরু করলেন। তাকে অনুসরণ করল অন্যরা।

অনুদেবের সঙ্গে এসে রাহিলরা উপস্থিত হল মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগের সেই জায়গাতে যেখানে মৃত্যু হয়েছিল সে লোকটার। জায়গাটা ভালো করে দেখলেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন মাথার ওপর সেই মূর্তিটা আর নীচে পাথরের খাঁজে আটকে থাকা বর্শাটার দিকে।

তারপর প্রশ্ন করলেন, 'কোন প্রহরের ঘটনা এটা?'

রাহিল জবাব দিল, 'শেষ প্রহরের।'

প্রধান পুরোহিত এবার চিত্রবানের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন, 'সৈনিকরা ছাড়া রাত্রে মন্দির-প্রাঙ্গণে কোন কোন ভাস্কর-মজুররা ছিল?'

প্রধান স্থপতি জবাব দিলেন, 'মজুররা কেউ ছিল না। তবে চারজন ভাস্কর আলাদা আলাদা স্থানে মূর্তি নির্মাণে নিয়োজিত ছিল।'

BanglaBook.org

'কারা তারা?'

'সুসেন, মাধবরাজ, স্থূলকোটি আর মাহবা।'—জবাব দিলেন চিত্রবান।

'মাহবা।'—অনুদেব যেন অস্পষ্টভাবে একবার নামটা উচ্চারণ করলেন চিত্রবানের কথা শুনে।

চিত্রবান এবার তাকে বললেন, 'আমার কিন্তু অনুমান; ওই কৃষ্ণবানররাই পাথর নিক্ষেপ করেছে।'

অনুদেব বললেন, 'হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। মন্দির-রক্ষীর মৃত্যুর চেয়েও বড় কথা কৃষ্ণবানরের দল মুক্ত হল কীভাবে? বল্লারীর আচরণ দেখে মনে হচ্ছে সে সত্যি কথাই বলছে। তবে কে কী উদ্দেশ্যে মুক্ত করল ওদের?'

কথাটা বলে প্রশ্নর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলেন অনুদেব। তাঁর কপালে ফুটে উঠেছে চিন্তন রেখা।

বেশ কিছুক্ষণ ভাবার পর তিনি বললেন, 'সুরসুন্দরীদের মন্দির প্রাঙ্গণে বেরোনো বন্ধ। ভাস্কররা যেন তাদের নিয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরেই কাজ করে। তিন দিন পর অমাবস্যা। ভাস্করদের জানিয়ে দিন এই তিনদিনের মধ্যে মূর্তি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে এই নারীদের। চতুর্থ দিন সকালে নতুন নারীরা আসবে। মজুর-শিল্পীদের জানিয়ে দাও এ-ক'দিন কর্তব্যের সামান্য গাফিলতি চলবে না। আর একদল মজুর যাবে এই কান্ডারীয় মন্দির আর লক্ষণ মন্দিরের মধ্যবর্তী অংশে যে গুল্ম আচ্ছাদিত স্থান আছে সেখানে। দশ হাত পরিধি আর পঞ্চাশ হাত গভীর কূপ খনন করতে হবে সেখানে। সে কাজও অবশ্যই যেন তিনদিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়।'

চিত্রবান বললেন, 'কিন্তু ওই স্থান তো কূপখননের অনুপযুক্ত। জল উঠবে না।'

অনুদেব বললেন, 'সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমার। ওই স্থানেই কূপ খনন করা হবে। এই রাজনির্দেশ না মানলে তুষানলে দগ্ধ করা হবে মজুরদের।'

চিত্রবানের প্রতি এ কথাগুলো বলার পর অনুদেব রাহিলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই তিনদিন, তিনরাত আপনি আপনার সম্পূর্ণ সেনাদল নিয়ে

BanglaBook.org

মন্দিরে পাহারা দেবেন। কাউকে বিশ্রামে পাঠাবেন না। মন্দির-রক্ষীবাহিনীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কাল অথবা পরশু আমি আবার সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব। মহাসৈনাধ্যক্ষ উগ্রায়ুধের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করব। যাতে তিনি এখানে এক বৃহৎ সেনাদল মোতায়েন করেন কিছুদিনের জন্য।

মন্দির-রক্ষীবাহিনীর লোকটার মৃত্যু, কৃষ্ণবানরদের মুক্তি জানান দিচ্ছে আপনার এই ক্ষুদ্র সেনাদল বা মন্দির-রক্ষীবাহিনী এই মন্দিরের নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া ভাস্কর-মজুরদের থাকার জায়গাতেও সৈনিকবাহিনী মোতায়েন করতে হবে। সৈন্যদের বড় দলটা চলে এলে আপনাদের ছুটি। আমি উগ্রায়ুধকে জানাব যে আপনার পদোন্নতি ঘটিয়ে নগরীর সেনাদলে সংযুক্ত করতে। তবে এই শেষ ব্যাপারটা নির্ভর করছে আগামী তিনদিন আপনার কর্মকুশলতার ওপর।'

রাহিল হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করে ফেলল, 'সুরসুন্দরীদের নতুন দল তো আসবে। যারা আছে তাদের কী করা হবে? মুক্তি দেওয়া হবে নাকি আবার দাসের হাটে বিক্রি করা হবে?' প্রশ্নটা করা উচিত না হলেও মিত্রার কথা ভেবে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে।

অনুদেবের ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠল। তিনি প্রথমে বললেন, 'ওদের সম্পর্কে আপনার বেশ আগ্রহ দেখছি!'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'বিক্রি করে দেবার ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু বাধ সাধলেন স্বয়ং সম্রাট বিদ্যাধর। ওদের বিক্রি করা হবে না। সম্রাট বিদ্যাধরের অপার করুণা। তিনি ওদের মুক্তি দেবেন। ওদের কাউকেই আর ক্রীতদাসীর জীবন কাটাতে হবে না।'

খবরটা শুনেই খুশিতে নেচে উঠল রাহিলের মন। মুক্তি পেতে চলেছে মিত্রা। খবরটা পৌঁছে দিতে হবে তার কাছে। কিন্তু সে তার মনের ভাব গোপন রেখে প্রধান পুরোহিতকে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ তিনদিন আমি ও আমার সেনারা সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি রেখে চলব।'

স্মিত হাসলেন অনুদেব। সম্ভবত তিনি সন্তুষ্ট হলেন রাহিলের কথায়। তবে তার কপালের ভাঁজ কমল না।

মন্দিরের সামনের অংশে আবার একটা শোরগোল উঠল। রাহিলরা অনুমান করল আবার নিশ্চই সে অংশে কৃষ্ণবানরের দেখা মিলেছে।

BanglaBook.org

চিত্রবান এবার অনুদেবকে বললেন, 'ওই কৃষ্ণবানরদের নিয়ে কী করা হবে? বর্তমানে যে সুরসুন্দরীদের মূর্তি রচনা হচ্ছে তার বাকি কাজ নয় বদ্ধকক্ষে শেষ করা গেল। কিন্তু আবারও নতুন দল আসবে। তাদের নিয়ে নতুন মূর্তি নির্মাণ করবে ভাস্কররা। ওভাবে বদ্ধকক্ষে কাজ করা তো অসুবিধাজনক। সূর্যালোকে তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব যেভাবে ভাস্করদের চোখে ধরা দেবে তা মশালের আলোতে দেবে না। তার ওপর মিথুন-মূর্তি বা নগ্নিকা মূর্তি যাঁরা রচনা করেন তাঁরা অনেকেই বৃদ্ধ। যুবকের দৃষ্টিশক্তি তাদের নেই।'

অনুদেব বললেন, 'প্রাণীগুলোকে হত্যা করতে হবে। ওদের ভাস্কর্য রচনা হয়ে গেছে। আর ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। একটু পরই সন্ধ্যা নামবে। আজ আর কিছু করা যাবে না। আজকের রাতটুকু ওদের থেকে সাবধানে থাকতে হবে। কাল সকালে তিরন্দাজ আসবে। তারা শর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে ওদের।'

কথা শেষ করে রাহিলকে আর প্রকটাক্ষকে তাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনুদেব চিত্রবান আর বিকর্নাকে নিয়ে রওনা হলেন মন্দিরের সম্মুখ ভাগে। কীভাবে রাতপাহারার ব্যবস্থা হবে তা নিয়ে সামান্য কয়েকটা বাক্যালাপ করল রাহিল আর প্রকটাক্ষ। অন্ধকার নামল কিছুক্ষণের মধ্যেই। নিজের সৈন্যবাহিনীকে প্রথমে একত্রিত করে তাকে চারভাগে মন্দিরের চারদিকে নিয়োজিত করে রাতপ্রহরার কাজ শুরু হল। নির্বিঘ্নেই কেটে গেল সারা রাত। পুব আকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করল একসময়।

BanglaBook.org

৮

আলো ফোটার পর প্রতিদিনের মতোই নির্দিষ্ট সময় মন্দির-চত্বরে হাজির হল ভাস্কর-মজুরদের দল। কিছু সময়ের মধ্যেই চত্বরে হাজির হলেন চিত্রবান আর অনুদেব। তাঁদের সঙ্গে চারজন লোক। কাঁধে ধনুক-শর। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তাদের চেহারা। রক্তবর্ণের বস্ত্রের খণ্ড বাঁধা কেশরাশি, ক'টি

দেশে পশুচর্ম। রাহিলের তাদের দেখে মনে হল তারা বনচারী ব্যাধ সম্প্রদায়ের অনার্য লোক হবে। তাদের হাবেভাবে, শরীরে, পরিচ্ছদে বন্যতা প্রকট হয়ে আছে। সম্ভবত অনতিদূরে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশই তাদের বিচরণভূমি।

প্রতিদিন ভোরে মজুর-শিল্পীরা মন্দিরের সামনের চত্বরে একসঙ্গে জমায়েত হয়। তেমনই এদিনও এক জায়গাতে জমায়েত হল প্রধান ভাস্কর ও স্থপতি চিত্রবানের থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবার জন্য। প্রকটাক্ষর তত্ত্বাবধানে চিত্রবান মজুরদের একটা বৃহৎ দলকে পাঠালেন কান্ডারীয় মন্দির ও লক্ষণ মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে পতিত জমিতে কূপ খননের জন্য। বাকিদের তিনি নির্দেশ দিলেন পূর্বদিনের কার্যে নিযুক্ত হতে। তাদের কাজ বুঝিয়ে দেবার পর চিত্রবান অনুদেবের নির্দেশমতো তাদের জানালেন যে মন্দিরে কৃষ্ণবানরের দর্শন পেলে কেউ যেন শোরগোল না করে, কৃষ্ণবানরেরা যেন ভীত না হয়। এবং তাদের মন্দিরশীর্ষে দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই যেন অবগত করা হয় তাকে।

চিত্রবানের নির্দেশ পেয়ে নিজেদের কাজে নিযুক্ত হল মজুর-ভাস্কররা। বিকর্নাও উপস্থিত হয়েছিল অনুদেবের কাছে। শর নিক্ষেপকারী ব্যাধদের একজনকে অনুদেব বিকর্নাকে অনুসরণ করতে বললেন। একজন লোককে নিয়ে বিকর্না অন্তর্হিত হল মন্দিরের অভ্যন্তরে। একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে রইল রাহিল, চিত্রবান, অনুদেব ও তিনজন ব্যাধ।

কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর রাহিল আর বিকর্না ফিরে আসতে লাগল সঙ্গে এক অবগুণ্ঠনবতী নারীকে নিয়ে। তা ছাড়া বিকর্নার হাতে এক বৃহৎ কদলী ছড়াও আছে। তারা এসে দাঁড়াল অনুদেবের সামনে। তারপর সেই নারীকে দেখিয়ে অনুদেবের কাছে জানতে চাইল, 'সাজ কেমন হয়েছে?'

মুহূর্তের জন্য তার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করল সেই নারী। কিন্তু তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল রাহিল। নারী কোথায়! এ তো পুরুষ! সেই ব্যাধ, যে বিকর্নার সঙ্গে স্থানান্তরে গেছিল। নারীবেশে, কাঁচুলি, ঘাগড়া, কৃত্রিম কেশ এমনকী পায়ে নূপুর, কণ্ঠহার ইত্যাদি আভূষণে নারীবেশে সজ্জিত করা হয়েছে তাকে। অবগুণ্ঠনরত অবস্থায় কেউ তাকে পুরুষ

BanglaBook.org

ভাববে না।

অনুদেব তার দিকে ভালো করে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'অতি উত্তম।'

ঠিক সেই সময় একজন মজুর এসে খবর দিল কৃষ্ণবানরদের মন্দিরের পূর্বভাগে শীর্ষগাত্রে দেখা গেছে। সেখানে একটা তাকে ভোরের আলোতে তারা বসে আছে। খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে অনুদেব সদলবলে চললেন সেদিকে।

সে জায়গাতে পৌঁছে রাহিলরা দেখল খবর সঠিক। মন্দিরগাত্রের বেশ উঁচু একটা তাকে উজ্জ্বল আলোতে বসে আছে সেই তিন কৃষ্ণবানর। তারা প্রায় মানুষের মতো দেখতে। আকারেও মানুষের মতো। তবে তাদের সারা দেহ ঘন কৃষ্ণবর্ণের রোমে আচ্ছাদিত।

সে জায়গাতে পৌঁছেই অনুদেব উপস্থিত মজুরদের সরিয়ে দিলেন সে জায়গা থেকে। একজন ব্যাধ সেই কদলী ছড়া নিয়ে উঠতে শুরু করল মন্দিরগাত্র বেয়ে, তাকে ওপরে উঠতে দেখেই কৃষ্ণবানরের পুরো দলটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁত খিঁচোতে শুরু করল। প্রকাশিত হতে লাগল তাদের তীক্ষ্ণ স্বদন্ত।

লোকটা কিছুটা ওপরে উঠে মন্দিরগাত্রের সর্বনিম্ন তাকটাতে রাখল সেই পক্ক কদলী ছড়া। তারপর সে নীচে নেমে এল। নারীবেশী সেই ব্যাধ ঠিক সে জায়গার ঠিক নীচে মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক প্রস্তরখণ্ডর ওপর বানরদের দিকে পিছন ফিরে বসল।

অনুদেব, চিত্রবান, রাহিল, বিকর্না ও অপর তিনজন ব্যাধ এরপর গিয়ে আত্মগোপন করল কিছুটা তফাতে প্রাঙ্গণের একপাশে স্তম্ভ-ঘেরা মণ্ডপের আড়ালে। যেখান থেকে মন্দিরগাত্র, নীচে বসে থাকা নারী সাজে সজ্জিত সেই ব্যাধকে দৃষ্টিগোচর হয়।

নিঃস্তব্ধভাবে কেটে গেল কিছু সময়। কৃষ্ণবানরদের দৃষ্টি পড়ল সেই পক্ক কদলীগুলোর ওপর। ক্ষুধার্ত তারা। এতদিন হয়ে গেল খাদ্য জোটেনি তাদের। সতৃষ্ণ নয়নে তারা তাকাতে লাগল সেই কদলী ছরা ও নীচের প্রাঙ্গণের দিকে। তারপর খাদ্যের আকর্ষণে তারা একে একে এ-তাক ও-তাক অতিক্রম করে লাফিয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে। তারপর সর্বনিম্ন

BanglaBook.org

তাকে পৌঁছে কদলী ভক্ষণ করতে লাগল।

রাহিল খেয়াল করল তার পাশে দাঁড়ানো তিনজন ব্যাধ শর যোজনা করল তাদের ধনুকে। কিন্তু তারা শর নিক্ষেপ করল না। রাহিলের চমকিত হতে তখনও আরও কিছু সময় বাকি ছিল।

কদলী ভক্ষণ করে চলল কৃষ্ণবানরের দল। যখন তাদের ভক্ষণ প্রায় শেষ হতে চলেছে ঠিক সেই সময় পা নাড়িয়ে নূপুরের ছমছম শব্দ করল সেই নারীবেশী পুরুষ। শব্দটা কানে যেতেই চমকে উঠে নীচে প্রাঙ্গণের দিকে তাকাল সেই কৃষ্ণবানরের দল। প্রস্তরখণ্ডর ওপর বসে থাকা সেই ছদ্মনারীকে দেখতে পেল তারা।

প্রাঙ্গণের চারপাশে আর কেউ নেই। উদরপূর্তির পর সেই নারীকে দেখে কেমন যেন চঞ্চলতা শুরু হল কৃষ্ণবানরদের মধ্যে। তাক থেকে ঝুঁকে পড়ে তারা দেখতে লাগল তাকে।

রাহিল এবার ব্যাপারটা অনুধাবন করল। ছমছম শব্দে আবারও একবার মল বাজাল সেই ছদ্মনারী।

কৃষ্ণবানরের দল চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিল অন্য কেউ কোথাও আছে কিনা। তারপর নিঃশব্দে তাক ছেড়ে নীচে নামল এক কৃষ্ণবানর। তারপর অন্য দুজনও। লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছে তারা। উদরতৃপ্তির পর তাদের যৌনতৃপ্তি মেটাবে ওই নারী। কিছুটা তফাতে তফাতে তারা সন্তর্পণে এগোতে থাকল তাদের দিকে পিছন ফিরে বসে থাকা সেই নারীর দিকে।

ঠিক এই সময় পাশ থেকে ধনুকের ছিলা টানার শব্দ হল। তিনটে শর একসঙ্গে ছুটে গেল সামনের দিকে। প্রথম কৃষ্ণবানর যখন লাফ দিল নারীদেহ লক্ষ্য করে, ঠিক তখনই তার পাঁজরে শর গিয়ে বিঁধল। বীভৎস চিৎকার করে উঠল প্রাণীটা। অপর দুটো শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাথুরে দেওয়ালে আঘাত পেয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুলল।

পশ্চাদ্‌গামী কৃষ্ণবানর দুটো আতঙ্কিত হয়ে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে অন্যদিকে ছুটলেও প্রথম বানরটা শরবিদ্ধ অবস্থাতেই গিয়ে পড়েছে সেই ছদ্মনারীর ওপর। প্রচণ্ড ঝটাপটি শুরু হল তাদের দুজনের মধ্যে। ব্যাধ আর কৃষ্ণবানরের আর্তনাদে সচকিত হয়ে উঠল প্রাঙ্গণ।

BanglaBook.org

ব্যাধের দল ছুটল সেই মরণ আলিঙ্গনরত মানব আর অবমানবের দিকে।

কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে তারা দেখতে লাগল সেই লড়াই। আর শর নিক্ষেপের উপায় নেই। কারণ সেই শরের আঘাত লাগতে পারে লোকটার দেহেও। কিছু সময়ের মধ্যেই অবশ্য লড়াই থেমে গেল। মাটিতে রক্তস্রোতের মধ্যে পড়ে রইল নিশ্চল দুটো দেহ।

রাহিলরা কাছে গিয়ে দেখল শরের আঘাতে কৃষ্ণবানরের মৃত্যু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তার স্বদন্ত ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে নারীবেশী ব্যাধের কণ্ঠদেশ। মৃত্যুর আগে সেই কৃষ্ণবানর শাস্তি দিয়ে গেছে প্রতারককে। মৃত প্রাণীটার দিকে কাছ থেকে বিস্মিতভাবে তাকাল রাহিল। অবিকল যেন মানুষের মতো চেহারা তার। মুখমণ্ডলে আছে মানুষের মতো ঝোলা গোঁফ আর দাড়ি। তবে তার মুখমণ্ডল বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। মুখগহ্বরের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে তীক্ষ্ণ স্বদন্ত। মানুষের যা থাকে না।

প্রাণীটার দেহের যে জিনিসটা রাহিলের সবথেকে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হল তার দীর্ঘ শিশ্নদেশ। তখনও দণ্ডায়মান সেই শিশ্নদেশ যেন নিষ্ফল আক্ষেপে কেঁপে চলেছে! নারী-যোনি-লোভী কামুক কৃষ্ণবানরের শিশ্ন! মৃত কৃষ্ণবানরের অপর দুই সঙ্গী তখন মন্দিরপ্রাঙ্গণ, নীচের চত্বর অতিক্রম করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অনতিদূরে বনের গভীরে। রাহিল খেয়াল করল বিকর্না অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মৃত অবমানবের সেই দণ্ডায়মান শীষ্ণের দিকে।

ব্যাধের দল ভাবতে পারেনি তাদের সঙ্গী নিহত হবে এভাবে। কিছুক্ষণ মৃত সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থেকে তারা মন্দির ছেড়ে রওনা হল বনের দিকে হত্যাকারী দুই বানরকে নিধনের জন্য।

অনুদেব বললেন, 'ব্যাধেরা বানর দুটোকে হত্যা করতে পারুক আর না পারুক তারা আর মন্দিরে আসবে বলে মনে হয় না। তবুও সাবধানে থাকতে হবে।'

মৃত ব্যক্তি আর বানরের আর্ত চিৎকারে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল কিছু মজুর। অনুদেব তাদের মৃতদেহ দুটোকে মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে দূরে

BanglaBook.org

স্থানান্তরের নির্দেশ দিলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মন্দির ত্যাগ করে রওনা হলেন সেখানে, যেখানে কূপ খনন করছে মজুরদের অন্য দল। বিকর্নাও তার সঙ্গী হল।

তারা চলে যাওয়ার পর রাহিলের মনে হল মাহবা নিশ্চই মন্দিরের অভ্যন্তরে কোনও কক্ষে মিত্রার মূর্তি নির্মাণ করছেন। সেখানে মিত্রার উপস্থিতিও অসম্ভব নয়। কথাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরার অছিলায় রাহিল প্রবেশ করল মন্দিরের অন্তঃপুরে। মন্দিরের ভিতর এক নির্জন কক্ষেই রাহিল পেয়ে গেল মাহবাকে।

মিত্রার মূর্তি নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে। মশালের আলোতে বৃদ্ধ ভাস্কর মাহবা তার বলিরেখাময় মুখ তুলে চাইলেন রাহিলের দিকে। ঠোঁটের কোণে তার আবছা হাসি ফুটে উঠল। রাহিল মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঃ, নির্মাণকার্য তো প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছেন! একেবারে জীবন্ত লাগছে মূর্তিটাকে!'

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'গতকাল সারাদিন, সারারাত ধরে কাজ করেছি। আর একবার শুধু মিত্রাবৃন্দাকে এসে দাঁড়াতে হবে। আশা করছি আগামী কাল রাতের মধ্যেই আমার এই নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে।'

এ কথা বলার পর তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি এখানে প্রস্তর মূর্তির সন্ধানে এসেছেন? নাকি রক্তমাংসর মূর্তির?'

বৃদ্ধ ভাস্করের কথার ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হল না রাহিলের। এরপর তিনি বললেন, 'মূর্তি নির্মাণের প্রথম দিন আপনি এসে দাঁড়াতেই কেঁপে উঠেছিল মিত্রাবৃন্দা। পদ্মকোরক খসে পড়েছিল তার কবরীবন্ধন থেকে। ব্যাপারটা আমি খেয়াল করেছি।'—এ কথা বলার পর কৌতুকের ভাব ফুটে উঠল তার বলিরেখাময় মুখে।

রাহিল বুঝতে পারল এই বৃদ্ধর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি সে। একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'মিত্রাবৃন্দাকে একটা সংবাদ দিতে এসেছিলাম, ভাবলাম হয়তো সে এখানে আছে। আপনার সঙ্গে দেখা হলে আপনিও সে সংবাদ তাকে দিতে পারেন।'

'কী সংবাদ?'

রাহিল বলল, 'প্রধান পুরোহিত সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি

BanglaBook.org

জানালেন সুরসুন্দরীদের আর দাসব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করা হবে না। সম্রাট নাকি তাদের মুক্তি দিতে বলেছেন। সম্ভবত অমাবস্যার দিন, অর্থাৎ আর দু-দিনের মধ্যেই মুক্তি পাবে মিত্রাবৃন্দা।'

তার কথা শুনে মাহবা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, 'এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

রাহিল বলল, 'অনুদেব আমাকে নিজ মুখে জানিয়েছেন এ কথা।'

মাহবা বললেন, 'মিত্রাবৃন্দা যদি মুক্তি পায় তবে আপনি কী করবেন তাকে নিয়ে? দাসী বানাবেন?'

রাহিল জবাব দিল, 'না, দাসী নয়, আমার সামান্য কিছু সঞ্চয় আছে, ইচ্ছা আছে সে সঞ্চয় দিয়ে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার। যুদ্ধব্যবসায়ীর পেশা আর ভালো লাগছে না আমার।'

এ কথা বলার পর সে বলল, 'আপনার সঙ্গে হয়তো আর দু-তিনদিন পর আর আমার সাক্ষাৎ হবে না। অনুদেব জানিয়েছেন আর দু-তিন দিনের মধ্যেই তিনি এক বৃহৎ সেনাদল আনয়ন করবেন এখানে। তারপর সম্ভবত আমার আর আমার ক্ষুদ্র সেনাদলের ছুটি হয়ে যাবে। সেনাদল আসার ব্যাপারে কথা বলার জন্য সম্ভবত আগামীকাল প্রধান পুরোহিত অনুদেব মহাসৈনাধ্যক্ষ উগ্রায়ুধের সঙ্গে পরামর্শ করতে যাবেন।'

রাহিলের কথাগুলো শুনে এবার স্পষ্টতই চমকে উঠে বৃদ্ধ জানতে চাইলেন, 'বৃহৎ সৈন্যদল আনয়ন করা হচ্ছে কেন?'

রাহিল উত্তর দিল, 'শিল্পী-মজুরদের বাসস্থানের ওপর নজর রাখা ও মন্দিরের নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করার জন্য। পাথরচাপা পড়ে লোকটার মৃত্যু, কৃষ্ণবানরদের মুক্ত হওয়া—এসব ঘটনা সম্ভবত কোনও সন্দেহের উদ্রেক ঘটিয়েছে প্রধান পুরোহিতের মনে।'

মাহবা সামান্য কিছু সময় ভেবে নিয়ে বললেন, 'সৈন্যবাহিনীর আগমন, কূপ খনন কেমন যেন অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে আমার মনে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কেমন যেন দুর্বিপাক নেমে আসতে চলেছে মন্দিরে। তার থেকে রক্ষা পাবে না সুরসুন্দরীরাও। আপনি এসবের পিছনে প্রধান পুরোহিতের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সম্রাটের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানার চেষ্টা করুন।'

রাহিল বলল, 'এ প্রসঙ্গে অনুদেব বা চিত্রবানকে প্রশ্ন করা সম্ভব নয়

BanglaBook.org

মাহবা বললেন, 'চিত্রবানকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না অনুদেব। বিকর্না কাল নগরীতে অনুদেবের সঙ্গী হয়েছিল। সে কিছু জানলে হয়তো আপনাকে জানাতে পারে।'

রাহিল বিস্মিতভাবে বলে উঠল, 'সে আমাকে এ কথা বলবে কেন?'

একটু চুপ করে থেকে মাহবা উত্তর দিলেন, 'সে অনুদেবের প্রতি আসক্ত ছিল। দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল। কিন্তু অনুদেব প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে। আমি গতকাল আড়াল থেকে তাদের বাদানুবাদ শুনেছি। অনুদেব তাকে সতর্ক করেছেন যদি এ সম্পর্ক কারো কাছে প্রকাশ পায় তবে তিনি তার মৃত্যুদণ্ড দেবেন।'

রাহিল চমকে উঠে বলল, 'কিন্তু বিকর্না তো নারী নয়, বৃহন্নলা! কে কীভাবে আসক্ত হবে?'

মাহবা বললেন, 'বৃহন্নলা হলেও প্রতিটা মানুষের মতো তার মনে রক্তেও যৌনতা আছে। স্বাভাবিক নারী-পুরুষের মতো সে মিলিত হতে পারে না বলেই তার যৌন আকাঙক্ষা আরও তীব্র। আর অনুদেবের কাম-লালসাও কম তীব্র নয়। তাদের দুজনের কথা শুনে বুঝেছি তিনি যৌনক্রীড়া করেছিলেন বিকর্নার সঙ্গেও। বিকর্না নিজেকে নারীরূপে কল্পনা করে। আমার অনুমান অনুদেব বর্তমানে আপনার প্রেয়সীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করছেন।'

রাহিল জবাব দিল, 'হ্যাঁ, মিত্রা আমাকে সে কথা জানিয়েছে।'

মাহবা বললেন, 'তাহলে জানবেন মিত্রাবৃন্দার মুক্তি সম্ভব নয়।'

এ কথা শুনে রাহিল কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কাছে একটা পদশব্দ শোনা গেল। বৃদ্ধ ভাস্কর সে শব্দ শুনে বললেন, 'এবার আপনি যান। কাল অনুদেব নগরীতে যাত্রা করলে কর্মোপলক্ষ্যে মিত্রাবৃন্দাকে আমি এ-কক্ষে আনব। কাল ঠিক দ্বিপ্রহরে আপনি এ-কক্ষে আসবেন।'

তার কথা শুনে রাহিল সে কক্ষ ছেড়ে, মন্দিরের অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

মাহবার সঙ্গে আলাপচারিতার পর বুকের মাঝে কেমন যেন কম্পন অনুভূত হতে লাগল রাহিলের। তাহলে কি মুক্তি পাবে না মিত্রাবৃন্দা?

BanglaBook.org

কার কথা ঠিক, অনুদেবের নাকি মাহবার? এ কথা ভাবতে ভাবতে মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিক্রমা শুরু করল রাহিল।

সে দেখতে পেল একসময় বিকর্না আর অনুদেব ফিরে এল। বিকর্না চলে গেল অন্তঃপুরের দিকে আর অনুদেব চিত্রবানকে সঙ্গে নিয়ে মন্দির-চত্বরে কাজের তদারকি করতে লাগলেন। বিকালবেলা মন্দির-প্রাঙ্গণে ফিরে এল সেই ব্যাধের দল।

তারা জানাল যে জঙ্গলে তারা সন্ধান পায়নি কৃষ্ণবানরদের। অনুদেব তাদের নির্দেশ দিলেন পরদিনও জঙ্গলে একই কাজে নিযুক্ত থাকতে। তার নির্দেশ শুনে ব্যাধের দল প্রাঙ্গণ ছেড়ে নীচের চত্বর থেকে তাদের সঙ্গীর মৃতদেহ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনুদেবও কিছুক্ষণের মধ্যে মন্দির ছাড়লেন।

মন্দির-প্রাঙ্গণের এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন প্রধান ভাস্কর চিত্রবান। দূরে পর্বতশ্রেণির আড়ালে সূর্য অস্ত গেছে। সেদিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিলেন তিনি। রাহিলের কেন জানি মনে হল যে শেষবিকালের আলোতে কেমন যেন বিষণ্ণতা ধরা পড়েছে তার মুখে।

রাহিল তার সামনে গিয়ে বলল, 'সারাদিন মন্দির পরিভ্রমণ করলাম। গতকাল রাতের দুর্ঘটনা আর আজ সকালে কৃষ্ণবানরের হাতে ব্যাধের মৃত্যু ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু মূর্তি নির্মাণ, মন্দির নির্মাণের কাজ ঠিকঠাকই চলছে বলে মনে হয়।'

চিত্রবান মৃদু হেসে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

রাহিল এরপর জানতে চাইল, 'কূপ নির্মাণের কাজ কেমন চলছে?'

চিত্রবান যেন মৃদু চমকে উঠে জবাব দিলেন, 'ভালো।' তারপর রাহিলকে বিদায় জানিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করলেন।

রাহিল এবার হাঁটতে শুরু করল অন্যদিকে। প্রাঙ্গণের যে অংশে সুরসুন্দরীদের দল অন্যদিন গোলক নিয়ে ক্রীড়ারত থাকে সে জায়গায় একসময় উপস্থিত হল রাহিল। সে জায়গা শূন্য। অনুদেবের নির্দেশে বাইরে বেরোনো নিষিদ্ধ হয়েছে সুরসুন্দরীদের। সে স্থান পেরিয়ে রাহিল সেই বাঁক অতিক্রম করে এসে দাঁড়াল সে জায়গায়, যেখানে সে প্রতীক্ষা করত মিত্রাবৃন্দার। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল রাহিল।

BanglaBook.org

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামল। সৈন্যরা মন্দিরের প্রত্যেক কোণে মশাল জ্বালাতে লাগল। প্রস্তুত হতে লাগল নৈশপ্রহরার জন্য। রাহিল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এসে কাছেই এক স্তম্ভর গায়ে একটা মশাল গুঁজে দিয়ে গেল রাহিলের সৈন্যদলেরই একজন।

চাঁদ উঠল একসময়। কিন্তু নখরের ফালির মতো চাঁদ। কোনও দীপ্তি নেই তাতে। আর একদিন পরই তো অমাবস্যা।

একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে মিত্রাবৃন্দার কথাই ভাবছিল রাহিল। সে এখন কী করছে? এই অন্ধকার মন্দিরের অন্তঃপুরে বসে সে হয়তো রাহিলের কথাই ভাবছে, স্বপ্ন দেখছে মুক্তির, রাহিলের সঙ্গে ঘর বাঁধার। তার কি স্বপ্ন পূরণ হবে? এসব কথা ভাবছিল রাহিল। হঠাৎ নূপুরের ছমছম শব্দ শুনল সে। তবে কি মিত্রা হাজির হল? ফিরে তাকাল রাহিল। না, মিত্রা নয় বিকর্না। সে এসে দাঁড়াল রাহিলের সামনে।

রাহিল তাকাল তার অঙ্গসজ্জার দিকে। স্তম্ভগাত্রে প্রোথিত মশালের আলো এসে পড়েছে তার গায়ে। বিকর্নার পরনে রেশমের বক্ষাবরণী আর ঘাগড়া। কণ্ঠে চন্দ্রহার, বাহুতে বাজুবন্ধনি আর হীরকখোচিত স্বর্ণবলয় ঝিলিক দিচ্ছে মশালের আলোতে। পায়ে তার নূপুরের ছমছম শব্দ। তাম্বুলে রঞ্জিত তার ওষ্ঠাধার, কবরীতে গোঁজা ফুলমালা।

বিকর্নার বক্ষদেশ আজ যেন অনেক উন্নত বলে মনে হল রাহিলের। বক্ষ বিভাজিকাও প্রকট। হয়তো বা কৃত্রিমভাবে কোনও কৌশলে সে উন্নত করেছে তার বক্ষ। হঠাৎ সেই বক্ষের দিকে তাকালে তাকে নারী বলে ভ্রম হতে পারে। নারীবেশে সজ্জিত বিকর্না।

বিকর্না হাসল রাহিলের দিকে চেয়ে, রাহিলও মৃদু হাসল তার উদ্দেশ্যে।

বিকর্না বলল, 'আমাকে কেমন দেখতে লাগছে আজ?'

রাহিল জবাব দিল, 'সুন্দর।'

বিকর্না জানতে চাইল, 'সুরসুন্দরীদের মতো?' যথাসম্ভব কোমল স্বরে প্রশ্ন করল সে।

রাহিলের হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভাস্কর মাহবার কথা। হয়তো বৃহন্নলা বিকর্না খোঁজ দিতে পারে প্রধান পুরোহিত অনুদেবের ভাবনার কথা।

তাই সে হেসে জবাব দিল, 'অনেকটা তাই।'

BanglaBook.org

বিকর্না জানতে চাইল, 'সত্যি?'

রাহিল মনের ভাব গোপন করে বলল, 'হ্যাঁ। সত্যি।'

বিকর্না খুশি হল তার কথা শুনে। সে বলল, 'তুমি আগেও জানিয়েছ এ কথা।'

এরপর বিকর্না জানতে চাইল, 'এখানে একলা দাঁড়িয়ে তুমি কী ভাবছ?'

রাহিল জবাব দিল, 'আর দু-দিনের মধ্যে সম্ভবত তোমাদের এই মন্দির ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। নতুন সেনাদল নিয়োজিত হবে। সেসব কথাই ভাবছি।'

বিকর্না প্রথমে বলল, 'হ্যাঁ, আমি জানি সে কথা।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, 'তোমাকে এ মন্দিরের এক গোপন জিনিস দেখাব আমি।'

বিস্মিত রাহিল জানতে চাইল, 'কী জিনিস?'

বৃহন্নলা বিকর্না বলল, 'গোপন ব্যাপার। তুমি মন্দির পরিত্যাগ করার আগে আমি তা দেখাব তোমাকে। চত্বর ছেড়ে মন্দিরের পশ্চাতভাগ দিয়ে নীচে নামতে হবে সে জন্য। তুমি আমাকে অনুসরণ করো।' এই বলে সে এগোল সেদিকে যাবার জন্য।

রাহিল একটু ইতস্তত করে অনুসরণ করল তাকে।

অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণ। সেখানে শুধু মশাল হাতে প্রহরারত সৈনিকরা। তারা রাহিল আর বিকর্নাকে দেখে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করল না। ভাবল তারা কোনও অনুসন্ধান বা কর্মোপলক্ষ্যে একসঙ্গে কোথাও গমন করছে। রাহিলরা মন্দির-ভিত ছেড়ে নীচে নামার পর তাদের দেখে একই ধারণা হল মন্দির-রক্ষীবাহিনীরও। তারা কেউ কোনও প্রশ্ন করার ঔদ্ধত্য দেখাল না।

বিকর্না তাকে নিয়ে হাজির হল মন্দির-প্রাঙ্গণের নীচে দক্ষিণ কোণে। জায়গাটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেউ কোথাও নেই। বিকর্না চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে মন্দির-ভিতের এক জায়গাতে সজোরে ধাক্কা দিতেই পাথরটা সরে গিয়ে উন্মোচিত হল এক সুড়ঙ্গ। সেটা দেখিয়ে বিকর্না রাহিলকে বলল, 'ভয় নেই। আমার সঙ্গে এই পাতালকক্ষে প্রবেশ করো।'

BanglaBook.org

বিস্মিত রাহিল তাকে অনুসরণ করে প্রবেশ করল সেই অন্ধকার পথে। সে পথ ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। অন্ধকারে রাহিল কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সংকীর্ণ সুড়ঙ্গে সে এগিয়ে চলল বিকর্নার নূপুরের শব্দ অনুসরণ করে।

বিকর্না একসময় থামল। অন্ধকার দেওয়ালের কুলুঙ্গি থেকে খুঁজে বার করল একটা মশাল। চকমকি পাথর ঘসে মশাল প্রজ্বলিত করল সে। রাহিল দেখতে পেল সে এক ভূগর্ভস্থ কক্ষে দাঁড়িয়ে আছে।

বিকর্না তাকে বলল, 'এ কক্ষ আমি আবিষ্কার করেছি। ওই দেখো—'

রাহিল তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল সেই কক্ষের এক কোণে রক্ষিত আছে এক স্বর্ণকলস। আর সেই কলসের সঙ্গে শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় আছে এক ক্ষুদ্র নরকরোটি! স্বর্ণকলসটি বসানো আছে এক বিশাল স্তম্ভের গায়ে।

বিকর্না এগিয়ে গেল স্তম্ভের গায়ে সেই কলসের সামনে। তার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল রাহিলও।

স্তম্ভটা দেখিয়ে বিকর্না বলল, 'এই স্তম্ভ হল কান্ডারীয় মন্দিরের প্রধান চারটি স্তম্ভর একটি। যাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মন্দির। এই ক্ষুদ্র মুণ্ড এক বালকের, যাদের বলি দেওয়া হয়েছিল মন্দিরে ভিত্তি স্থাপনের সময়, আর এই সেই কলস যা উৎসর্গ করা হয়েছিল মন্দিরের নামে।'—এ কথা বলে বিকর্না উন্মোচিত করল সেই কলসের মুখের আচ্ছাদন।

হঠাৎই যেন আলোকিত হয়ে উঠল সেই কক্ষ। আলোক বিচ্ছুরিত হল সেই কলস থেকে। হীরকখণ্ড, পদ্মরাগ মণি, মরকত মণির ঔজ্জ্বল্যে ভরে উঠল সেই কক্ষ। এক কলস দুর্মূল্য রত্ন!

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে রাহিল বলল, 'এত সম্পদ মন্দির নির্মাণকল্পে উৎসর্গ করা হয়েছে! এত সম্পদ দিয়ে তো একটা রাজ্য ক্রয় করা যায়!'

বিকর্না বলল, 'হ্যাঁ, তাই। তবে মন্দিরের নামে উৎসর্গকৃত হলেও আসলে এ সম্পদ কৌশলে মন্দিরে লুক্কায়িত রেখেছেন সম্রাট। যাতে দৈব-দুর্বিপাকে এ সম্পদ কাজে আসে সম্রাটের। কলচুরিরা কোনও সময় সম্রাট

BanglaBook.org

বিদ্যাধরকে পরাজিত করে রাজকোষ লুণ্ঠন করলেও খোঁজ পাবে না এ সম্পদের।'

বিকর্নার কথা শুনে এবার ব্যাপারটা অনুধাবন করল রাহিল।

কিন্তু এরপর বিকর্নার কথা শুনে চমকে উঠল রাহিল। সে বলল, 'এ সম্পদ আমাদের দুজনের হতে পারে। তুমি চাইলে এ কলস নিয়ে এ রাজ্য ছেড়ে আমরা অনেক দূরে চলে যাব। শুনেছি, চম্বা রাজ্যে বৃহন্নলারা গার্হস্থ্য জীবন পালন করে নারী অথবা পুরুষ রূপে। সেখানেই যাব আমরা।'

বিকর্নার প্রস্তাব শুনে রাহিল এতটাই চমকে গেল যে সে কোনও জবাব দিতে পারল না।

বিকর্না আবারও বলল, অমাবস্যার অন্ধকার রাতে আমরা এ কলস নিয়ে মন্দির ত্যাগ করব। ব্যাপারটা কেউ জানতেই পারবে না যতদিন না সম্রাট এই সম্পদ উদ্ধার করতে আসেন।

রাহিল এরপর জবাব দিল, 'আমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী। চৌর্য্যবৃত্তি আমার পেশা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি শত্রুকে হত্যা করি ঠিকই, কিন্তু তা দেশরক্ষার জন্য, সীমান্ত রক্ষার জন্য। এ কাজ করলে পাপ হবে, অন্যায় হবে।'

বিকর্না বলে উঠল পাপ কি শুধু আমার তোমার হয়? সম্রাটের হয় না? অনুদেবের হয় না? এই যে অনুদেব আমাকে প্রতারিত করলেন, সম্রাটের নির্দেশে কূপ খনন করাচ্ছেন তাতে পাপ হবে না? অপরাধ হবে না?

বিকর্না কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাহিল বলে উঠল, 'কূপ খননের সঙ্গে পাপের সম্পর্ক কী?'

রাহিলের কথা শুনে একটু চুপ করে গেল বিকর্না। সে বুঝতে পারল আবেগের বশে সে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে। কিন্তু সে এ-ও বুঝল যে আর কিছু করার নেই। কারণ সে এই গুপ্তভাণ্ডার দেখিয়ে ফেলেছে রাহিলকে। এখন তাকে তার বিশ্বাস করতে হবে।

সে বলল, 'সম্রাট চান না যে এই সুরসুন্দরীদের মূর্তি অপর কেউ নির্মাণ করুক। হয়তো কোনও বিত্তশালী ক্রয় করল এদের, অথবা কলচুরিরা কোনওদিন এদের কাউকে ধরে নিয়ে গেল, তারপর এদের

BanglaBook.org

ভাস্কর্য তারা নির্মাণ করল কোথাও। তাতে নষ্ট হবে কান্ডারীয় মন্দিরের গরিমা। সম্রাট চান একমেবদ্বিতীয়ম্ হবে এই মন্দির। এ মন্দিরের কোনও অলঙ্করণ, কোনও ভাস্কর্য অন্য কোনও মন্দিরে থাকবে না। তাই...।' থেমে গেল বিকর্না।

উত্তেজিত রাহিল বলে উঠল, 'তাই কী? থামলে কেন?'

বিকর্না জবাব দিল, 'তাই অমাবস্যার রাতে অথবা পরদিন প্রত্যুষে ওই কূপে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দেওয়া হবে সুরসুন্দরীদের। এক জায়গাতে থাকার কারণে কোনও ভাস্কর, মজুর এমনকী তোমার কোনও সৈনিকের সঙ্গেও সুরসুন্দরীদের কারও কারও সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। সুরসুন্দরীদের কূপে নিক্ষেপ করার কাজে যাতে কোনও বাধা সৃষ্টি না হয়, তাই প্রধান পুরোহিত বৃহৎ সৈন্যবাহিনী আনয়ন করতে চলেছেন।

চমকে উঠল রাহিল। তার পায়ের নীচে মাটি টলে উঠল।

বিকর্না এরপর রাহিলের বাহু আলিঙ্গন করে করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'তোমাকে এত গোপন কথা জানালাম, তুমি আমাকে প্রতারিত কোরো না। এ সম্পদ নিয়ে আমরা অনেক দূরে চলে যাব। আমি যৌনক্রীড়ায় পারদর্শী। যে সুখ আমি তোমাকে দেব সে সুখ অন্য কোনও নারী তোমাকে দিতে পারবে না। প্রয়োজনে আমি রূপসি নারী ক্রয় করব তোমার জন্য। আমাকে প্রত্যাখ্যান কোরো না তুমি...'

রাহিলের কানে প্রবেশ করছে না বিকর্নার কাতর আহ্বান। তার চোখে শুধু ভেসে উঠছে মিত্রাবৃন্দার মুখ। একটু ধাতস্থ হবার পর রাহিল বিকর্নার হাতটা খসিয়ে নিল তার দেহ থেকে। বিকর্নার উদ্দেশ্যে সে শুধু বলল, 'তোমার বক্তব্য গোপন থাকবে অনুদেবের কাছে।'—এই বলে সে দ্রুত পা বাড়াল ভূ-গর্ভস্থ সেই কক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরোবার জন্য। পিছনে পড়ে রইল বিকর্নার হাহাকার—'দোহাই সৈনিক আমাকে তোমার সঙ্গিনী করো, এ অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্ত করো আমায়...'

মন্দির-প্রাঙ্গণে উঠে এল রাহিল। তাকে ভাস্কর মাহবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যাপারটা জানাতে হবে। সে যদি কোনওভাবে মুক্তির উপায় বাতলাতে পারে মিত্রাবৃন্দার। মন্দির-চত্বরে মশাল হাতে প্রহরা দিচ্ছে সৈনিকরা। রাহিলের নির্দেশে সতর্ক তারা। তাদের পাদুকার লোহার নালের

BanglaBook.org

শব্দ হচ্ছে মন্দির-প্রাঙ্গণে।

রাহিলকে ব্যগ্রভাবে মন্দিরের অন্তঃপুরের দিকে এগোতে দেখে এক সৈনিক তাকে প্রশ্ন করল, 'সৈনাধ্যক্ষ, কোনও ঘটনা ঘটেছে কি?'

রাহিল থমকে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে জবাব দিল, 'না, তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে আপনারা যেমন মন্দিরের বহির্দেশে প্রহরারত তেমনই মন্দিরের অন্তঃপুরও দেখে আসা প্রয়োজন। তাই মন্দিরের ভিতরটা দেখতে যাচ্ছি। মন্দিরের বহিরাংশে আপনারা সতর্কভাবে প্রহরার কাজে নিয়োজিত থাকুন।'

রাহিলের কথা শুনে সে সৈনিক বলল, 'হ্যাঁ, সৈনাধ্যক্ষ, এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের কর্তব্যে কোনও গাফিলতি হবে না।'

রাহিল প্রবেশ করল মন্দিরের অন্তঃপুরে। সে প্রথম উপস্থিত হল মাহবার কাজের জায়গাতে সেই কক্ষে। মশালের ক্ষীণ আলোতে সে-কক্ষে একলা দাঁড়িয়ে আছে মিত্রাবৃন্দার মূর্তি। ভাস্কর মাহবা সেখানে নেই। কোথায় গেলেন তিনি?

নিস্তব্ধ মন্দিরের অন্তঃপুর। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কক্ষগুলোর অভ্যন্তরে খেলা করছে জমাটবাঁধা অন্ধকার। অন্তঃপুরের যে অংশে সুরসুন্দরীদের আবাস সেদিক থেকেও কোনও শব্দ আসছে না। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের নিয়ে ভাস্করদের কাজ প্রায় শেষ। হয়তো আর একটা দিন তাদের দাঁড়াতে হবে মিথুনবদ্ধ হয়ে অথবা নগ্নিকা হয়ে।

কারও কারও কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো সুখস্বপ্ন দেখছে মুক্তিলাভের। হয়তো বা নিদ্রিত মিত্রাবৃন্দাও সে স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু তাদের কারো জানা নেই যে তাদের ভবিতব্য কী হবে সে ব্যাপারে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন সম্রাট ও প্রধান পুরোহিত। কূপ খোদিত হচ্ছে তাদের জন্য।

বেশ কিছুক্ষণ সে কক্ষে অপেক্ষা করার পর যখন মাহবার দেখা মিলল না তখন রাহিল অনুমান করল হয়তো বা তিনি মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগের নিম্নদেশে ওই ভাস্কর-মজুরদের থাকার স্থানেই গেছেন। রাহিল সিদ্ধান্ত নিল সে-স্থানে গিয়েই সে খুঁজে বার করবে মাহবাকে। রাহিলের সে জায়গাতে

BanglaBook.org

যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। মন্দির-রক্ষীবাহিনীর কেউ যদি এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করে তবে সে জানাবে যে মন্দিরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই সে সর্বত্র টহল দিচ্ছে। এ খবর কানে গেলে সম্ভবত খুশিই হবেন। তবুও যথাসম্ভব কম লোকের চোখে পড়াটাই বাঞ্ছনীয় রাহিলের কাছে।

মন্দিরের সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্‌ভাগে দুটি তোরণ আছে মন্দিরে প্রবেশের জন্য। সম্মুখ ভাগেরটা বৃহৎ ও অপর প্রান্তেরটা ক্ষুদ্রাকৃতির। অন্তঃপুরের ভিতর দিয়ে সেই ক্ষুদ্রাকৃতি তোরণের মাধ্যমে নির্গমনের জন্য এগোল রাহিল।

একের পর এক অন্ধকার কক্ষ পেরিয়ে সে একসময় উপস্থিত হল সেই সোপানশ্রেণির কাছে। তাকে অতিক্রম করে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল সে। কিন্তু আকস্মিক হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল সোপানশ্রেণির ওপর দিকে একটা বাঁকের মুখে। কোথা থেকে যেন আবছা আলো এসে পড়েছে সে জায়গাতে। রক্ষীরা মন্দিরের গাত্রের বহির্দেশে কয়েকটা নীচু তাকের গায়ে মশাল গুঁজেছে। হয়তো তারই কোনওটার আলো ছিদ্রপথে প্রবেশ করে সোপানশ্রেণির সেই বাঁকটা আলোকিত করেছে। রাহিল দেখতে পেল দীর্ঘবস্ত্রে আচ্ছাদিত এক ব্যক্তি অতি সন্তর্পণে সেই বাঁক অতিক্রম করে ওপরে উঠছে! কে ও! এত রাতে সে কোথায় উঠছে?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রাহিল। একবার তার মনে হল, যে ওপরে যাচ্ছে যাক, এই মুহূর্তে ভাস্কর মাহবাকে খুঁজে বার করাই তার প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এরপরই তার খেয়াল হল ওই সোপানশ্রেণির মাধ্যমে গবাক্ষ অতিক্রম করে পৌঁছে যাওয়া যায় বহির্গাত্রের সেই রহস্যময় তাকের কাছে! ওই ছায়ামূর্তি কি ওখানেই যাচ্ছে? নিজের কৌতূহলকে সংযত করতে পারল না রাহিল। সে-ও ওপরে উঠতে শুরু করল।

মার্জারের মতো নিঃশব্দে সোপানের ধাপ অতিক্রম করে, বাঁক অতিক্রম করে ওপরে উঠে চলেছে লোকটা। বোঝাই যাচ্ছে এ-পথ তার চেনা। এ-পথে আসা-যাওয়া করে সে। সে জন্য এই অন্ধকার-অরক্ষিত সোপানশ্রেণিতে তার এমন সাবলীল গতি।

সোপানশ্রেণির একপাশে অতল গহ্বর। সেদিকে অন্ধকারে পা-ফসকালেই

BanglaBook.org

মৃত্যু অবধারিত। কোনওরকমে অন্যপাশের দেওয়াল হাতড়ে রাহিল তাকে অনুসরণ করল। একসময় সোপানশ্রেণির শীর্ষে উঠে এল সেই ছায়ামূর্তি। গবাক্ষ দিয়ে মৃদু আলো এসে পড়েছে তার মুখে। কিন্তু তার মুখমণ্ডল বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত।

গবাক্ষ দিয়ে বাইরে নির্গত হল লোকটা। রাহিলও পৌছে গেল সোপানশ্রেণির মাথায় তারপর সন্তর্পণে উঁকি দিল বাইরে। সে দেখল কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদিত সেই ছায়ামূর্তি গবাক্ষ সংলগ্ন অলিন্দ থেকে গিরগিটির মতো দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে! লোকটা পৌছে গেল নারীমূর্তির উল্টোদিকের সেই তাকের কাছে। তারপর যেন ভোজবাজির মতো দেওয়ালের গায়ে মিলিয়ে গেল!

মন্দিরের পশ্চাদংশে মশাল হাতে এক সৈনিককে আসতে দেখল রাহিল। সঙ্গে সঙ্গে রাহিল আত্মগোপন করল নিজেকে। সৈনিক একবার এসে দাঁড়াল তাকগুলোর ঠিক নীচে। মশাল উঠিয়ে দেখার চেষ্টা করল ওপরে কিছু দেখা যায় কিনা! তারপর আবার লোহার নাল লাগানো পাদুকার শব্দ তুলে অন্যদিকে চলে গেল। সে চলে যাবার পর কর্তব্য স্থির করে নিল রাহিল। ওই ছায়ামূর্তি নিশ্চই সে, যাকে সন্ন্যাসীর প্রেতাত্মা বলে ভাবছে সবাই।

লোকটাকে অনুদেবের হাতে তুলে দেবার বিনিময়ে রাহিল মুক্তি প্রার্থনা করতে পারে মিত্রাবৃন্দার। রাহিল তার পাদুকা খুলে ফেলল, তরবারি নামিয়ে রাখল, তারপর গবাক্ষ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল অলিন্দে। ভালো করে দেখার পর রাহিল বুঝতে পারল দেওয়ালগাত্রে কিছু খাঁজ আছে। খাঁজ বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল সে। খাঁজ থেকে হাত ফসকালেই নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পৌছে গেল মাথার ওপরের সেই তাকটাতে। তার কিছুটা তফাতে অন্য একটা তাকে আঁধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সেই নারীমূর্তি।

রাহিল দেখল যে তাকে সে দাঁড়িয়েছে সে তাকের সামনেই এক উন্মুক্ত গহ্বর। ছায়ামূর্তি কোথায় অদৃশ্য হল তা বুঝতে পারল রাহিল।

সে-ও প্রবেশ করল সুড়ঙ্গে। সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ কিছুটা এগিয়ে শেষ হয়েছে এক কক্ষে। মন্দিরের শীর্ষদেশ তবে নিরেট নয়! গোপন কক্ষ রয়েছে

BanglaBook.org

এখানে! রাহিল গিয়ে দাঁড়াল সেই কক্ষর সামনে।

মশালের আলো জ্বলছে ভিতরে। রাহিল দেখতে পেল সেই মূর্তিকে একটা প্রস্তর ফলকের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে সেই মূর্তি। পিছন থেকে তাকে ঘায়েল করে অনায়াসে কাবু করতে পারবে রাহিল। সে কটিদেশ থেকে ছুরিকা খুলে নিয়ে সন্তর্পণে প্রবেশ করল সেই কক্ষে, তারপর ধীরে ধীরে এগোতে লাগল লোকটার দিকে।

লোকটা একমনে দেখে যাচ্ছে সেই ফলকটা। তার পায়ের সামনে ক্ষুদ্র শলাকা, ছেনি, হাতুড়ি ইত্যাদি পড়ে আছে। সেগুলোর কোনও কিছু উঠিয়ে নেবার জন্য মাটির দিকে ঝুঁকল লোকটা। রাহিল তার কাছে পৌঁছে গেছে। সে তার হাতটা ওঠাল লোকটার কাঁধে ছুরিকা বসিয়ে দেবার জন্য। বন্দি করার আগে আহত করে আতঙ্কিত-দুর্বল করতে হবে লোকটাকে। রাহিল হাতটা ওঠাল ঠিকই কিন্তু হাতটা নামাতে পারল না। কে যেন রাহিলের পিছন থেকে চেপে ধরল তার ছুরিকাবদ্ধ হাতটা। চমকে উঠে পিছনে ফিরে রাহিল দেখল তার হাত যে চেপে ধরেছে সে মাহবা!

বিস্মিত রাহিল হাত থেকে খসিয়ে ফেলল ছুরিকা। সে বলে উঠল, 'মাহবা আপনি?'

মাহবা শান্ত স্বরে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি।'

সেই অবগুণ্ঠিত রহস্যময় মূর্তি তখন ফিরে দাঁড়িয়েছে রাহিলের দিকে। একটা ধারালো লৌহশলাকা তার হাতে। প্রয়োজনে সে সেটাকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করতে পারে।

রাহিল মাহবাকে জিগ্যেস করল, 'এখানে কী করছেন আপনারা? সেই প্রেতাত্মা কি আপনারাই কেউ, যে হত্যা করল মন্দির-রক্ষীবাহিনীর লোকটাকে?'

মাহবা জবাব দিলেন, 'আমরা এক অন্যায়ের প্রতিবিধানের চেষ্টা করছি এই গোপন কক্ষে। লোকটা আমাদের দেখে ফেলে বর্শা নিক্ষেপ করেছিল। ও ছাড়া কিছু করার ছিল না আমাদের। সে জীবিত থাকলে হয়তো এই গোপন কক্ষের সন্ধান পেয়ে যেত অন্যরা। আমাদের এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হত। আর হাতে সময় নেই আমাদের। সৈন্যবাহিনী চলে আসার

BanglaBook.org

আগে দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে।'

মাহবা কী বলছেন ঠিকঠাক বুঝতে না পেরে রাহিল বলল, 'কী অন্যায়ের প্রতিবিধান? এ গোপন কক্ষ কীভাবে অজানা রইল অনুদেবের কাছে? মন্দিরের প্রধান স্থপতি-ভাস্কর চিত্রবানের তো অজানা থাকার কথা নয় এই গুপ্তকক্ষর কথা?'

তার প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ ভাস্করের বলিরেখাময় মুখমণ্ডলে আবছা হাসি ফুটে উঠল। অবগুণ্ঠনাবৃত মূর্তি কিছুটা সরে দাঁড়াল সেই প্রস্তরফলকের গা থেকে। মাহবা অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন সেই প্রস্তরফলকের দিকে। তার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরফে কী সব যেন খোদিত আছে।

রাহিল জানতে চাইল, 'কী খোদিত আছে ওতে?'

রাহিলের প্রশ্ন শুনে এবার অবগুণ্ঠন খসিয়ে ফেলল সেই মূর্তি। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল রাহিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান ভাস্কর চিত্রবান। তিনি বললেন, 'সম্রাটের প্রশস্তি নয়, ওই ফলকে আমরা খোদাই করে যাচ্ছি ভাস্কর-মজুরদের নাম। সম্রাট নন, যারা নিজেদের রক্ত, ঘাম, অশ্রু দিয়ে রচনা করছে এই কান্ডারীয় মন্দির। এ মন্দিরের প্রস্তরখণ্ড শুষে নিল যাদের জীবন যৌবন তাদেরই নাম খোদিত হচ্ছে ওই ফলকে। যে মল্লখ একদিন সৃষ্টির আনন্দে উল্লাসে বলে উঠেছিল, "এ মূর্তি আমিই নির্মাণ করেছি।"—সে আমার সহোদর। সম্রাটের আদেশে তার জিহ্বা উৎপাটিত করা হল।

'অসহায়ভাবে সেদিন আমি তাকিয়ে দেখলাম সেই দৃশ্য। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না। শাস্ত্রে বলে রাজরোষ বজ্রপাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর। বজ্রপাত যেখানে হয় সেখানে শুধু আগুন জ্বলে। আর রাজরোষ দাবানলের মতো সবকিছুকে ধ্বংস করে। কিন্তু সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এ অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হবে। ভবিষ্যতের মানুষের কাছে প্রকাশ করতে হবে আসল সত্য। সুদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিত সেদিনের কোনও-না-কোনও মানুষ সন্ধান পাবে এই কক্ষের। সেই ভবিষ্যতের মানুষের কাছে উন্মোচিত হবে এই কাণ্ডারীয় মন্দিরের প্রকৃত স্থপতিদের নাম। সেদিনের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করবে এই নামগুলো। মাহবা অক্ষরজ্ঞানহীন। সে নামগুলো বলে, আর আমি সেগুলো খোদিত করে

BanglaBook.org

যাই ওই ফলকে। আপনি রাজসৈনিক। আপনি কি এ সংবাদ পৌঁছে দেবেন অনুদেবের কাছে?' কথা শেষ করে রাহিলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন চিত্রবান।

ঘটনার আকস্মিকতায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেছিল রাহিল। একটু ধাতস্থ হবার পর সে বলল, 'সম্পূর্ণ ব্যাপারটা অবগত না হলে হয়তো দিতাম। আপনাদের পরিবর্তে অন্য কেউ হলে তাকে প্রধান পুরোহিতের হাতে তুলে দিয়ে তার বিনিময়ে এক সুরসুন্দরীর মুক্তি প্রার্থনা করতাম। এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পেয়ে সে ব্যাপারে ভাস্কর মাহবার সন্ধান করছিলাম আমি। ঠিক সে সময় আপনাকে সোপানশ্রেণি বেয়ে ওপরে উঠতে দেখে আপনাকে বন্দি করার অভিলাষ নিয়েই আমি এখানে হাজির হই।'

মাহবা এবার জানতে চাইলেন, 'কী গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ?'

রাহিল জবাব দিল, 'বিকর্না জানিয়েছে যে কূপ খোদিত হচ্ছে সুরসুন্দরীদের সেখানে নিক্ষেপ করার জন্য। আর সে কাজে যাতে কেউ বাধাদান করতে না পারে সেজন্য বৃহৎ সেনাদল আনয়ন করা হবে।'

রাহিলের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেল সারা কক্ষ। চিত্রবান প্রথমে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, 'আমিও এমনই অনুমান করছিলাম। কারণ, ওই স্থান কূপ খননের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়। মন্দিরের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হবার পর ভাস্কর-মজুরদের ভাগ্যেও সম্ভবত একই পরিণতি লেখা আছে। প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে মন্দির-রক্ষীবাহিনীর মৃত্যুর ঘটনাটা যাতে কৃষ্ণবানরদের ওপর চাপানো যায় সেজন্য বানরগুলোকে মুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু সে ঘটনাও সন্দেহর উদ্রেক ঘটিয়েছে তার মনে। তিনি অনুমান করছেন তার অগোচরে মন্দিরে কিছু ঘটছে। এটাও সৈন্যবাহিনী আনয়ন করার পিছনে একটা কারণ।'

রাহিলের চোখে শুধু ভাসছে মিত্রার মুখ। সে বলল, 'আপনারা যদি মিত্রাবৃন্দার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেন তবে আমি আপনাদের যে-কোনও সাহায্য করতে রাজি আছি।'

চিত্রবান একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'পরশু অমাবস্যা। কাল সূর্যোদয়ের পর নগরীতে যাবেন অনুদেব। পরশুর মধ্যে তিনি সুরসুন্দরীদের মিথুন মূর্তি রচনার কাজ শেষ করতে বলেছেন। অর্থাৎ এ দু-দিন সুরসুন্দরীরা

BanglaBook.org

নিরাপদ। শুধু মিত্রাবৃন্দা নয়, অন্যদেরও মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আর এক রাতের মধ্যে আমাদেরও এই ফলকে নাম খোদাইয়ের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর সবাইয়ের মুক্তির পথ খুঁজতে হবে আমাদের। আপনি যুদ্ধ ব্যবসায়ী, নিশ্চিতভাবে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমাদের। আমরা উপায় খুঁজব আপনার প্রেয়সীর মুক্তিলাভের। এবার আপনি ফিরে যান। কাল রাত এক প্রহরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এখানে। কাল রাতে মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে আপনার সেনাদল যাতে প্রহরা না দেয় সে ব্যাপারে আপনি ব্যবস্থা নেবেন।'

মাহবা বললেন, 'কাল নির্দিষ্ট সময় আপনি মূর্তি নির্মাণের কক্ষে আসবেন। আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব মিত্রাবৃন্দার।'

প্রধান ভাস্কর চিত্রবান এরপর নিয়োজিত হলেন প্রস্তরফলকে নাম রচনার কাজে। রাহিল সে কক্ষ ত্যাগ করে যে পথে সে সেই জায়গাতে পৌঁছেছিল ঠিক সে পথেই ফিরে এল নীচে মন্দির-প্রাঙ্গণে। তারপর অন্যদিনের মতোই পদচারণা শুরু করল।

কাজ শেষ করে ভোরের আলো ফোটার আগেই মাহবা আর চিত্রবান নীচে এলেন। মাহবা তার কক্ষে ফিরে গেলেন, আর চিত্রবান অন্ধকারে মন্দির ত্যাগ করার আগেই হঠাৎই মুখোমুখি হয়ে গেলেন একজনের। অবশ্য তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মন্দির ত্যাগ করলেন।

৯

ভোরের আলো ফুটল একসময়। কুয়াশা তখনও ভালোভাবে কাটেনি। রাহিল দেখতে পেল মন্দির-চত্বরে উঠে এলেন অনুদেব। এত ভোরে তিনি সাধারণত মন্দিরে উপস্থিত হন না। তিনি সাধারণত উপস্থিত হন আরও কিছু সময় পর মন্দির-প্রাঙ্গণে শিল্পী-মজুরদের দল উপস্থিত হলে। চত্বরে উঠে তিনি দ্রুত প্রবেশ করলেন মন্দিরের অন্তঃপুরে। তিনি মন্দিরের ভিতরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করার পর রাহিল এসে দাঁড়াল সেই প্রবেশপথের সামনের চত্বরে। নিত্যদিন সেখানে এসে সমবেত হয় ভাস্কর-মজুরের দল।

BanglaBook.org

চিত্রবান এসে তাদের দৈনন্দিন কাজ বুঝিয়ে দেন।

একসময় মজুরের দল ধীরে ধীরে এসে উপস্থিত হতে লাগল সেখানে। চিত্রবানও সেখানে উপস্থিত হলেন। আর এরপরই অনুদেব মন্দিরের অন্তঃপুর ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন। বাইরে তিনি মুখোমুখি হয়ে গেলেন রাহিল আর চিত্রবানের। মুহূর্তের জন্য যেন একবার অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠল অনুদেবের মুখে। কিন্তু তারপরই তিনি নিজেকে যেন সামলে নিয়ে বললেন, 'অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হল। নগরীতে যেতে হবে আমাকে। ভাবলাম তার আগে একবার মন্দিরটা ঘুরে যাই। মন্দির-প্রাঙ্গণ তো সৈনিকবেষ্টিত থাকে। অন্তঃপুরটাই অরক্ষিত। তাই ভিতরে প্রবেশ করে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে এলাম। এ কথাগুলো চিত্রবানের উদ্দেশ্যে বলে রাহিলকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'রাত প্রহরার সময় সন্দেহজনক কিছু দৃষ্টিগোচর হয়েছে?'

রাহিল সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—'না।'

রাহিলের উদ্দেশ্যে আবার তিনি প্রশ্ন করলেন—'রাত প্রহরার সময় মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে প্রদক্ষিণ করেছিলেন?'

রাহিল জবাব দিল, 'সৈনিকরা সে অংশ প্রদক্ষিণ করেছে, আমিও সে অংশে গেছিলাম। সেখানেও কোনও সন্দেহজনক ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়নি।'

অনুদেব এরপর চিত্রবানকে বললেন, 'আমি নগরীর উদ্দেশ্যে রওনা হব। আশা করছি উগ্রায়ুধের সঙ্গে কথা বলে সৈন্য আনয়নের ব্যবস্থা করতে পারব। মূর্তি নির্মাণের কাজে যেন কোনও গাফিলতি না হয়। এ কাজ আর কূপ খননের কাজ আগামীকাল সূর্যাস্তের মধ্যেই সম্পন্ন হওয়া চাই। সর্বত্র দৃষ্টি রাখবেন আপনি। আমি সূর্যাস্তের পূর্বেই আবার মন্দিরে ফিরে আসব।'

প্রধান ভাস্কর চিত্রবান মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন তাঁর কথায়।

পুরোহিত অনুদেব এবার পা বাড়ালেন মন্দির-চত্বর থেকে নির্গমনের উদ্দেশ্যে। ঠিক সেই সময় উপস্থিত জমায়েতের মধ্যে থেকে একজন মজুর হঠাৎ মন্দিরের শীর্ষদেশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আবার ওরা ফিরে এসেছে।'

BanglaBook.org

মৃদু কলরব উঠল উপস্থিত মজুরদের মধ্যে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন অনুদেব। মজুরদের দৃষ্টি অনুসরণ করে অনুদেবসহ রাহিলরা দেখল মন্দিরগাত্রে মাথার ওপরের একটা তাকে বসে আছে দুটো কৃষ্ণবানর!

তাদের দেখে চিত্রবান বিস্মিতভাবে বলে উঠলেন, 'সঙ্গীর মৃত্যুর পরও ওরা ফিরে এল এখানে!'

প্রধান পুরোহিত অনুদেব প্রথমে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সম্ভবত রাতের অন্ধকারে সবার অগোচরে এখানে ফিরে এসেছে ওরা।'

'খাদ্যের লোভে?' জানতে চাইলেন চিত্রবান।

অনুদেব জবাব দিলেন, 'বনভূমিতে ওদের পর্যাপ্ত খাদ্য আছে। খাদ্যের সন্ধানে নয়। ওরা এখানে ফিরে এসেছে নারী-যোনির-লোভে। ওরা তো ইতর শ্রেণির প্রাণী মাত্র, ইতর অবমানব। সহস্র বৎসর ধরে মানব সমাজের মধ্যে অর্থ সম্পদ অর্জনের জন্য যে লড়াই চলে আসছে তা তো শেষ পর্যন্ত ওই মানবীযোনি লাভের জন্যই। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে শেষ অভিষ্ট তো ওই নারী-যোনিই।'

রাহিলের হঠাৎ মনে পড়ে গেল তিরবিদ্ধ সেই অবমানবের কথা। মৃত্যুর পরও তার উত্থিত শীষ্ণদেশ কাঁপছিল আকাশের দিকে চেয়ে।

চিত্রবান প্রধান পুরোহিতের কথা শুনে প্রশ্ন করল, 'এখন কী কর্তব্য? সেই ব্যাধদের আবার মন্দির প্রাঙ্গণে আনয়ন করবেন? আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস যে ওরাই কিন্তু প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে হত্যা করেছিল মন্দির-রক্ষীবাহিনীর লোকটাকে।'

প্রধান স্থপতি ভাস্করের কথা শুনে কিছু সময় কী যেন ভাবলেন প্রধান পুরোহিত। তারপর বললেন, 'সুরসুন্দরীদের মূর্তি নির্মাণের কাজ, কূপ খননের কাজ আগামীকাল সূর্যাস্তের মধ্যে শেষ করতে হবে। ব্যাধের দল কৃষ্ণবানরদের ধরার জন্য মন্দিরে এলে সেসব কাজের গতি ব্যাহত হতে পারে। হয়তো বা প্রাণরক্ষার জন্য তখন ওই অবমানবের দল মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। সুরসুন্দরীরা তো মন্দির প্রাঙ্গণে আসছে না তাই আপাতত ওই বানরদের নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। আপাতত ওদের শান্ত রাখা প্রয়োজন। প্রকটাক্ষকে বলে ওদের জন্য কদলির ব্যবস্থা করছি আমি। প্রাঙ্গণের নীচের চত্বরেই সে আছে। আর এক-দুদিনের মধ্যেই বৃহৎ

BanglaBook.org

সৈন্যবাহিনী আসবে। তিরন্দাজও থাকবে সে দলে। তারা এসে নিধন করবে ওই কৃষ্ণবানরদ্বয়কে। তারপর নতুন সুরসুন্দরীরূপে যারা নির্বাচিত হবে তাদের নিয়ে উন্মুক্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে কাজ করতে অসুবিধা হবে না ভাস্করদের।'—এ কথা বলে তিনি রওনা হলেন মন্দির পরিত্যাগ করার জন্য। রাহিল আর চিত্রবানের মধ্যে একবার মৃদু দৃষ্টি বিনিময় হল। চিত্রবান এরপর দৈনন্দিন কাজ বুঝিয়ে দিতে লাগলেন মজুরদের। সাময়িক বিশ্রাম লাভের আশায় রাহিল এগোল তার বিশ্রামকক্ষের দিকে। কক্ষে ফেরার পর মিত্রাবৃন্দার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় পরিশ্রান্ত রাহিলের চোখে ঘুম নেমে এল। সে স্বপ্ন দেখতে লাগল সে আর মিত্রাবৃন্দা ঘুরে বেড়াচ্ছে এক কুসুমকাননে। কতরকম ফুল ফুটে আছে, ফুলের সৌরভে আমোদিত চারপাশ।

ঘুরতে ঘুরতে মিত্রা একসময় রাহিলকে বলল, 'তোমার জন্য আমি মালা গাঁথব।'—এ কথা বলার পর রাহিলকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে এগোল পুষ্পশোভিত বৃক্ষর দিকে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই সে আতঙ্কে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওই যে! ওই যে!' রাহিল দেখতে পেল সেই বৃক্ষর আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে এক কদাকার কৃষ্ণবানরের মুখ। তার দৃষ্টিতে প্রকট কামলালসা। রাহিল সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার কোষমুক্ত করে ছুটে গেল সে জায়গাতে। মিত্রাকে ধরার জন্য বৃক্ষর আড়াল থেকে ঝাঁপ দিল সেই কামুক বানর। কিন্তু সে তাকে স্পর্শ করার আগেই রাহিল তার বুকে তলোয়ার বসিয়ে দিল। মাটিতে ছিটকে পড়ে বীভৎস মরণার্তনাদ করে উঠল সেই বানর। আর সেই আর্তনাদে যেন প্রলয়নাচন শুরু হল আশেপাশের বৃক্ষ শাখাগুলোতে।

প্রথমে প্রবল আন্দোলন শুরু হল গাছগুলোর মাথায়, তারপর সেই ওপর থেকে লাফ দিয়ে নামতে লাগল কৃষ্ণবানরের দল। রাহিল মিত্রার হাত ধরে বলল, 'চলো এখান থেকে পালাতে হবে।'

ছুটতে শুরু করল তারা। কানন জঙ্গল ভেদ করে ছুটে চলল তারা। আর তাদের পিছনে বীভৎস চিৎকার করে ছুটে চলল কৃষ্ণবানরের দল।

একসময় তাদের চোখে পড়ল এক মন্দির। রাহিল তা দেখে বলল,

BanglaBook.org

'আরে এ তো লক্ষণ মন্দির! আর তার ওপাশেই কান্ডারীয় মন্দির। সেখানে আমার সেনা আছে। তুমি লক্ষণ মন্দিরে আত্মগোপন করো। আমি তোমাকে সেনা নিয়ে এসে উদ্ধার করছি।' তার কথা শুনে মিত্রা ছুটতে শুরু করল লক্ষণ মন্দিরের দিকে। কিন্তু কিছুটা এগিয়েই সে হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। ভেসে এল তার আর্তনাদ! কী হল তার? রাহিল সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল সে জায়গাতে। সে দেখল সদ্য নির্মিত এক গভীর কূপের মধ্যে পড়ে গেছে মিত্রাবৃন্দা। তার ওপরে ওঠার পথ নেই।

মিত্রাবৃন্দা নীচ থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে রাহিলের উদ্দেশ্যে বলল, 'তুমি পালিয়ে যাও। নইলে দু-জনকেই হত্যা করবে অবমানবের দল।' রাহিল বলে উঠল, 'না, আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না।' ঠিক এই সময় আশপাশ থেকে শোনা গেল কৃষ্ণবানরদের চিৎকার, পদশব্দ। কূপের ভিতর থেকে মিত্রা আবার কাতর অনুরোধ জানাল—'পালাও সৈনিক, পালাও।' কূপ আগলে তলোয়ার হাতে কৃষ্ণবানরদের জন্য প্রস্তুত হল রাহিল। এসে পড়ল কৃষ্ণবানরেরা। কিন্তু তাদের দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল রাহিল।

ঘন কৃষ্ণবর্ণের দীর্ঘ রোমে আবৃত তাদের শরীর, আর সেই ধড়ের ওপর বসানো আছে শিখাধারী অনুদেবের মাথা! অনেক অনেক কৃষ্ণবানররূপী অনুদেব কামার্ত-হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। একজন অনুদেব তাকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতেই রাহিল তলোয়ারের এক কোপে তার মাথা কেটে ফেলল। সেই ছিন্ন মুণ্ড ছিটকে পড়ল কূপের গভীরে...

ঘুম ভাঙার পর রাহিল বেরিয়ে এল মন্দির-চত্বরে। এক জায়গায় প্রোথিত আছে সময়স্তম্ভ। তার ছায়া দেখে রাহিল বুঝতে পারল দ্বিপ্রহর হতে চলেছে। মন্দির তাকে একঝলকের জন্য এক কৃষ্ণবানরকে দেখল সে।

কিছু সময় প্রাঙ্গণে ঘুরে রাহিল মন্দিরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। ভাস্কর মাহবার কক্ষে প্রবেশ করে রাহিল দেখল সেখানে মিত্রাবৃন্দাকে নিয়ে এসেছেন মাহবা। রাহিলকে দেখে মাহবা বললেন আপনারা এই কক্ষে আলোচনা করুন, আমি দ্বারের বহির্দেশে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ

BanglaBook.org

এদিকে এলে সতর্ক করে দেব। অনুদেব মন্দিরে নেই ঠিকই, কিন্তু তিনি সম্ভবত প্রকটাক্ষকে নিয়োজিত করে গেছেন নজরদারির জন্য। সে সাধারণত মন্দিরের অন্তঃপুরে থাকে না, কিন্তু আজ তাকে সুরসুন্দরীদের আবাসস্থলের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম।' কক্ষ ত্যাগ করলেন মাহবা।

কক্ষের এক কোণে আনতভাবে দাঁড়িয়ে ছিল মিত্রাবৃন্দা। রাহিল তার সামনে এগিয়ে গিয়ে তার হাত স্পর্শ করল। রাহিলের দিকে মুখ তুলে চাইল মিত্রা। তার আয়ত চক্ষুতে জেগে আছে বিষণ্ণতা। রক্তিম ওষ্ঠাধার মৃদু মৃদু কাঁপছে। রাহিলকে দেখে আবছা হাসি জেগে উঠল তাঁর ঠোঁটে। বেশ কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ ভাবে তারা তাকিয়ে পরস্পরের দিকে। মিত্রাবৃন্দা তারপর বলল, 'আমার মুক্তি হবে না। তুমি আর আমার কথা ভেবো না।'

রাহিল প্রশ্ন করল, 'কেন?'

মিত্রা বলল, 'আজ সূর্যোদয়ের পর আমার কক্ষে এসেছিলেন অনুদেব। তিনি বলেছেন তার শয্যাসঙ্গিনী হলে সম্রাটকে বলে তিনি আমার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। তার প্রস্তাবে সম্মত না হলে আমার মৃত্যু ঘটবে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তিনি আমাকে আগামীকাল সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় দিয়েছেন।'

রাহিল কি শেষ পর্যন্ত মাহবা ও চিত্রবানের সাহায্যে মিত্রাবৃন্দাকে রক্ষা করতে পারবে? অসীম ক্ষমতার অধিকারী রাজপুরোহিত অনুদেব। স্বয়ং মহাসম্রাট বিদ্যাধর তার পৃষ্ঠপোষক। বিশাল সম্রাটবাহিনীর সামনে তো শুষ্ক তৃণখণ্ডের মতো রাহিল-মাহবা-চিত্রবানেরা। তাদের পরিকল্পনা কতটুকু সফল হবে জানা নেই রাহিলের। এসব ভেবে নিয়ে রাহিল বলল, 'তুমি সম্মত হও প্রধান পুরোহিতের প্রস্তাবে। তাতে তুমি মুক্তি পাবে কিনা জানি না, কিন্তু হয়তো তোমার প্রাণরক্ষা হবে।'

মিত্রা তার কথা শুনে তার হাতটা সজোরে আঁকড়ে ধরে বিষণ্ণ হেসে বলল, 'তা সম্ভব নয় সৈনিক। সে কথা আমি সেই মুহূর্তেই জানিয়ে দিয়েছি। আমার এই সামান্য ক্রীতদাসীর জীবনের আর কী মূল্য আছে। তোমার কটিদেশের ওই ছুরিকা আমাকে দাও। সে যদি আমাকে

BanglaBook.org

আলিঙ্গন করতে আসে তাহলে ওই ছুরিকা আমি নিজের বুকে বসিয়ে দেব।'

রাহিল বলে উঠল, 'না, এ হতে দেব না আমি। যতক্ষণ এ সৈনিকের দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ তোমাকে রক্ষা করব আমি।'

মিত্রা বলল, 'আমি তুচ্ছ নারী। আমার জন্য তুমি নিজের জীবন বিপন্ন কোরো না সৈনিক। তুমি জেনো আমি তোমারই রইলাম।'—আবেগমোথিত কণ্ঠস্বরে কথাগুলো বলে থরথর করে কাঁপতে লাগল মিত্রাবৃন্দা।

ঠিক এই সময় ভাস্কর মাহবা কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, 'সতর্ক হন, প্রকটাক্ষ এদিকে আসছে!'

রাহিল শুধু মিত্রাবৃন্দাকে বলল, 'তোমাকে মুক্ত করব আমি। ভাস্কর মাহবার নির্দেশের প্রতীক্ষা কোরো।'

মিত্রাবৃন্দা এরপর তার নির্দিষ্ট জায়গাতে গিয়ে দাঁড়াল। আর মাহবা তার প্রস্তরমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে হাতে লৌহশলাকা তুলে নিল। যেন এতক্ষণ ধরে মিত্রাবৃন্দার মূর্তি রচনা করছিলেন তিনি। আর এর পরই প্রকটাক্ষ কক্ষে প্রবেশ করল।

সে রাহিলকে সে-কক্ষে দেখে একটু বিস্মিতভাবে বলল, 'সৈনাধ্যক্ষ, আপনি এ-কক্ষে!'

রাহিল প্রথমে জবাব দিল, 'কক্ষগুলো পরিভ্রমণ করতে করতে এখানে উপস্থিত হলাম। ভাস্করের কাজ দেখছি।'—এ কথা বলে সে পালটা প্রশ্ন করল, 'তুমি তো অন্তঃপুরে আসো না? কার অনুসন্ধানে এখানে এলে?'

মন্দির-রক্ষীবাহিনীর প্রধান প্রকটাক্ষ জবাব দিল, 'প্রভু অমুদেব আমাকে মন্দিরের অন্তঃপুরে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলে গেছেন। তাই আমিও কক্ষ পরিভ্রমণ করছি।'

এ কথা বলার পরই হঠাৎ তার ঘূর্ণায়মান প্রকটাক্ষদ্বয় স্থির হয়ে গেল মিত্রাবৃন্দা যেখানে দণ্ডায়মান সেখানে মাটির দিকে তাকিয়ে। তারপর সে বলে উঠল, 'কিন্তু এ কী! এ অবস্থায় সুরসুন্দরীদের মূর্তি নির্মাণ তো শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ।'

তার কথা শুনে মাহবা আর রাহিল তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল মাটির দিকে। মিত্রাবৃন্দা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, দাঁড়িয়ে আছে সে জায়গাতে

BanglaBook.org

ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে। মিত্রাবৃন্দা বর্তমানে রজঃস্বীলা। রাহিলের সঙ্গে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি বিনিময় হল মিত্রার। প্রগাঢ় লজ্জায় সঙ্গে সঙ্গে মাথা নত করল সে।

ব্যাপারটা ধরতে পেরে বৃদ্ধ ভাস্কর মাহবা প্রকটাক্ষকে বললেন, 'রজস্বীলা অবস্থায় সুরসুন্দরীদের মূর্তি তৈরি নিষিদ্ধ আমি জানি। কিন্তু প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ, আগামীকাল সূর্যাস্তের মধ্যে সুরসুন্দরীদের মূর্তি রচনার কাজ শেষ করতে হবে। তাই এ কাজ করছি আমি।'—এই বলে তিনি মূর্তি রচনার কাজে নিয়োজিত হলেন। তার কথা শুনে প্রকটাক্ষ কোনও মন্তব্য করল না। কিন্তু সে কক্ষের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল। এ কক্ষে রাহিলের দীর্ঘ উপস্থিতি প্রকটাক্ষর মাধ্যমে অনুদেবের কানে গেলে তাঁর মনে সন্দেহর উদ্রেক হতে পারে। তাই রাহিল কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই কক্ষ ত্যাগ করল।

সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে প্রধান পুরোহিত মন্দিরে প্রত্যাগমন করলেন। রাহিল, চিত্রবান, প্রকটাক্ষ উপস্থিত হল তার সামনে। অনুদেব প্রথমে জানতে চাইলেন, সুরসুন্দরীদের মূর্তি নির্মাণের অগ্রগতি সম্বন্ধে।

চিত্রবান তাকে জানালেন, 'দুটি মূর্তি বাদে বাকি সব মূর্তি নির্মাণের কাজই শেষ হয়ে গেছে। বাকি দুটির কাজও কাল অপরাহ্নের মধ্যে শেষ হবে বলে ভাস্কররা জানিয়েছে।'

প্রধান পুরোহিত প্রশ্ন করলেন, 'কোন দুটি মূর্তি?'

চিত্রবান জবাব দিলেন, 'ভাস্কর স্থূলকোটি যে মিথুন মূর্তি রচনা করছেন সেটি এবং ভাস্কর মাহবা যে সুরসুন্দরী মূর্তি রচনা করছেন সেটি।'

প্রধান পুরোহিত বললেন, 'প্রয়োজনবোধে তাদের আজ সারারাত মূর্তি নির্মাণে নিয়োজিত থাকতে নির্দেশ দিন। যে-কোনও উপায়ে আগামীকাল সূর্যাস্তের মধ্যে মূর্তি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।'

চিত্রবান জানতে চাইলেন, 'সৈন্য আনয়নের কাজ কী হল?'

প্রধান পুরোহিত জবাব দিলেন, 'মহাসৈনাধ্যক্ষ উগ্রায়ুধ সে ব্যবস্থা করছেন। এক সহস্র সৈন্য তার নেতৃত্বে কাল রাতের মধ্যেই এসে উপস্থিত হবে। ওই অরণ্যর অভ্যন্তরে যে ফাঁকা স্থান আছে সেখানেই রাত্রিবাস

BanglaBook.org

করবে। পরদিন সূর্যোদয়ের সময় তারা মন্দিরে প্রবেশ করবে। মন্দিরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে অর্ধেক সেনা নিয়ে নগরীতে ফিরে যাবেন উগ্রায়ুধ। অর্ধেক সেনা এখানেই রয়ে যাবে। হয়তো ফেরার সময় আপনাদের সঙ্গী করবেন তিনি।' এই বলে তিনি তাকালেন রাহিলের দিকে।

সূর্য ডুবতে চলেছে। সারা দিনের পরিশ্রম শেষে মজুরের দল সারিবদ্ধ হচ্ছে মন্দির-চত্বর ছেড়ে তাদের জীর্ণ কুটিরে ফিরে যাবার জন্য। সেদিকে তাকিয়ে অনুদেব বললেন, 'আপনারা এবার রাতপ্রহরার জন্য প্রস্তুত হন। আজ আর কালকের রাতটাই শুধু। নতুন সেনাদল এলে আপনারা ভারমুক্ত হবেন। আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমি মন্দিরে প্রবেশ করব।'—একথা বলে প্রকটাক্ষকে তাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে অনুদেব এগোলেন মন্দির ত্যাগ করার জন্য।

তিনি প্রকটাক্ষকে নিয়ে চলে যাবার পর অন্যদিকে যাবার আগে চিত্রবান চাপা স্বরে রাহিলকে বলে গেলেন, 'নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হব।' তিনি চলে যাবার পর রাত্রি জাগরণের প্রস্তুতি শুরু করল রাহিল। সে প্রথমে এক জায়গাতে সমবেত করল তার সেনাদলকে। সে তাদের বলল, 'আজ রাত্রে তোমরা মন্দিরের সম্মুখ ভাগে নিয়োজিত থাকবে। পশ্চাদ্‌ভাগে যাবার দরকার নেই। ওখানে প্রহরার কাজে একলা নিয়োজিত থাকব আমি।'

একজন সৈনিক জানতে চাইল, 'একলা কেন?'

রাহিল বলল, 'রক্ষীবাহিনীর লোকটাকে যদি কোনও মানুষ হত্যা করে থাকে তবে সে নিশ্চই নির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে হানা দিয়েছিল বা তাকের ওপর উঠেছিল। আমি মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে আত্মগোপন করে থাকব। তোমরা কেউ মন্দিরের ওই অংশে না গেলে ওই স্থানকে অরক্ষিত মনে করে আবার হানা দিতে পারে। তখন আমি তাকে বন্দি করব। প্রয়োজনবোধে তোমাদের ডাকব। আমি একটা ফাঁদ পাততে চাইছি তার জন্য। আমাদের হয়তো আর ক'দিনের মধ্যে এ মন্দির ছেড়ে চলে যেতে হবে। যাবার আগে হত্যাকারীকে ধরতে পারলে পুরস্কৃত হবার সম্ভাবনা আছে এ বাহিনীর।'

BanglaBook.org

সৈনিকরা আশ্বস্ত হল তার কথায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামল। তারপর একসময় চাঁদ উঠল ঠিকই, কিন্তু সেই প্রায় অদৃশ্য চাঁদের আলো মন্দিরে এসে পৌঁছোচ্ছে না। সৈনিকের দল মশাল জ্বালিয়ে মন্দিরের সম্মুখভাগে প্রদক্ষিণ শুরু করল। রাহিল তাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করল। তারপর অন্ধকার ভেঙে মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে উপস্থিত হল। মাথার ওপরের সেই তাকে দণ্ডায়মান অস্পষ্ট নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে রাহিল ভাবতে লাগল মিত্রাবৃন্দার কথা। প্রহর এগিয়ে চলল। এক প্রহরে দূরের বনভূমিতে প্রহর ঘোষণা করল শৃগালের দল। ঠিক সেই সময় রাহিল দেখতে পেল দুই ছায়ামূর্তি উপস্থিত হয়েছে মাথার ওপরের সেই তাকে। চিত্রবান আর মাহবা। তারা যেন হাত নেড়ে উপরে উঠে আসতে বললেন রাহিলকে। তাদের দেখার পরই পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল রাহিল।

তারপর গতরাতের মতোই সোপানশ্রেণি দিয়ে ওপরে উঠে দেওয়ালগাত্র বেয়ে তাকে পৌঁছে, সুড়ঙ্গপথে রাহিল পৌঁছে গেল সেই গোপন কক্ষে। গতরাতের মতোই মশাল জ্বলছে সেখানে।

দুই ভাস্কর সেখানে সেই ফলকে খোদাইয়ের কাজ করছিলেন। রাহিল সেখানে উপস্থিত হলে কাজ থামালেন তারা। রাহিলকে ফলকটা দেখিয়ে চিত্রবান বললেন, 'শ্রমিক-ভাস্করদের নাম উৎকীর্ণ করার কাজ শেষ। সুরসুন্দরীদের নামও এই ফলকে খোদিত করে যাব আমরা। তারাও তো শ্রমিক, যৌন শ্রমিক। সে কাজটুকুও রাতের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।'

রাহিল বলল, 'কিন্তু, মিত্রাবৃন্দা ও সুরসুন্দরীদের মুক্তির কী উপায় হবে? আজ সূর্যোদয়ের সময় মিত্রাবৃন্দার কক্ষে গেছিলেন অনুদেব। তিনি তাকে তাঁর কামলালসা নিবৃত্ত করার কথা বলেছেন। নচেৎ তার মৃত্যু নাকি অবশ্যম্ভাবী। আমি মিত্রাবৃন্দাকে পুরোহিতের প্রস্তাবে রাজি হতে বলেছিলাম তাতে যদি তার প্রাণরক্ষা পায় সেজন্য। কিন্তু মিত্রাবৃন্দা অসম্মত সে প্রস্তাবে। সে সেকথা জানিয়েছে অনুদেবকে। তবু তিনি আগামীকাল সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর একবার ভেবে দেখার সময় দিয়েছেন মিত্রাবৃন্দাকে।'

বৃদ্ধ ভাস্কর মাহবা বললেন, 'মিত্রাবৃন্দা যদি অনুদেবের প্রস্তাবে রাজিও

BanglaBook.org

হয় তবুও তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ ঘটনা মিত্রাবৃন্দার মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রচার হলে কলঙ্ক লাগবে অনুদেবের গায়ে, তার প্রতিষ্ঠায়। অকৃতদার অনুদেব সব রিপুকে জয় করেছেন বলে প্রচারিত। তার সেই ভাবমূর্তিকে সম্রাটের সামনে রক্ষা করতে সে তার যৌনলালসা মোচনের পর হত্যা করবে মিত্রাবৃন্দাকে। তারপর তার দায় চাপাবে মানবী-যোনি-লোভি ওই দুই কৃষ্ণবানরের ওপর। ঠিক যেভাবে তিনি ওই তান্ত্রিক যোগীর বামার হত্যার দায় চাপিয়েছিলেন কৃষ্ণবানরদের ওপর। ওই মৃতা নারীর হাতে ধর্ষক-হত্যাকারীর চিহ্ন স্বরূপ যে ছিন্ন উপবীত ধরা ছিল সে উপবীত আসলে অনুদেবেরই। এ মন্দিরে একমাত্র তিনিই উপবীত ধারণ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি কৃষ্ণবানরদের নিধনের চেষ্টা করলেও পরবর্তী সময় তাঁর মাথায় নিশ্চই আবারও এ পরিকল্পনা খেলেছে। সেজন্যই তিনি প্রকটাক্ষকে নির্দেশ দিলেন কদলি ছড়া দিয়ে কৃষ্ণবানরদের আপ্যায়ন করার জন্য।'—একটানা কথাগুলো বলে থামলেন বৃদ্ধ ভাস্কর।

'তবে? আপনাদের কী পরিকল্পনা?' জানতে চাইল রাহিল।

প্রধান ভাস্কর চিত্রবান বললেন, 'আগামীকাল সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিত্রাবৃন্দা নিরাপদ। তারপর আপনি মিত্রাবৃন্দা ও অন্য নারীদের নিয়ে মন্দির ত্যাগ করে অরণ্য প্রদেশ দিয়ে চলে যাবেন কলচুরি সীমান্তে। অমাবস্যার রাতে আপনাদের সন্ধান পাবে না সম্রাটের সেনারা।'

রাহিল বলল, 'কিন্তু আমি তো সে পথ চিনি না। আর কলচুরিরাই বা আমাদের আশ্রয় দেবে কেন?'

প্রধান ভাস্কর জবাব দিলেন, 'ওই অরণ্যপ্রদেশে একদল যাযাবর উপজাতি উপস্থিত হয়েছে যারা প্রকৃতপক্ষে কলচুরিদের গুপ্তচর। আমি একজনকে পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে। হীরকখণ্ডের বিনিময়ে তারা আপনাদের কলচুরিদের রাজধানী ত্রিপুরীতে পৌঁছে দিতে সম্মত হয়েছে। অরণ্যে প্রবেশ করার পর রাতের অন্ধকারে তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আপনাদের। যারা মহারাজ বিদ্যাধরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কলচুরিরা তাদের আশ্রয় দেয়।'

'আর আপনারা?'

মাহবা বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'এতজন মজুর-ভাস্করদের নিয়ে একসঙ্গে

BanglaBook.org

কি পালিয়ে যাওয়া সম্ভব? চান্দেলবাহিনীর হাতে সবাই ধরা পড়ে যাব। আমরা দুজন হয়তো আপনার সঙ্গী হতে পারতাম। কিন্তু তাদের এখানে ফেলে রেখে আমরা যাই কীভাবে? আমরা এখানেই থাকব। তাদের ভাগ্যর সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে আমাদের ভাগ্য। শুনছি কলচুরি আর প্রতিহাররা সম্মিলিতভাবে নাকি চান্দেলরাজ্যে আক্রমণ হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদি তেমন কিছু ঘটে তখন হয়তো মুক্তি পাব আমরা...'

তাঁর কথা শুনে রাহিল বলল, 'আপনাদের কথা বুঝলাম, কিন্তু মন্দির-রক্ষীবাহিনী বা অনুদেবের চোখ এড়িয়ে আমরা মন্দির পরিত্যাগ করব কীভাবে?'

চিত্রবান এ প্রশ্নর জবাব দিলেন, 'আপনার সৈন্যরা কি আপনার নির্দেশ পালন করে চলবে? যদি তাদের উৎকোচ হিসাবে হীরকখণ্ড দেওয়া হয় তবে কি তারা আপনাকে অনুসরণ করবে? আমাদের পরিকল্পনার সফলতার ক্ষেত্রে এটা জানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।'

রাহিল একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তারা আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী। তা ছাড়া সৈনাধ্যক্ষর নির্দেশ পালন করে অধস্তন সৈনিকরা। যতক্ষণ না আমার চেয়ে উচ্চপদমর্যাদার কোনও সৈনাধ্যক্ষ এসে আমার নির্দেশ খণ্ডন করছে ততক্ষণ তারা আমার আজ্ঞাবাহী। এটাই নীতি প্রত্যেক যুদ্ধব্যবসায়ীর কাছে।'

চিত্রবান বললেন, 'আপনার সেনারাই প্রতিহত করবে মন্দির-রক্ষীদের। প্রধান পুরোহিতকে সাহায্য করতে প্রকটাক্ষর নেতৃত্বে একমাত্র তারাই বাধার সৃষ্টি করতে পারে আপনাদের। আর এ কাজে সহায়তা করার জন্য আপনার সৈনিকদের একটা করে হীরকখণ্ড দেবেন। যার মূল্য একজন যুদ্ধব্যবসায়ীর সারা জীবনের উপার্জন থেকে অনেক বেশি।'

রাহিল বিস্মিতভাবে বলল, 'আপনারা বারবার হীরকখণ্ডের কথা বলছেন, কিন্তু তা আমি সংগ্রহ করব কীভাবে?'

চিত্রবান তার পোশাকের ভিতর থেকে একটা ছোট চর্মথলি বার করলেন। তার মুখ উন্মোচিত করতেই মশালের আলোতে ঝলমল করে উঠল তার ভিতরে থাকা হীরকখণ্ডগুলো। চিত্রবান বললেন, 'বিকর্না আমাকে দিয়েছে। যদিও সামান্যই আমি এ জিনিস সংগ্রহ করেছি তার

BanglaBook.org

কাছ থেকে।'

বিস্ময়ের যেন শেষ নেই রাহিলের। সে বলল, 'বিকর্না হীরকখণ্ডগুলো কেন দিল আপনাকে?'

চিত্রবান বললেন, 'কাল শেষ রাতে যখন এ কক্ষ ত্যাগ করে মন্দিরের অন্তঃপুর থেকে নির্গত হতে যাচ্ছি তখন আমরা দুজন মুখোমুখি হয়ে গেলাম। ভূগর্ভ থেকে হীরকপূর্ণ স্বর্ণকলস নিয়ে মন্দিরেরই কোনও কক্ষে তা লুকিয়ে রাখার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করছিল বিকর্না। সে ভয় পেয়ে গেল আমার হাতে ধরা পড়ে গিয়ে। আমি অবশ্য সামান্য কিছু হীরকখণ্ড নিয়ে কলস ফিরিয়ে দিলাম বিকর্নাকে। ব্যাপারটা অনুদেবের কাছে গোপন থাকবে এ ব্যাপারে আমরা পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাল সূর্যাস্তের পর সে-ও মন্দির ত্যাগ করবে। তবে সে আপনাদের সঙ্গে যাবে না। সে যাবে হিমালয়ের পাদদেশে চম্বা রাজ্যে। সেখানে সে সেই সম্পদ দিয়ে কোনও সম্ভ্রান্ত সুন্দর পুরুষকে প্রলুব্ধ করে তার সঙ্গে ঘর বাঁধবে। আমাকেও সে তার সঙ্গী হবার প্রস্তাব দিয়েছিল।

রাহিল বলল, 'আমাকেও সে একই প্রস্তাব দিয়েছিল।'

চিত্রবানের কথা শেষ হলে মাহবা বললেন, 'আমার ধারণা সূর্যাস্ত হলেই অনুদেব উপস্থিত হবেন মিত্রাবৃন্দার কক্ষে। মিত্রাবৃন্দার সম্মতির অপেক্ষা আর তিনি করবেন না। তাঁকেও রাত্রির মধ্যে তাঁর পরিকল্পনা সফল করতে হবে। মুহূর্তর জন্যও তাদের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অঘটন ঘটতে পারে। নতুন কোনও পরিকল্পনা করতে পারেন চিত্রবান। কাল দ্বিপ্রহরে মূর্তি নির্মাণের পর প্রথমে চিত্রাকে আমি কক্ষে ফেরাব। তারপর অন্ধকার নামলেই তাকে রেখে আসব বিকর্না যে কক্ষ থেকে কলস উদ্ধার করেছে সেই কক্ষে। সেখান থেকেই আপনি তাকে নিয়ে অন্যদের সঙ্গী করে যাত্রা শুরু করবেন সীমান্তের উদ্দেশ্যে।'

রাহিল বলল, 'আপনাদের পরিকল্পনা এবার স্পষ্ট হল আমার কাছে। কিন্তু এর বিনিময়ে আমাকে আপনাদের কী কাজ করতে হবে বলুন?'

কয়েক মুহূর্তর জন্য নিস্তব্ধতা নেমে এল সেই ঘরে। তারপর চিত্রবান বললেন, 'আপনাকে করতে হবে আসল কাজটা। যা না করলে কারো মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। আমাদের সবাইকেও চূড়ান্ত বিপদের সম্মুখীন হতে

BanglaBook.org

হবে ভবিষ্যতে।'

'কী সেই কাজ'? জানতে চাইল রাহিল।

মৃদু দৃষ্টি বিনিময় হল দুই ভাস্করের মধ্যে। বৃদ্ধ ভাস্কর মাহবা, রাহিলের চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মন্দির পরিত্যাগের আগে হত্যা করতে হবে প্রধান পুরোহিত অনুদেবকে।'

চিত্রবান এরপর বললেন, 'আমরা ভাস্কর। ক্ষত্রিয় বা যুদ্ধ ব্যবসায়ী নই। মন্দির-রক্ষীবাহিনীর লোকটাকে আমরা ধরা পড়ার আতঙ্কে ওপর থেকে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে ঘটনাচক্রে হত্যা করেছি ঠিকই, কিন্তু সামনাসামনি কাউকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করিনি আমরা। বিশেষত, সে ব্যক্তি যখন অনুদেব। তার ওপর যতই ঘৃণা থাক তাঁর সুকঠিন ব্যক্তিত্ব গ্রাস করে আমাদের। সর্পের চোখের দিকে তাকিয়ে অন্য প্রাণী যেমন সম্মোহিত হয়ে যায়, ক্ষমতা থাকলেও যেমন সে সর্পের গ্রাসে পরিণত হয় তেমনই হয়তো তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েও কালসর্পের সম্মোহনে পরাস্ত হলাম আমরা। তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলাম। তাই এ কাজের ভার আপনাকে নিতে হবে। পারবেন তো?'

রাহিলের চোখে ভেসে উঠল মিত্রাবৃন্দার মুখ। তাকে মুক্তি দিতেই হবে রাহিলকে। নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যে রাহিলের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছে অনুদেবের প্রস্তাব। মুহূর্তখানেক নীরব থেকে রাহিল জবাব দিল, 'পারব। কিন্তু কীভাবে? তার মুণ্ডচ্ছেদ করব, নাকি ছুরিকা বিঁধিয়ে দেব তার পঞ্জরে?'

তার কথা শুনে আবছা হাসি ফুটে উঠল তাদের মুখে। চিত্রবান বললেন, 'না, সেভাবে নয়। তার অস্ত্রেই তাকে ঘায়েল করতে হবে। যাতে পরদিন সূর্যোদয়ের পর সৈন্যবাহিনী যখন মন্দিরে প্রবেশ করবে তখন তারা ভাবে কৃষ্ণবানরের আক্রমণেই মৃত্যু হয়েছে তার। সৈন্যবাহিনী মন্দিরে এসে নিশ্চই দেখা পাবে কৃষ্ণবানরদের। আমি, ভাস্কর মাহবা বা অন্য ভাস্কর-মজুররা কেউই রাত্রিবাস করে না মন্দিরে। সে দায় তাই বর্তাবে না আমাদের ওপর।'

চিত্রবানের কথা শেষ হবার পর মাহবা তার পোশাকের মধ্যে থেকে কতগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি অস্ত্র বার করে এগিয়ে দিল রাহিলের দিকে। সে

BanglaBook.org

অস্ত্রগুলো অঙ্গুরীয়র মতো ধারণ করা যায়। ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও তা মারাত্মক অস্ত্র—বাঘনখ!

রাহিলের হাতে সেগুলি তুলে দিয়ে মাহবা বললেন, 'মিত্রাবৃন্দাকে তার কক্ষ থেকে অপসারিত করার পর আপনি আত্মগোপন করবেন সেই কক্ষে। সূর্যাস্ত হলে অনুদেব নিশ্চিত গোপনে প্রবেশ করবেন সেই কক্ষে। আর তারপর...।'

প্রধান ভাস্কর চিত্রবান এরপর রাহিলের দিকে এগিয়ে দিলেন তার সৈন্যদের পারিতোষক দেবার জন্য সেই হীরকথলি...

নীচে নেমে আসার পর রাহিল আবার এসে দাঁড়াল মন্দিরের পশ্চাতভাগে। তিন প্রহর পর্যন্ত সে সেখানে থেকে চতুর্থ প্রহরে এসে সে মিলিত হল সম্মুখভাগে সেনাদলের সঙ্গে।

১০

ভোর। বিন্ধ্যাচল পর্বতের মাথা থেকে ধীরে ধীরে আলো ছড়িয়ে পড়ল বনানী ঘেরা মন্দিরগুলোর মাথায়, কান্ডারীয় মন্দিরের চত্বরে। মন্দিরগাত্রে, স্তম্ভগাত্রে, চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিগুলোর দিকে তাকাল রাহিল। তারাও যেন তাকিয়ে আছে রাহিলের দিকে। রোজ এই মূর্তিগুলোকে সারাদিনে বহুবার দেখে রাহিল, কিন্তু আজ সেই মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে তাদেরকে যেন বড় আপন মনে হল রাহিলের।

পরদিন ভোরবেলা এ মন্দিরে আর তার সূর্যোদয় দেখা হবে না। তখন সে এই স্থান থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। তার আর কোনওদিন ফেরাও হবে না এই কান্ডারীয় মন্দিরে। রাহিল এই প্রথম অনুধাবন করল এখানে থাকতে থাকতে এই মন্দিরের প্রতি একটা মায়া জন্মে গেছে তার। ওই তো সেই শার্দূল মূর্তি, প্রথম দিন যে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখেছিল সেই মূর্তিটাকে। তার কিছুটা তফাতে যে জীবন্ত হস্তিমূর্তি দাঁড়িয়ে তার আড়ালে দ্বিপ্রহরের সূর্যর তেজ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য এসে দাঁড়াত রাহিল। আর ওই যে দূরে পূর্বকোণে যে স্তম্ভ

BanglaBook.org

দেখা যাচ্ছে, যার গায়ে খোদিত আছে এক অপ্সরা মূর্তি, তার গায়ে ভর দিয়ে দূরের পর্বতমালার দিকে চেয়ে থাকত সে। টুকরো টুকরো স্মৃতি ভিড় করছিল রাহিলের মনে।

মজুর-শিল্পীদের অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যাচ্ছে। দল বেঁধে তারা মন্দিরের দিকে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হবে তারা। নিয়োজিত হবে নিজেদের কাজে। কিন্তু তারা এসে উপস্থিত হওয়ার আগেই রাহিল দেখতে পেল প্রকটাক্ষকে সঙ্গে নিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন অনুদেব। প্রাঙ্গণের একপাশে দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলেন। আর তারপরই চত্বরে উপস্থিত হলেন চিত্রবানও। প্রধান পুরোহিতকে দেখতে পেয়ে চিত্রবানও এগোলেন সেদিকে। রাহিলও এগোল এবার।

প্রধান পুরোহিত তাদের দেখতে পেয়েই প্রকটাক্ষর সঙ্গে আলোচনা থামিয়ে দিলেন। তারা দুজন তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অনুদেব তাদের প্রতি ভালো করে দৃষ্টিপাত করে রাহিলকে প্রশ্ন করলেন, 'কাল রাতের কোনও বিশেষ সংবাদ আছে?'

রাহিল জবাব দিল, 'না, সব কিছুই স্বাভাবিক ছিল।'

'আপনি রাতে মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে কোন সময় গেছিলেন?' জানতে চাইলেন অনুদেব।

রাহিল উত্তর দিল, 'আমি নিজে সেখানেই সারারাত প্রহরায় ছিলাম। রাত তিন প্রহর পর্যন্ত।'

অনুদেব বললেন, 'মন্দির-রক্ষীবাহিনীর একজন লোকের দাবি সে নাকি নীচ থেকে শেষ প্রহরে দুজন ছায়ামূর্তিকে দেখেছে ওই তাকের গায়ে।'

চিত্রবান সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ছায়ামূর্তির সংখ্যা বেড়ে গেল! একের বদলে দুজন! তবে আমার ধারণা ও লোকটা ভুল দেখেনি।'

অনুদেব প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?'

চিত্রবান মৃদু হেসে বললেন, 'দুটো ছায়ামূর্তি অর্থাৎ নিশ্চিত ওই কৃষ্ণবানর দুটো হবে। তারা ওই অংশে গেছিল।'

রাহিলও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, প্রধান পুরোহিতের অনুমান সঠিক। একটু আগেই আমি ঠিক সূর্যোদয়ের মুহূর্তে দেখলাম মন্দিরের

BanglaBook.org

পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে তাক বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বানর দুটো এদিকে আসছে।' এই বলে একবার ঘাড় ফিরিয়ে বানর দুটোকে দেখা যায় নাকি সে ভান করে রাহিল তাকাল মন্দির-শীর্ষের দিকে।

তাদের দুজনের একই বক্তব্য শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সম্ভবত বক্তব্যর সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করলেন অনুদেব। তারপর বললেন, 'তবে একজনের গতিবিধি কিঞ্চিত সন্দেহর উদ্রেক ঘটাচ্ছে।'

চিত্রবান জানতে চাইল, 'কার?'

প্রধান পুরোহিত জবাব দিলেন, 'মাহবা নামের ওই বৃদ্ধ ভাস্করের। কাল রাতে তো সে মন্দিরেই ছিল। কিন্তু প্রথম প্রহরের পর দীর্ঘসময় সে অনুপস্থিত ছিল তার কক্ষে। কোথায় গেছিল সে? এই প্রকটাক্ষ তার কক্ষে গিয়ে তাকে পায়নি!'

প্রকটাক্ষ মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করল তার কথায়।

রাহিল বলল, 'ঠিক আছে, আমি তাকে সারাদিন নজরদারীর মধ্যে রাখব।'

অনুদেব বললেন, 'আগামী কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কাল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজকের রাতটা আমিও মন্দিরে কাটাব। প্রধান ভাস্কর আপনি সমস্ত মজুর-ভাস্করদের জানিয়ে দিন সূর্যাস্তের পর কোনও ভাস্কর-মজুররাই যেন মন্দির-চত্বরে না থাকে। সূর্যাস্তের পূর্বে ওই দুই ভাস্করেরও কাজ শেষ হয়ে যাবে নিশ্চই। আর মজুরদের জানিয়ে দিন আগামীকাল তাদের ছুটি। মন্দিরে আসার প্রয়োজন নেই। কাল সৈন্যবাহিনী আসবে, নতুন নারীদের দল আসবে, বেশি লোক থাকলে কাজের ব্যাঘাত ঘটবে।'

শিল্পী-মজুরদের দল উপস্থিত হতে শুরু করেছে মন্দিরে। প্রধান পুরোহিত অনুদেব এরপর বললেন, 'মন্দির পরিক্রমা করে কিছু সময়ের মধ্যে আমি যাব যেখানে কূপ খোদিত হচ্ছে সে-স্থানে। সে-স্থান একবার দেখে নেওয়া প্রয়োজন। তারপর আমাকে নিয়োজিত থাকতে হবে অন্য কাজে। উগ্রায়ুধ আর তার সেনাদল তো কাল প্রত্যুষেই মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হবে। উগ্রায়ুধের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি আমাকে একটি রণশঙ্খ উপহার দিয়েছেন। তাকে কিছু উপহার দেওয়াও আমার কর্তব্য। এক কাষ্ঠশিল্পীকে দারুকাঠের এক যক্ষীমূর্তি নির্মাণ করতে বলেছি। তা

BanglaBook.org

সংগ্রহ করতে হবে আমাকে। এসব কাজ মিটতে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হবে। তারপর বিশ্রাম লাভ করে সূর্যোদয়ের আগেই আমি ফিরে আসব মন্দিরে। আমি ফিরে এসে পরবর্তী নির্দেশ দেব। এই সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাস্কর-মজুরদের দল মন্দির ত্যাগ করে ততক্ষণ তাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখবেন। আর বিকর্নাকে জানিয়ে দিন সুরসুন্দরীদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে। তারা যেন তাদের নিজেদের কক্ষেই থাকে। আগামীকাল সেনাদল উপস্থিত হলে সূর্যালোকে উপস্থিত হবে তারা।

রাহিল আর চিত্রবান মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি প্রকাশ করল তাঁর কথায়। প্রকটাক্ষকে সঙ্গী করে অনুদেব এরপর এগোলেন মন্দির পরিক্রমণের জন্য।

চিত্রবান সমবেত মজুর-ভাস্করদের দিকে এগোবার আগে রাহিলের উদ্দেশ্যে চাপা স্বরে বললেন, 'মিত্রাবৃন্দার ওপর লালসা চরিতার্থ করার জন্যই হয়তো প্রধান পুরোহিত মন্দিরে রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। অথবা এমনও হতে পারে কোনও কারণে সন্দেহর উদ্রেক ঘটেছে তাঁর মনে। তিনি মন্দির-চত্বর ত্যাগ করলেও প্রকটাক্ষ তার হয়ে মন্দির-চত্বরে নজরদারী করবে, আমাদের ওপরও নজরদারী চালাবে। অতএব সাবধান। আমি মন্দির-প্রাঙ্গণেই আছি। প্রয়োজন হলে আমার সঙ্গে শলা করবেন।'

রাহিল নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল। চিত্রবান উপস্থিত হলেন মজুর-ভাস্করদের কাছে। তাদেরকে কাজ বুঝিয়ে দেবার আগে তাদের তিনি প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ জানিয়ে দিলেন। পরদিন কাজে আসতে হবে না জেনে মৃদু আনন্দের কলরব উঠল শ্রমিকদের মধ্যে। এ সৌভাগ্য তাদের বড় একটা হয় না। প্রধান ভাস্করের কথা শেষ হবার পর তাদের জমায়েত ভেঙে গেল। তারা নিয়োজিত হল দৈনন্দিন কাজে।

প্রভু অনুদেব প্রথমে মন্দির প্রদক্ষিণ করে প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে। কিছু সময় পর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মন্দির-চত্বর পরিত্যাগ করলেন। প্রকটাক্ষ তাঁকে মন্দির-ভিতের নীচে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার ওপরে ফিরে এল। রাহিল এরপর শুরু করল মন্দির পরিক্রমা।

মন্দির-চত্বরের প্রায় প্রতিটা অংশেই শেষ একবারের জন্য উপস্থিত হতে লাগল রাহিল। ছুঁয়ে দেখতে লাগল দেওয়াল স্তম্ভর গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা পরিচিত মূর্তিগুলোকে। তারই মাঝে চাপা শঙ্কা কাজ করতে লাগল তার

BanglaBook.org

মনে। নিজের বাহুর ওপর আস্থা আছে তার। সঙ্গে মাহবা আছেন, চিত্রবান আছেন, তার সৈনিকেরাও হীরকখণ্ডর বিনিময়ে রাজি হয়েছে তার সঙ্গী হতে, রাহিলের সঙ্গে তারাও এ রাজ্য ছেড়ে যাবে। কিন্তু অনুদেব অত্যন্ত ধূর্ত মানুষ। শেষ পর্যন্ত এমন কোনও ঘটনা ঘটবে না তো যাতে তাদের পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়? মাঝে মাঝেই এ প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল রাহিলের মনে।

সময় এগিয়ে চলল। একসময় সূর্য মাথার ওপর পৌঁছোল। তারও বেশ কিছু সময় পর ঠিক দ্বিপ্রহরে রাহিল মন্দিরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে এগোল মাহবার কক্ষের দিকে।

সে কক্ষে প্রবেশ করেই রাহিল দেখতে পেল মিত্রাবৃন্দাকে। মাহবা মূর্তি নির্মাণের জন্য মিত্রাবৃন্দাকে নিয়ে এসেছেন কক্ষে। মাহবা রাহিলকে বললেন, 'মিত্রাবৃন্দাকে জানিয়ে দিয়েছি আমাদের পরিকল্পনার কথা। কাজ শেষ করে ওকে ওর কক্ষে পৌঁছে আমি মন্দির ত্যাগ করব। তারপর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসে ওকে নিয়ে যাব সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে। সেখান থেকে এই রমণীকে আপনি উদ্ধার করবেন।'

রাহিল তাকাল মিত্রাবৃন্দার দিকে। মুক্তির আনন্দে, খুশিতে উদ্ভাসিত তার মুখ। আজ আর তার চোখের তারায় কোনও বিষণ্ণতা জেগে নেই। রাহিল তাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার ভয় করছে না তো?'

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে মিত্রাবৃন্দা জানাল—'না'।

রাহিল এরপর তাকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করল প্রকটাক্ষ। মুখে কিছু না বললেও সন্দিগ্ধভাবে তাকাতে লাগল ঘরের চারদিকে। মূর্তির চক্ষুদানের কাজ করছেন মাহবা। মিত্রাবৃন্দা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখতে লাগল রাহিল আর প্রকটাক্ষ। হঠাৎ কাজ থামিয়ে মাহবা তাদের দুজনের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মূর্তি নির্মাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবার আমি করব। অক্ষি-গোলকে দৃষ্টি-গোলক রচনা করব। আপনাদের উপস্থিতি আমার মনঃসংযোগ নষ্ট করতে পারে। এ কাজের সময় ভাস্কর ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত থাকে না। অনুগ্রহ করে আপনারা কক্ষ ত্যাগ করুন। সময় বেশি নেই। প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে সূর্যাস্তের আগেই মূর্তি নির্মাণ সম্পন্ন করে আমাকে

BanglaBook.org

মন্দির ত্যাগ করতে হবে।' হয়তো তিনি মিত্রাবৃন্দার সঙ্গে একান্তে কোনও কথা বলার জন্যই এই কৌশল অবলম্বন করলেন।

রাহিল সঙ্গে সঙ্গে প্রকটাক্ষর উদ্দেশ্যে বলল, 'হ্যাঁ, এই কক্ষে বেশিক্ষণ আবদ্ধ থাকা উচিত হচ্ছে না। প্রধান পুরোহিত আমাদের সর্বত্র নজর দিতে বলেছেন।'

অগত্যা, কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন প্রকটাক্ষ রাহিলের সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করল। বাইরের প্রাঙ্গণে বেরিয়ে কেউ কারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করে দুজনে এগোল দু-দিকে। রাহিল ঘুরে বেড়াতে লাগল প্রাঙ্গণে। মাঝে মাঝে তার সাক্ষাৎ হতে লাগল তার সৈনিকদের সঙ্গে। চোখের ভাষাতে তারা রাহিলকে জানিয়ে দিল তারা প্রস্তুত আছে। সূর্য যত পশ্চিমে এগোতে থাকল তত রাহিলের বুকের ভিতর উত্তেজনা বাড়তে লাগল। বিকাল হল একসময়। মন্দির-ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে রাহিল একসময় দূর থেকে দেখতে পেলেন অনুদেব আসছেন।

শেষবিকালে রাত্র জাগরণের প্রস্তুতি নিয়ে মন্দির-চত্বরে উপস্থিত হলেন কান্ডারীয় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অনুদেব। তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন মন্দির-প্রাঙ্গণের ঠিক সে জায়গাতে যেখানে মজুর-ভাস্করের দল প্রতিদিন কুটিরে ফেরার জন্য উপস্থিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে। তিনি সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রকটাক্ষ কোথা থেকে যেন আবির্ভূত হল তাঁর পাশে।

রাহিলও উপস্থিত হল সেখানে। তিনি কোনও বাক্যালাপ করলেন না রাহিলের সঙ্গে। রাহিল আড়চোখে ভালোভাবে একবার দেখল অনুদেবকে। আজ অনুদেব অস্ত্রসজ্জিত। তার এক হাতে ধরা আছে একটা প্রকাণ্ড শূল, অন্য হাতে একটা রণশঙ্খ।

পরনে শুভ্র পোশাকের বদলে রক্তাম্বর, মাথার পিছনে দীর্ঘ শিখা শক্তভাবে রেশমের ফিতে দিয়ে বাঁধা। তবে তাঁর পায়ে আজ খড়ম নেই, পদযুগল উন্মুক্ত। রাহিলের অনুমান হল যে নিঃশব্দে চলার জন্যই তার পদযুগল আজ খড়মহীন। রক্তাম্বরে সজ্জিত, শূলবাহী, দানবাকৃতি, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের প্রধান পুরোহিত অনুদেব কঠিন চোয়ালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে। যেখানে এক-এক করে উপস্থিত

BanglaBook.org

হতে শুরু করেছে মজুরের দল। কিছু সময়ের মধ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন চিত্রবানও। তাকে দেখে প্রধান পুরোহিত শুধু জানতে চাইলেন, 'দুই ভাস্করের মূর্তি নির্মাণ সম্পন্ন?'

প্রধান ভাস্কর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তাদের কাজ সম্পন্ন।'

বিন্ধ্য পর্বতের মাথার ওপর সূর্য ঢলে পড়ল। শিল্পী-মজুরদের দল সমবেত হল মন্দির-চত্বরে। তারপর সারবদ্ধভাবে তারা এগোল চত্বর ছেড়ে কুটিরে ফেরার জন্য। এক-একজন মজুর-ভাস্কর তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আর তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন অনুদেব। একসময় হেঁটে গেলেন মাহবাও। রাহিল খেয়াল করল যে তার দিকে তাকিয়ে অনুদেবের চোখের দৃষ্টি যেন তার ওপর স্থির হয়ে গেল। তার দৃষ্টি বেশ কিছুক্ষণ অনুসরণ করল মাহবাকে। যতক্ষণ না মাহবা অদৃশ্য হলেন তাঁর দৃষ্টির বাইরে।

মজুরদের শেষ লোকটা একসময় মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করল। অনুদেব এরপর তাকালেন অনতিদূরের বনভূমির দিকে। একটা আবছা কোলাহলের শব্দ যেন সেদিক থেকে ভেসে আসছে! যে শব্দটা মন্দির-প্রাঙ্গণে মজুরদের পদশব্দে কেউ খেয়াল করেনি। ধীরে ধীরে প্রধান পুরোহিতের ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি ফুটে উঠল। কথা রেখেছেন মহাসৈনাধ্যক্ষ। তিনি ও তার সৈন্যরা উপস্থিত হতে শুরু করেছে ওই অরণ্যের আড়ালে। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত প্রধান পুরোহিত অনুদেব। এরপর তিনি বললেন, 'সৈন্যবাহিনী ও মন্দির-রক্ষীবাহিনীর সবাইকে এখানে সমবেত করা হোক।'

অনুদেবের নির্দেশে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কাজ সম্পন্ন করল রাহিল ও প্রকটাক্ষ। নিজ নিজ বাহিনীর লোককে সেখানে হাজির করল তারা। প্রধান পুরোহিতের সামনে দু-ভাগে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল তারা।

প্রধান পুরোহিত তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কাল সূর্যোদয় হলেই বৃহৎ সেনাদল প্রবেশ করবে মন্দিরে। কিন্তু এই সূর্যাস্ত থেকে কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। কোনও অবস্থাতেই যেন সুরসুন্দরীদের কেউ মন্দির পরিত্যাগ না করতে পারে। দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রহরা দেওয়া হবে। সৈন্যদল থাকবে মন্দির-চত্বরে,

BanglaBook.org

আর মন্দির-রক্ষীবাহিনী আবৃত করে থাকবে মন্দিরের নীচের চত্বর। মন্দিরের অন্তঃপুরে প্রহরার তেমন প্রয়োজন নেই। ওই অংশে আমি নিজে দৃষ্টি রাখব। সবাই সতর্ক থাকবে। কারো কাজে সামান্য গাফিলতি হলে রাজনির্দেশে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর আজ রাতের নিরাপত্তা যদি তোমরা সুনিশ্চিত করতে পারো তবে তোমরা প্রত্যেকে পুরস্কৃত হবে। এবার তোমরা যাও। মন্দিরের বহিরংশে মশাল প্রজ্বলিত করে প্রহরার কাজ শুরু করো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামবে।'

অনুদেবের নির্দেশের পর কর্তব্য সম্পাদন করতে ছড়িয়ে পড়ল দুই বাহিনী। রাহিল শুধু অনুদেবের শেষ নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইল। তিনি রাহিলকে বললেন, 'আমি মন্দিরের সম্মুখভাগে আর আপনি পশ্চাদ্‌ভাগে থাকবেন।'

প্রধান ভাস্কর চিত্রবান জানতে চাইলেন, 'আমার মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিতির প্রয়োজন আছে কি?'

অনুদেব জবাব দিলেন, 'আপনার রাত্রি জাগরণের প্রয়োজন দেখি না। আপনি মন্দির ত্যাগ করতে পারেন। তবে সূর্যোদয়ের প্রাক্ মুহূর্তেই মন্দিরে চলে আসবেন। সৈন্যবাহিনী মন্দিরে প্রবেশ করার সময় আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।'

প্রভু অনুদেবের কথায় সম্মতি প্রকাশ করে তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করলেন চিত্রবান।

অন্ধকার নামতে শুরু করল মন্দির-চত্বরে। ইতিমধ্যেই মন্দির-প্রাঙ্গণে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে মশালের আলো।

নিকষ কালো রাত্রি। মন্দির-প্রাঙ্গণে স্তম্ভ, দেওয়ালের গায়ে স্থানে স্থানে মশাল গোঁজা হয়েছে। কিন্তু সেই মশালের আলো মন্দির-প্রাঙ্গণের অন্ধকার দূর করতে পারছে না, বরং যেন আরও গাঢ় মনে হচ্ছে স্তম্ভ, মূর্তি, দেওয়ালের আড়ালে জমে থাকা অন্ধকার। আর তারই মাঝে পদচারণা করছে রাহিলের সৈন্যবাহিনী। ভৌতিক লাগছে তাদের অবয়বগুলো। অনুদেবও নিশ্চই মন্দির-প্রাঙ্গণে কোথাও আছেন এই অন্ধকারের মধ্যে।

প্রাঙ্গণের নীচের চত্বরে প্রহরারত মন্দির-রক্ষীবাহিনীর লাঠি ঠোকার শব্দ কানে আসছে মাঝে মাঝে। তা ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই মন্দির-

BanglaBook.org

প্রাঙ্গণে। অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবে আছে কান্ডারীয় মন্দির। রাহিল বেশ কিছুক্ষণ রক্ষীদের সঙ্গে অন্ধকারে পরিভ্রমণ করল। তারপর প্রবেশ করল মন্দিরের গাঢ় অন্ধকার ঢাকা অন্তঃপুরে। যে অংশে সুরসুন্দরীরা থাকে সে অংশরই কোনও এক কক্ষ থেকে শুধু মৃদু আলোর রেশ আসছে, বাকি অংশে রয়েছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোনওরকমে হাতড়ে হাতড়ে অন্য সুরসুন্দরীদের কক্ষর বেশ কিছুটা তফাতে মিত্রাবৃন্দার জন্য নির্ধারিত কক্ষে প্রবেশ করল রাহিল। ইতিপূর্বে সে এই কক্ষে উপস্থিত না হলেও মন্দিরের অন্তঃপুর পরিক্রমণের সময় কিছুটা তফাত থেকে এ কক্ষ দেখেছিল রাহিল। রাহিল সে কক্ষে পৌঁছে চক্‌মকি পাথর বার করে ঘসল। মুহূর্তর জন্য আলো ছড়িয়ে পড়ল সে-কক্ষে। না, মিত্রাবৃন্দা কক্ষে নেই, তবে এক অদ্ভুত সৌরভ টের পেল রাহিল। সে বুঝতে পারল কক্ষ চিনতে তার ভুল হয়নি, যতবার সে মিত্রার সামনে উপস্থিত হয়েছে ততবার সে টের পেয়েছে এই সৌরভ। রাহিল সে-কক্ষে পৌঁছে তার অন্ধকারতম কোণে গিয়ে দাঁড়াল।

চিত্রবান আর মাহবার দেওয়া বাঘনখ অঙ্গুলিতে ধারণ করে অনুদেবের প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে খেয়াল করল একটা আবছা আলোকরেখা যেন এগিয়ে আসছে কক্ষের সামনের অলিন্দ ধরে। আলোক-উৎস তার দৃষ্টিগোচর না হলেও রাহিল অনুমান করল কেউ যেন মশাল হাতে এগিয়ে আসছে সেই কক্ষর দিকে। নির্ঘাৎ অনুদেব! রাহিল মানসিকভাবে প্রস্তুত হল তার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য। অনুদেব কক্ষে প্রবেশ করলেই সে আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। তারপর বাঘনখ দিয়ে তার উদর, কণ্ঠদেশ ফালাফালা করে দেবে।

আলোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল কক্ষের দিকে। ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল কক্ষর বাইরের অলিন্দ। কিন্তু কক্ষর কাছাকাছি এসে হঠাৎ যেন স্থির হয়ে গেল সেই আলোকরশ্মি। তারপর যে-পথে এসেছিল সে-পথে মিলিয়ে গেল সেই আলোকরেখা। কক্ষদ্বারের বাইরের অলিন্দ আবার ডুবে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। তবে কি অনুদেব নন, অন্য কেউ সেদিকে উপস্থিত হয়েছিল অন্য কোনও কর্মোপলক্ষ্যে? সুরসুন্দরীদের কেউ? ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল রাহিল। সময় এগিয়ে চলল।

BanglaBook.org

দীর্ঘক্ষণ অন্ধকার কক্ষে আত্মগোপন করে অনুদেবের জন্য প্রতীক্ষা করলেও পুরোহিত যখন সে কক্ষে উপস্থিত হলেন না তখন রাহিলের মনে হতে লাগল যে অনুদেব কি টের পেয়েছেন যে মিত্রাবৃন্দা তার এই কক্ষে নেই? নাকি অনুদেব রাত আরও গভীর হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন? ওদিকে সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে মিত্রাও নিশ্চই অপেক্ষা করছে রাহিলের জন্য। সে রাহিলের খোঁজে বাইরে বেরিয়ে অনুদেবের হাতে ধরা পড়তে পারে। তা ছাড়া রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যে তাকে সব কাজ শেষ করে মন্দির ত্যাগ করতে হবে। বনপথে পথ দেখাবার জন্য উপস্থিত থাকবে সেই যাযাবরেরা। তবে তাকে সবচেয়ে বেশি ভাবিত করল মিত্রাবৃন্দার ব্যাপারটা। হয়তো সে কোনওভাবে ধরা পড়ে গেছে অনুদেবের হাতে। হয়তো সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে তাদের। এসব ভেবে অস্থির হয়ে উঠল রাহিল। তারপর একসময় সে সত্যি কক্ষ ত্যাগ করল।

মন্দিরের অন্তঃপুর থেকে বাইরে উপস্থিত হল রাহিল। মিত্রাবৃন্দা যে ভূগর্ভস্থ কক্ষে আছে সেখানে পৌঁছোতে হলে সোপানশ্রেণি বেয়ে নীচে নামতে হবে। কিন্তু সেখানে নিশ্চই মন্দির-রক্ষীবাহিনী প্রহরারত আছে। রাহিলকে নীচে নামতে দেখে তারা তাকে অনুসরণ করতে পারে। কাজেই বিকল্প পথে নীচে নামার সিদ্ধান্ত নিল রাহিল। ভূগর্ভে যে অংশে ওই কক্ষ, তার ঠিক ওপরের অংশের প্রাঙ্গণের অনুচ্চ প্রাচীর টপকে ভিতের খাঁজ বেয়ে অতি সহজেই সে পৌঁছে যেতে পারবে সুড়ঙ্গের মুখে। এ পরিকল্পনা মতো রাহিল মন্দির-প্রাঙ্গণ দিয়ে এগোল সে অংশের দিকে।

হঠাৎ সে দেখতে পেল তার সামনে একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ছায়ামূর্তি। রাহিল সঙ্গে সঙ্গে আত্মগোপন করল মন্দির-গাত্রের অন্ধকারে। থামের আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে সেই মূর্তি একবার চারপাশে তাকাল। রাহিল অনুমান করল সেটা একটা নারীমূর্তি। তার বুকের কাছে কী যেন একটা ধরা। চারপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে সেই নারীমূর্তি অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত এগোল রাহিল যেদিকে এগোচ্ছিল সেদিকে। কে ও? রাহিলও তার কিছুটা তফাতে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এগোল সেদিকে।

মন্দিরের দেওয়ালের গা ঘেঁষে এগোচ্ছে সেই নারীমূর্তি। তার পিছনে

BanglaBook.org

রাহিল। একসময় তারা মন্দির-প্রাঙ্গণের সেই নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছে গেল। সেখানে পৌঁছে মুহূর্তর জন্য থমকে দাঁড়াল সেই নারী। তারপর সে এগোল মন্দির-প্রাঙ্গণের অনুচ্চ প্রাকারের দিকে। রাহিল অনুমান করল ওই নারীও ওই প্রাকার টপকে সবার অলক্ষে মন্দির পরিত্যাগ করতে চলেছে। আর এরপরই এক অদ্ভুত ভয়ংকর ঘটনা ঘটল।

রাহিল তার মাথার ওপরের তাকে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনল। পরমুহূর্তেই মাথার ওপরের তাক থেকে দুটো ছায়ামূর্তি লাফিয়ে পড়ল সেই নারীমূর্তির ঘাড়ে!

মাটিতে পড়ে গেল সেই নারী। তার হাত থেকে কী যেন একটা পাথুরে মাটিতে ছিটকে পড়ে ধাতব শব্দ তুলল। সেই নারীর সঙ্গে ঝটাপটি শুরু হল সেই দুই ছায়ামূর্তির! মুহূর্তর মধ্যে ব্যাপারটা বুঝতে পারল রাহিল। কৃষ্ণবানর আক্রমণ করেছে ওই নারীকে। আর্তনাদ করে উঠল সেই মানবী। বীভৎস চিৎকার শুরু করল সেই বানররাও। সেই চিৎকারে মুহূর্তর মধ্যে খানখান হয়ে গেল রাত্রির নিস্তব্ধতা। রাহিল তলোয়ার কোষমুক্ত করল ঠিকই, কিন্তু কীভাবে সেই নারীকে ওই কামলোলুপ বানরদের থেকে মুক্ত করবে ভেবে পেল না। তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আলিঙ্গন করে আছে ওই দুই বানর। অন্ধকারে অস্ত্র চালালে ওই নারীরও মৃত্যু হতে পারে।

রাহিল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তর মধ্যেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হল। ওই চিৎকার চেঁচামেচির শব্দে সেখানে মশাল হাতে ছুটে এল রাহিলের দুই সৈনিক। মশালের আলোতে দৃশ্যমান হল সেই বীভৎস দৃশ্য। মাটিতে পড়ে আছে সেই নারী। আর তার দেহের ওপর বসে তাকে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করছে দুই হিংস্র পিশাচ। মশালের আলোতে তাদের মুখমণ্ডলে ফুটে আছে হিংস্র কামোদ্দীপনা। এমন বীভৎস দৃশ্য ইতিপূর্বে দেখেনি রাহিলের সৈন্যরা। মুহূর্তর জন্য হতবাক হয়ে দাঁড়াল তারা।

তারপর একজন তার হাতের জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে মারল সেই বীভৎস প্রাণী দুটোকে লক্ষ্য করে। উলটোদিক থেকে ছুটে আসছে আরও কজন সৈনিক। আরও একজন মশাল ছুড়ে মারল তাদের লক্ষ্য করে। সেটা

BanglaBook.org

একটা বানরের পিঠে পড়ল। এবার ঘাবড়ে গেল সেই প্রাণীদুটো। নারীদেহ ত্যাগ করে চিৎকার করতে করতে মন্দির-প্রাঙ্গণ টপকে তারা লাফ দিল নীচের দিকে। তারপর বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রাহিলরা ছুটে গেল মাটিতে পড়ে থাকা সেই নারীমূর্তির কাছে। তার মশালের আলো ফেলল তার ওপর। কিন্তু সে নারী নয়, নারীবেশী বিকর্না। কিছুটা তফাতে মাটিতে পড়ে আছে সেই স্বর্ণকলস, আর তার থেকে চারপাশে ছিটকে পড়া হীরকখণ্ডগুলো মশালের আলোতে ঝিকমিক করছে। তবে বিকর্নার দেহে তখন আর প্রাণ নেই। তার কণ্ঠনালি ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে কৃষ্ণবানররা, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার দেহ।

কান্ডারীয় মন্দিরের থেকে মুক্তি পেল না বিকর্নাও। মন্দিরের রুক্ষ পাথর শুষে নিচ্ছে হতভাগ্য বিকর্নার রক্ত। পালানো হল না তার। কান্ডারীয় মন্দিরের এই কালরাত্রিতে পরিসমাপ্তি ঘটল তার নিষ্ফল জীবনের। তার চোখ দুটো শুধু তাকিয়ে রইল অন্ধকার আকাশের দিকে।

তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রাহিল। তারপর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, 'অনুদেব কোথায়?'

একজন সৈনিক জানাল, মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে তিনি নেই। অন্যরাও জানাল তারা দেখেনি তাকে।

রাহিল বলল, 'অনুসন্ধান করো তাঁর। তাকে দেখামাত্রই বন্দি করো। আমি মিত্রাবৃন্দাকে মন্দির-প্রাঙ্গণে নিয়ে আসছি। আর কেউ গিয়ে অন্য সুরসুন্দরীদের মুক্ত করো। যথাসম্ভব দ্রুত এই মন্দির ত্যাগ করব। আর তার আগে হত্যা করতে হবে অনুদেবকে।'—এই বলে সে একজন সৈনিকের হাত থেকে মশাল নিয়ে তলোয়ার কোষবদ্ধ করে প্রাকার অতিক্রম করে নীচে নেমে দাঁড়াল সেই সুড়ঙ্গের সামনে।

সুড়ঙ্গের মুখ উন্মুক্ত। তার ভিতর জমাট বাঁধা অন্ধকার। মশালের আলোতে সে অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হচ্ছে না। রাহিল প্রবেশ করল সেই সুড়ঙ্গে। তারপর এক সময় সে পৌঁছে গেল সেই গোপন কক্ষের দ্বারপ্রান্তে। রাহিল প্রবেশ করল সেই কক্ষে। মশাল তুলে ধরে সে দেখার চেষ্টা করল মিত্রাকে। কিন্তু মিত্রা কোথায়? হঠাৎ সে শুনতে পেল মিত্রার মৃদু কণ্ঠস্বর—'সৈনিক তুমি আমাকে নিতে এসেছ?'

BanglaBook.org

যেন অনেকদূর থেকে ভেসে আসছে সেই কণ্ঠস্বর! রাহিল তাকাল সেই শব্দের উৎস লক্ষ্য করে। মন্দির-কাঠামোর বিশাল স্তম্ভ যেখানে মাটিতে প্রোথিত তার আড়ালের জমাট বাঁধা অন্ধকার থেকে ভেসে এসেছে সেই কণ্ঠস্বর।

রাহিল মশাল উঁচিয়ে এগোল সেদিকে। স্তম্ভর আড়াল থেকে অন্ধকার সরে গেল। রাহিল সেখানে দেখতে পেল মিত্রাবৃন্দাকে। কিন্তু তাকে দেখেই সে চমকে উঠল।

মাটিতে পড়ে আছে বিবস্ত্র মিত্রাবৃন্দা। রক্তস্রোত বইছে তার উন্মুক্ত যোনি বেয়ে। সারা দেহতে তার আঁচড় কামড়ের চিহ্ন। কেউ যেন ফালা ফালা করেছে তার শরীরটাকে। রাহিলকে দেখে এ অবস্থাতেও হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। সে বলে উঠল, 'আমি তোমার জন্য যে প্রতীক্ষা করে আছি।'

রাহিল ঝুঁকে পড়ল তার ওপর। তারপর এক হাতে তার মাথাটা তুলে নিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'কৃষ্ণবানরের দল এখানেও এসে পৌঁছোল!'

মিত্রা বলল, 'কৃষ্ণবানর নয়, অনুদেব।'

'অনুদেব! কীভাবে সে তোমার সন্ধান পেল?' চিৎকার করে উঠল রাহিল।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মিত্রাবৃন্দার। কাঁপছে সে। তবু সে বিষণ্ণ হেসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'এই অভিশপ্ত নারীদেহই আমাকে ধরিয়ে দিল... রজস্বলা নারীর রক্তবিন্দু অনুসরণ করে সে পৌঁছে গেল আমার কাছে...।'

—একথা বলার পর সে রাহিলের গলা আলিঙ্গন করে আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'তোমার জন্য আমি নিজেকে সমর্পন করিনি অনুদেবের কাছে। আমার অক্ষত যোনিতে শূল ঢুকিয়ে আঘাত করেছে অনুদেব। আমাকে ছেড়ে যেও না তুমি...'

রাহিল তার দেহ আলিঙ্গন করে বলে উঠল, 'তুমি শান্ত হও। আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না কোথাও...'

ঠিক এই সময় একটা প্রচণ্ড শব্দ হল স্তম্ভর গায়ে। সেখানে ধাক্কা খেয়ে কিছুটা তফাতে ছিটকে পড়ল অনুদেবের শূল! রাহিল চমকে উঠে দেখল কক্ষের অপর এক কোণ থেকে উঁকি দিচ্ছে অনুদেবের হিংস্র মুখ।

BanglaBook.org

রাহিল সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাবৃন্দার মাথাটা নামিয়ে রেখে এক লাফে সেই শূলটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার শূল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে দেখে অনুদেব কক্ষ ত্যাগ করে ছুটলেন বাইরের দিকে। তাকে অনুসরণ করল রাহিল।

অনুদেব সুড়ঙ্গ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে ছুটলেন মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগের সোপানশ্রেণি বেয়ে ওপরে ওঠার জন্য। ইতিমধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে রাহিলের সেনা আর মন্দির-রক্ষীবাহিনীর মধ্যে।

সোপানশ্রেণির মুখে রাহিলকে বাধাদান করতে এল প্রকটাক্ষ। রাহিল শূলের আঘাত হানল তার মাথা লক্ষ্য করে। তার একটা চোখ কোটর থেকে ছিটকে বাইরে মাটিতে পড়ল, তারপর সে নিজেও।

মন্দির প্রাঙ্গণে উঠেই তার এক হাতে ধরা রণশঙ্খ বাজাতে বাজাতে ছুটতে লাগলেন অনুদেব। আর তার পিছনে ধাবমান রাহিল। শঙ্খনাদ, যুযুধান দুই পক্ষের অস্ত্রধ্বনি, আর্তনাদ ও আতঙ্কিত সুরসুন্দরীদের ক্রন্দনধ্বনিতে, সম্মিলিত বীভৎস শব্দে ফালা ফালা হয়ে যেতে লাগল অন্ধকার কান্ডারীয় মন্দির-চত্বর। একসময় অনুদেবের কাছাকাছি পৌঁছে গেল রাহিল। অনুদেব মন্দিরের অন্তঃপুরে আত্মগোপন করার জন্য ছুটলেন তার প্রবেশপথের দিকে।

রাহিলের চোখে ভেসে উঠল মিত্রাবৃন্দার সেই রক্তস্নাত অবয়ব। দেহের সব শক্তি সঞ্চয় করে রাহিল সেই শূল নিক্ষেপ করল অনুদেবের দিকে। অনুদেবের আর মন্দিরে প্রবেশ করা হল না।

রাহিলের শূলের ভীষণ আঘাত অনুদেবের পিঠ ফুঁড়ে বক্ষ ভেদ করে তাকে এমনভাবে এক দণ্ডায়মান নগ্নিকা মূর্তির সাথে গেঁথে দিল যেন সেটা কোনও সঙ্গমরত যুগল মূর্তি। অনুদেবের প্রাণহীন দেহটা আটকে রইল সেই নারীমূর্তির সঙ্গে। এই কালরাত্রিতে সবার অলক্ষে দাঁড়িয়ে হয়তো কোনও যোগীপুরুষ হাসল এ দৃশ্য দেখে। ফলে গেল তার অভিশাপ।

রাহিল এরপর দেখতে পেল মাহবা আর চিত্রবানকে। মন্দিরের ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন তারা। একঝলক শূলবিদ্ধ-অনুদেবকে দেখে নিয়ে চিত্রবান বললেন, 'কাজ সাঙ্গ হয়েছে। এবার মন্দির-চত্বর ত্যাগ করতে হবে। ওই শুনুন, অরণ্যের দিক থেকে শঙ্খনাদ শুরু হয়েছে।

BanglaBook.org

অনুদেব শঙ্খ বাজিয়ে তাদেরকে বিপদ সংকেত করেছেন। আর কিছু সময়ের মধ্যেই হয়তো সৈন্যবাহিনী উপস্থিত হবে এখানে। মিত্রাবৃন্দা কোথায়?'

রাহিল সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তাকে ওপরে আনার জন্য আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন। আসুন আমার সঙ্গে।' এই বলে সে ছুটল ভূগর্ভস্থ সেই কক্ষর দিকে। তাকে অনুসরণ করলেন চিত্রবান আর মাহবা।

রাহিলরা পৌঁছে গেল সেই কক্ষে। মিত্রাবৃন্দার অবস্থা দেখে শিউরে উঠে চিত্রবান বলে উঠলেন, 'এখানেও হানা দিয়েছিল কৃষ্ণবানর?'

রাহিল জবাব দিল, 'না, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর অনুদেব। তারই শূলের আঘাত।'

রাহিল মিত্রাবৃন্দার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'চোখ খোলো মিত্রা। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। এবার অনেক দূরে চলে যাব আমরা...'

চোখ মেলল মিত্রা। রাহিলের দিকে তাকিয়ে আবছা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'তোমাকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাব আমি, আমার দেশে ফিরে যাব সোমনাথ নগরীতে। সেখানে বিশাল মন্দির, বাগিচা, কত প্রদীপ, ঘণ্টা। সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আমি। আমাদের সে ডাকছে। চলো ফিরে চলো...।'

কথাগুলো বলার পর ধীরে ধীরে মুদে এল তার চোখের পাতা। তার চোখের কোল বেয়ে দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল সৈনিকের বাহুতে। স্থির হয়ে গেল মিত্রার দেহ।

মিত্রাবৃন্দার দেহটা ধরাধরি করে যখন সুড়ঙ্গের বাইরে মন্দিরের নীচের প্রাঙ্গণে আনা হল তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে রাহিলের সৈনিকদের। তাদের অস্ত্রাঘাতে মন্দির-রক্ষীবাহিনীর আর একজনও জীবিত নেই। সুরসুন্দরীদের নিয়ে মন্দির ত্যাগ করার জন্য তাদের সঙ্গী করে নীচের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে সবাই। হাতে আর সময় নেই।

মহাসৈনাধ্যক্ষর সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হচ্ছে মন্দিরের দিকে। তাদের মশালের আলোতে লাল হয়ে গেছে বনভূমির আকাশ। তাদের রণভেরীর শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। রাহিলের জন্যই

BanglaBook.org

প্রতীক্ষা করছিল তার সেনারা। তাকে দেখতে পেয়েই মশাল হাতে এগিয়ে এসে বৃত্ত রচনা করে ঘিরে দাঁড়াল সৈনিক ও সুরসুন্দরীরা। সেই বৃত্তর মাঝখানে মিত্রাবৃন্দার দেহ কোলে নিয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে রাহিল। মাথা নত করে তাদের দিকে চেয়ে রইল সকলে। দূরের মশালের আলো, রণদামামার শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে...

একসময় এক প্রবীণ সৈনিক রাহিলের উদ্দেশ্যে বলল, 'উঠে পড়ুন সৈনাধ্যক্ষ। আর দেরি হলে আমরা কেউ প্রাণে বাঁচব না। এবার মন্দির ত্যাগ করতে হবে।'

রাহিল তাকাল তার দিকে। তারপর বলল, 'তোমরা চলে যাও। আমি মন্দিরেই থাকব।'

তার কথা শুনে কী বলবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইল তার সৈনিকরা। অরণ্যের আড়াল থেকে এবার বাইরে বেরোতে শুরু করেছে মশালের আলো। বিরাট সেনাদল ধেয়ে আসছে মন্দিরের দিকে।

রাহিলের চোখ পড়ল সেদিকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারল রাহিল। সে সেই প্রবীন সৈনিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা যাত্রা শুরু করুন। এই হতভাগ্য নারীদের আপনারা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দিন। সম্ভব হলে তাঁদের ঘরে পৌঁছে দেবেন। সৈনাধ্যক্ষ হিসাবে এটাই আমার শেষ আদেশ। এ আদেশ পালন করুন।'

রাহিলের কথা শুনে মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানাল সৈনিকরা। তারপর মশাল নিভিয়ে কান্ডারীয় মন্দির ত্যাগ করে এগোল অন্যপ্রান্তের জঙ্গল অভিমুখে। সে জায়গাতে শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন চিত্রবান আর মাহবা।

রাহিল এবার তাঁদের উদ্দেশ্যে বলল, 'এ মন্দিরে আপনারা আমাদের স্থান দিন। যেখানে আর কেউ কোনওদিন স্পর্শ করতে পারবে না মিত্রাবৃন্দার শরীর। সে যে এখনও অক্ষতযোনি। আমি তাকে ছেড়ে যাব না বলে কথা দিয়েছি। আমরা দুজন আদি-অনন্তকাল একসঙ্গে থাকব। আপনারা আশ্রয় দিন আমাদের।'

তার কথা শোনার পর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে চিত্রবান বললেন, 'হ্যাঁ, এ মন্দিরেই স্থান পাবেন আপনারা। এই কান্ডারীয় মন্দিরের সঙ্গে আমাদের মতো আপনারাও যে মিশে গেলেন। আসুন আমার সঙ্গে।'

BanglaBook.org

নীচ থেকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে উঠে এলেন দুই ভাস্কর, মন্দির-চত্বর বেয়ে তাঁরা এগোলেন মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য। মিত্রার দেহ কোলে নিয়ে তাদের অনুসরণ করছে রাহিল। প্রাঙ্গণের কোনও কোনও অংশে তখনও মশালের আলো জ্বলছে। সেই আলোতে মন্দিরগাত্রে, স্তম্ভগাত্রে আঁধো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সুরসুন্দরীদের মূর্তি। তারা বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে আছে রাহিল আর মিত্রাবৃন্দার দিকে। চত্বর অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করল রাহিলরা। তারপর সোপানশ্রেণি বেয়ে একসময় তারা পৌঁছে গেল মন্দিরশীর্ষের সেই বহিঃ অলিন্দে। যেখানে মাথার ওপরের তাকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সেই একাকী নারীমূর্তি। আর এক মিত্রাবৃন্দা।

রাহিলের একবার মনে হল ওপর থেকে দু-ফোঁটা জল এসে যেন তার গায়ে পড়ল। পাথরের গায়ে জমে থাকা জলকণা? নাকি তা সেই নারীমূর্তির অশ্রুবিন্দু? মিত্রাবৃন্দার দেহটাকে ধরাধরি করে তার উলটোদিকের তাকে তোলা হল। এর কিছুক্ষণের মধ্যে তারা পৌঁছে গেল সেই গোপন কক্ষে।

একটা মশাল জ্বালালেন মাহবা। চিত্রবান রাহিলকে বললেন, 'এ-কক্ষে যুগযুগ ধরে থাকতে পারবেন আপনারা। বাইরের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিলে সৈনিকরা কোনওদিন খুঁজে পাবে না এ-কক্ষ। আর আপনাদের কাছেই আমরা সমর্পণ করলাম আমাদের সম্পদ, ওই ফলককে। যাতে ভবিষ্যতের মানুষের জন্য লেখা রইল সেইসব মানুষের নাম, যারা রচনা করল এই আশ্চর্য সুন্দর মন্দির, অথচ কান্ডারীয় মন্দিরের পাথর শুষে নিল যাদের জীবন।'

রাহিল স্মিত হাসল তাদের কথা শুনে। তারপর ধীরে ধীরে অতি যত্নে নামিয়ে রাখল মিত্রাবৃন্দাকে। মিত্রার ঠোঁটের কোণে তখন যেন ফুটে উঠেছে আবছা হাসি। এক অদ্ভুত স্বর্গীয় প্রশান্তি যেন ফুটে উঠেছে তার মুখমণ্ডলে। রাহিলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ঘুমোচ্ছে সুরসুন্দরী মিত্রাবৃন্দা। রাহিল চেয়ে রইল প্রেয়সীর মুখের দিকে।

ফিরে যাওয়ার আগে একটা কাজ বাকি ছিল ভাস্করদের। চিত্রবান সেই ফলকে একটা নাম খোদাই করলেন—'রাহিল'।

কাজ শেষ করে সেই কক্ষ ত্যাগ করলেন তাঁরা। সুড়ঙ্গর মুখ

BanglaBook.org

চিরদিনের জন্য বন্ধ করে নীচে নেমে অন্ধকার মন্দিরপ্রাঙ্গণে হারিয়ে গেলেন চিত্রবান আর মাহবা। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই কান্ডারীয় মন্দিরের দখল নিল চান্দেলরাজ বিদ্যাধরের সেনাদল। মশালের আলোতে মন্দির-চত্বরে কোনও জীবিত প্রাণীকে খুঁজে পেল না তারা। মন্দিরশীর্ষের অন্ধকার কক্ষে তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে সৈনিক রাহিল আর সুরসুন্দরী মিত্রাবৃন্দা।

লেখকের নিবেদন ঃ কান্ডারীয় মন্দির খর্জ্জুরবাহক বা খাজুরাহর অন্যতম প্রধান স্থাপত্যকীর্তি, যা নির্মিত হয়েছিল চান্দেলরাজ গণ্ডবর্মনের (১০০২-১০১৭ খ্রিঃ) রাজত্বের শেষভাগ থেকে মহারাজ বিদ্যাধরের (১০১৭-১০২৯ খ্রিঃ) রাজত্বকালে। এ মন্দিরে কঠিন পাথরের বুকে শিল্পী ভাস্করের দল ফুটিয়ে তুলেছিলেন কোমল নারীদেহকে। নারীদেহর প্রতি পুরুষের সহজাত আকর্ষণ খাজুরাহর কান্ডারীয় মন্দিরের প্রস্তরগাত্রে জীবন্ত করে তুলেছিলেন অজানা অজ্ঞাত শিল্পীর দল তাঁদের মিথুনমূর্তি রচনার মাধ্যমে।

কান্ডারীয় মন্দির নির্মাণের মধ্যযুগীয় সময়কাল কুয়াশাচ্ছন্ন। সেসময়ের ঘটনাপ্রবাহর সুস্পষ্ট বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে যতটুকু জানা যায় তা হল নারীমূর্তি রচনার জন্য, মডেল বানাবার জন্য নারী সংগ্রহ করে আনা হত দাসের হাট থেকে।

কনৌজে বড় দাসবাজার ছিল। সেখানে নেপাল, কাশ্মীর, উৎকল রাজ্য, হিমালয়ের পাদদেশের চম্বা, দুর্গর (জম্মু), ত্রিগর্ভ (জলন্ধর), পূর্ব উপকূলের চালুক্য ও গঙ্গদেশ থেকে উপস্থিত হত ক্রীতদাসী নারীরা। পশ্চিম উপকূল থেকেও আসত তারা। মূর্তি নির্মাণের জন্য তাদের ক্রয় করত মন্দির কর্তৃপক্ষ। আমার এই উপন্যাস কোনও প্রামাণ্য ইতিহাস নয়। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত আখ্যান মাত্র। যার কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা কল্পনা মাত্র।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

একা কুম্ভ

১

চাঁদের আলোতে সর্পিল পাথুরে-পথ ভেঙে ওপরে উঠে চলেছে এক দীর্ঘদেহী অশ্বারোহী। সারা দেহ তার কালো মখমলের পোশাকে আচ্ছাদিত। কোমরবন্ধে ঝুলছে তরবারি, মাথায় উষ্ণীষ। তাঁর সাদা ঘোড়ার গা বেয়ে জ্যোৎস্নার আলো যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। প্রভুকে পিঠে নিয়ে ধীরে ধীরে সে ওপরে উঠছে। তার চলার ভঙ্গি জানান দিচ্ছে দীর্ঘ পথশ্রমে সে ক্লান্ত।

একটার পর একটা বাঁক অতিক্রম করে অবশেষে এক সময় সে উপস্থিত হল বিশাল দুর্গ-তোরণের সামনে। স্থানটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুর্গ-প্রাকার চাঁদকে আড়াল করে রেখেছে সেখানে।

অশ্বারোহী এসে ঘা দিলেন তোরণের বন্ধ কপাটে। ভিতর থেকে প্রহরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কোথা থেকে আসা হচ্ছে! পরিচয় কী?'

প্রহরীর কথায় উত্তর না দিয়ে আবার কপাটে ঘা দিলেন অশ্বারোহী। এবার বেশ জোরে, সেই শব্দে দুর্গ-তোরণের পাশের ঝাঁকড়া গাছটার মাথা থেকে ভয় পেয়ে ডানা ঝটপটিয়ে চাঁদের দিকে উড়ে গেল একটা রাতচরা পাখি। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

একটা অস্পষ্ট শব্দ করে তোরণের নীচের দিকের অংশ একটু ফাঁক হল এর পর, আর সেই ফোকর গলে বাইরে বেরিয়ে এল মশাল হাতে এক দ্বাররক্ষী। ভলো করে সে আগন্তুককে দেখবার জন্য মশালটা তাঁর মুখের কাছে তুলে ধরল, আর তার পরই চমকে উঠে কয়েক পা পিছু হঠে অশ্বারোহীর প্রতি সম্ভ্রমে মাথা নোয়াল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরঘর শব্দ তুলে খুলে গেল দুর্গ-তোরণ। ভিতরে

BanglaBook.org

প্রবেশ করলেন অশ্বারোহী। এরপর একটু থামলেন তিনি। পথের দু-পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পদাতিক সেনার দল। অশ্বারোহীকে দেখে তারা মাথা নোয়াল। অশ্বারোহীও মাথা ঝুঁকিয়ে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন, তারপর সামনে পথ ধরে চলতে শুরু করলেন। আর তার পিছন পিছন চলতে শুরু করল পদাতিক সেনার দল। পাথুরে-পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলতে লাগল সেই মিছিল।

পথের দু-পাশে দুর্গ-প্রাকারের অলিন্দে পদচারণা করছে প্রহরীর দল। চাঁদের আলোতে তাদের বর্শার ফলাগুলো রুপোর মতো ঝকঝক করছে। মিছিল চোখে পড়তেই তারাও সেই অশ্বারোহীর উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াচ্ছে ওপর থেকে।

এক সময় অশ্বারোহী এসে উপস্থিত হলেন এক প্রশস্ত চত্বরে। তার ডান দিকে ঘুমিয়ে আছে বিশাল এক প্রাসাদ। টান পড়ল লাগামে, ঘাড় ঘুরিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য একবার প্রাসাদের দিকে তাকালেন তিনি, মনে মনে কী যেন একটা চিন্তা করলেন, তারপর আবার এগিয়ে চলতে লাগলেন সোজা রাস্তা ধরে। যেদিকে চাঁদের আলোতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট এক মিনার।

কিছুক্ষণ পর অশ্বারোহী যেখানে গিয়ে থামলেন সেই জায়গাটা মশালের আলোয় আলোকিত। সারা রাত ধরে সেখানে কাজ করে চলেছে মজুরের দল। চারপাশে শুধু ছেনি-হাতুড়ির ঠক-ঠক শব্দ। পাথরের খণ্ড কুঁদে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছে মজুর-শিল্পীরা।

আলোকিত এই চত্বরের মাঝখান থেকে আকাশের বুকে উঁচুতে আরো উঁচুতে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এক বিশাল স্তম্ভ। যে-স্তম্ভ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে স্মরণ করাবে এক মহারানার বীর গাথা, স্মরণ করবে তাঁর শৌর্য-বীর্যের কাহিনি। অশ্বারোহী সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই থেমে গেল সব শব্দ, যে যেখানে কাজ করছিল সকলে হাতের যন্ত্র মাটিতে নামিয়ে রেখে, উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝোঁকাল অশ্বারোহীর প্রতি, তারপর আবার তাঁর ইঙ্গিতে কাজ শুরু করল।

ঘোড়া থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়ালেন দীর্ঘদেহী, তারপর খুলে ফেললেন মাথার ঝালর দেওয়া উষ্ণীষ। মশালের আলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর

BanglaBook.org

মুখাবয়ব। তাঁর যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে বহুদিন। গালের দুপাশ বেয়ে নেমে আসা জুলপি আর পুরুষ্টু গোঁফে শুভ্রবর্ণের ছোপ লেগেছে। বাঁ-দিকের কপালের উপর একটা লম্বা কাটা দাগ সাক্ষ্য বহন করেছে অতীতের কোনও মহাসংগ্রামের। তাঁর টিকালো নাক, উজ্জ্বল চোখ, কঠিন চোয়াল পরিচয় দিচ্ছে এক দৃঢ় ব্যক্তিত্বের। এই রাজপুরুষ হলেন চিতোর অধিপতি মহারানা কুম্ভ, তপ্ত বালির সমুদ্র আর রুক্ষ পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর তিনি। এই রাজ্যের নাম—মেবার।

মহারানা কুম্ভ তাকিয়ে রইলেন সেই নির্মীয়মাণ স্তম্ভের দিকে। স্তম্ভ নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। হাজার হাজার মজুরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে চিতোরের আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এই স্তম্ভ। স্তম্ভগাত্রে ফলকের খোদাইয়ের কাজ চলছে এখন। তাঁর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের মহারানা নিয়োজিত করেছেন এ কাজে।

দিন-রাত কাজের বিরাম নেই, পাথর কুঁদে ভাস্করের দল স্তম্ভগাত্রে ফুটিয়ে তুলছে বিভিন্ন দেবদেবীর আশ্চর্য সুন্দর সব ছবি। স্তম্ভের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল এক যুগ আগে। আর কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হবে সব কাজ। মহারানা ইতিমধ্যে কুলপুরোহিতকে শুভদিন নির্বাচন করতে বলেছেন স্তম্ভ পূজার জন্য। তিনি মনে মনে ঠিক রেখেছেন—এ স্তম্ভ তিনি ওইদিন উৎসর্গ করবেন ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে।

স্তম্ভ থেকে কিছু দূরে ভগবান বিষ্ণুর মন্দির আছে। লোকে তাকে বলে কুম্ভশ্যাম মন্দির। যুবা বয়সে মহারানাই সে মন্দির নির্মাণ করান। গুর্জর ও মালবের দুই সুলতান যখন জোট বেঁধে চিতোর আক্রমণ করেন তখন কুম্ভশ্যাম মন্দিরের বিগ্রহর সামনে দাঁড়িয়ে মহারানা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, যদি তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন তাহলে তিনি স্তম্ভ নির্মাণ করে তা উৎসর্গ করবেন ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে। সেই যুদ্ধে অমিত পরাক্রমশালী দুই শত্রুর বিরুদ্ধে মহারানা শুধু জয়ীই হননি, মালবরাজ মোহম্মদ খিলজীকে যুদ্ধবন্দি রূপে চিতোরে এনেছিলেন ও তাঁকে নিক্ষেপ করেছিলেন চিতোর কারাগারে। ছয় মাস বন্দি থাকার পর মোহম্মদ খিলজী ক্ষমা প্রার্থনা করলে মহানুভব মহারানা মুক্তি দেন তাঁকে। দেবতার কাছে দেয়-প্রতিশ্রুতি পালন করতে ও যুদ্ধজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে মহারানা

BanglaBook.org

শুরু করেন স্তম্ভ নির্মাণের কাজ।

কিন্তু নির্মাণকার্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যত এগিয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বাসনা গ্রাস করেছে মহারানাকে। সে বাসনা হল অমরত্বের। মহারানা জানেন, একদিন মহাকালের অমোঘ নিয়মে তাঁর পদচিহ্ন মুছে যাবে চিতোরের মাটি থেকে। ঠিক যেমন তাঁর পিতৃ-পিতামহদেরও চলে যেতে হয়েছে এ চিতোর গড় ছেড়ে। তাই মহারানা এ স্তম্ভের এমন রূপ দিতে চান যাতে তিনি যখন থাকবেন না সেই হাজার বছর পরেও মানুষ এ স্তম্ভের সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে স্মরণ করবে মহারানাকে, স্মরণ করবে তাঁর কীর্তিকে। এই স্তম্ভই তাঁকে দেবে অমরত্ব, তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

প্রাসাদ ছেড়ে আজকাল প্রতি রাতেই প্রায় মহারানা এসে উপস্থিত হন এখানে। কিছুদিন ধরে রাতে ঘুম আসে না মহারানার। একলা কক্ষে পালঙ্কে শুলেই নানা ধরনের চিন্তা তাঁকে ঘিরে ধরে। তাই তিনি চলে আসেন এখানে। প্রহরের পর প্রহর জেগে দেখতে থাকেন, কীভাবে ভাস্করের দল প্রাণ সৃষ্টি করছে পাথরের গায়ে। তারপর এক সময় যখন আকাশের বুকে শুকতারা ফুটে ওঠে, গোমুখ কুণ্ডর দিক থেকে ভেসে আসে ঠান্ডা বাতাস, তখন প্রাসাদে ঘুমোবার জন্য ফিরে যান মহারানা। মহারানা দিন-কয়েকের জন্য দুর্গের বাইরে গেছিলেন কার্যোপলক্ষ্যে। সেখান থেকে দুর্গে প্রবেশ করেই তিনি আজ সোজা এখানে চলে এসেছেন।

ঘোড়া থেকে নেমে স্তম্ভর দিকে তাকিয়ে রইলেন মহারানা। কিছুক্ষণ আগেই শেয়ালের ডাক দ্বিতীয় প্রহরের কথা জানান দিয়েছে। সারা চিতোর এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জেগে আছে শুধু মজুর-ভাস্করদের দল, আর জেগে আছেন মহারানা।

কেল্লার মাথার ওপর আজ গোল থালার মতো চাঁদ উঠেছে। মহারানার স্বপ্নের স্তম্ভ যেন হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাচ্ছে তাকে। অনতিদূরের কুণ্ড থেকে ভেসে আসছে ঠান্ডা বাতাস। মহারানার পথশ্রমের ক্লান্তি আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যেতে লাগল।

স্তম্ভের দিকে চেয়ে প্রতিদিনের মতো মহারানা ভাবতে লাগলেন—'জীবন অনিত্য, একদিন আমাকেও এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। চিতোরের

BanglaBook.org

সিংহাসনে বসবেন অন্য কেউ, পৃথিবী চলতে থাকবে তাঁর নিজের নিয়মে। সেদিনও আজকের মতো চিতোরগড়ের মাথার ওপর গোল চাঁদ উঠবে, গোমুখ কুণ্ড থেকে ভেসে আসবে ঠান্ডা বাতাস, রাত শেষ হলে পুবের আকাশ রাঙা করে সূর্যদেব উদয় হবেন, ময়ূরের কর্কশ ডাকে আর চিতোরেশ্বরী মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে ঘুম ভাঙবে চিতোরবাসীর।—এসবই আগের মতো থাকবে, থাকব না শুধু আমি। সেদিন কি চিতোরের মানুষ মনে রাখবে আমাকে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে মুছে যায় সব কিছুই।

যাঁরা একদিন এই রুক্ষ মরু অঞ্চলে আস্তে আস্তে গড়ে তুলেছিলেন নগর-জনপদ-কেল্লা, রচনা করেছিলেন সভ্যতা, আর সেই সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে ছিলেন শত্রুর সঙ্গে, তাঁদের ক'জনকেই বা মনে রেখেছে মানুষ? ক'জনই বা মনে রেখেছে মহারাজ খুমন, মহারাজ সমর সিংহ বা মহারানা হাম্বীরের নাম? অথচ এরাই একদিন তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন আজকের এই চিতোরগড়কে। তাঁরা আজ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পুঁথির পাতায় লেখা নাম মাত্র। রাজপরিবারের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে নিয়ম রক্ষার্থে উচ্চারিত হয় তাঁদের নাম। এঁদের মতো আমিও একদিন হারিয়ে যাব পৃথিবী থেকে। কিন্তু স্তম্ভের নীচে এসে দাঁড়ালে কি একবারও কারো মনে পড়বে না আমার কথা? এই স্তম্ভ দেখে ভিনদেশি কোনও পথিকের প্রশ্নের উত্তরে কি একবারের জন্যও উচ্চারিত হবে না আমার নাম? নিশ্চয়ই হবে।

'যতদিন এই স্তম্ভ চিতোরগড়ের আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে ততদিন এই স্তম্ভই আমাকে অমর করে রাখবে, বেঁচে থাকবে মহারানা কুম্ভ, আজকের মতো সেদিনও এই স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আমার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে ভবিষ্যতের মানুষ।'

স্তম্ভের দিকে চেয়ে এসব কথাই চিন্তা করতে লাগলেন মহারানা। প্রহর এগোতে লাগল, কিন্তু তিনি একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্রমশই ছেনি-হাতুড়ির শব্দ কমে আসতে লাগল, তন্দ্রা নেমে আসতে লাগল পরিশ্রান্ত মজুরদের চোখে, নিভু নিভু হয়ে এল মশালের আলো। এক সময় দূর থেকে ভেসে আসা শিয়ালের ডাকে মহারানা বুঝতে পারলেন তিন প্রহর অতিক্রান্ত হল। আর কিছু সময় পরেই পুবের আকাশ লাল

BanglaBook.org

হতে শুরু করবে।

মহারানা আবার চেপে বসলেন তাঁর ঘোড়ার ওপর। প্রাসাদে ফিরে মহারানা যখন নিজের কক্ষে শয়ন করতে গেলেন তখন আকাশের শুকতারা ফুটে উঠেছে। ঠিক সেইসময় শুভ্রবসনা এক রমণী প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় প্রবেশ করলেন তাঁর পূজার ফুল সংগ্রহের জন্য।

২

মহারানার যখন নিদ্রাভঙ্গ হল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। শ্বেত-পাথরের সূক্ষ্ম কাজ-করা জাফরির ফাঁক দিয়ে প্রবেশ-করা সূর্যকিরণে আলোকিত হয়ে উঠেছে মহারানার শয়ন কক্ষ। সোনার কাজ করা আসবাবের ওপর সেই আলো পড়ে ঝলমল করছে সারা কক্ষ।

ঘুম ভাঙার পর ধীরে ধীরে হাতির দাঁতের পালঙ্ক থেকে নীচে নামলেন মহারানা। এক ভৃত্য দাঁড়িয়ে ছিল দরজার সামনে। মহারানা পালঙ্ক থেকে নীচে নামতেই সে এসে পরিয়ে দিল ব্যাঘ্র চর্মের পাদুকা। মহারানা এসে দাঁড়ালেন অলিন্দে। সঙ্গে সঙ্গে বাজতে শুরু হল জয়ঢাক। এই ঢাক প্রত্যহ চিতোরবাসীকে জানান দেয় মহারানার নিদ্রাভঙ্গের কথা। মহারানা তাঁর দ্বিতল কক্ষ সংলগ্ন অলিন্দ থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন নীচে প্রতিদিনের মতো দাঁড়িয়ে আছে কিছু মানুষ। মহারানা নীচের দিকে তাকাতেই তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর নামে জয়ধ্বনি করে উঠল তারা।

মহারানার পাশে তাঁর এক ভৃত্য এসে দাঁড়াল সোনার রেকাবিতে স্বর্ণ-মুদ্রা নিয়ে। সেখান থেকে একমুঠো মুদ্রা তুলে ছুঁড়ে দিলেন নীচে দাঁড়িয়ে থাকা গরিব মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে। তারা আরও একবার জয়ধ্বনি করে উঠল মহারানার নামে। এরপর মহারানা কক্ষে ফিরে এসে তৈরি হতে লাগলেন স্নানে যাবার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহরক্ষী-পরিবৃত হয়ে প্রাসাদ থেকে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথে মহারানা যাত্রা করলেন সূর্যকুণ্ডের উদ্দেশ্যে। তাঁর পিছন পিছন চলতে লাগল তাঁর ভৃত্য ও সুবেশী রাজপুত রমণীর দল। তাদের হাতে সোনার থালায় মহারানার পোশাক, অলঙ্কার,

BanglaBook.org

সুগন্ধি ইত্যাদি।

বেশ কিছুক্ষণ সূর্যকুণ্ডের শীতল জলে অবগাহন করলেন মহারানা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে। ভৃত্যের দল তাঁকে পরিয়ে দিল নতুন পট্টবস্ত্র। মহারানা সেখানে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ সূর্যমন্ত্র জপ করলেন। এর পর তাঁকে অলঙ্কার পরিয়ে দিতে লাগল দাসীরা, গায়ে মাখিয়ে দিতে লাগল সুগন্ধি। শুধু কর্ণকুণ্ডল দুটো নিজের হাতেই ধারণ করলেন মহারানা। কারণ তাঁর কান কেউ স্পর্শ করতে পারে না। সব শেষে রাজপুরোহিত সোনার থালার ওপর থেকে রেশমের আচ্ছাদন সরিয়ে রাজমুকুট তুলে নিয়ে মহারানার মাথায় পরিয়ে দিলেন। হাতির দাঁতের শিবিকা প্রস্তুত ছিল। মহারানা চেপে বসলেন তাতে।

মহারানা রাজপথের দু-পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে চললেন, তাঁর শিবিকা ঘিরে চলেছে তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্যের দল। তার মধ্যে আছে ছত্রবাহক, পাদুকাবাহক ইত্যাদিরা। আর চলেছে পঞ্চাশ জন রাজপুত দেহরক্ষী। মহারানা কেল্লার যেখানেই যান না কেন এই রক্ষীর দল ঘিরে রাখে তাঁকে। এমনিতে তারা অশ্বারোহী বাহিনীর সৈনিক। কিন্তু মহারানা যখন শিবিকা চেপে যান তখন এই রক্ষীর দল পদাতিক সৈনিক হিসাবে মহারানার সঙ্গে সঙ্গে যায়, তখন আর তারা ঘোড়া ব্যবহার করে না। এর একটা বিশেষ কারণ আছে, যেহেতু শিবিকার মধ্যে যে উচ্চতায় মহারানা বসে থাকেন তা অপেক্ষা ঘোড়ার পিঠের উচ্চতা বেশি, তাই সেখানে বসা মানে মহারানা অপেক্ষা উচ্চাসনে আসীন হওয়া। এ ব্যাপারটা তাই পরিহার করে তারা।

দুদিন কেল্লায় ছিলেন না মহারানা। চিতোর থেকে কিছু দূরে এক দুর্গম পর্বতের মাথায় এক ভয়ংকর দুর্গ নির্মাণ করিয়েছেন তিনি। সে-দুর্গের নামকরণ করা হয়েছে 'কুম্ভমেরু'। অদ্যাবধি মহারানা কুম্ভ-নির্মিত সতেরোটি দুর্গের মধ্যে কুম্ভমেরুই সর্বশ্রেষ্ঠ।

হঠাৎই কার্যোপলক্ষ্যে মহারানা একাই চিতোর ছেড়ে রওনা হয়েছিলেন কুম্ভমেরুর উদ্দেশ্যে। গতকাল রাতেই আবার কাজ শেষ করে চিতোর ফিরেছেন। কিন্তু ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারানার প্রত্যাগমনের সংবাদ

BanglaBook.org

ছড়িয়ে পড়েছে নগরীর সর্বত্র। তাই তাঁর যাত্রাপথের দুপাশে তাঁর দর্শন-লাভের জন্য দাঁড়িয়ে আছে নগরবাসীরা। মহারানাকে দেখে তারা হাত-জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানাতে লাগল।

শিবিকা এগিয়ে চলতে লাগল। কোথাও তাঁর শিবিকার উদ্দেশ্যে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, কোথাও আবার তার শিবিকা দেখে শঙ্খধ্বনি করছে রাজপুত রমণীরা। এসব দেখতে দেখতে চলতে লাগলেন মহারানা কুম্ভ।

কুম্ভশ্যাম মন্দিরের সামনে পৌঁছোতেই মহারানা নির্দেশ দিলেন—'থাম', অমনি থেমে গেল শিবিকা। মহারানা শিবিকা থেকে নামতে পাদুকাবাহক নতজানু হল তাকে পাদুকা পরিয়ে দেবার জন্য। মহারানা তাকে ইশারায় সরে যেতে বললেন। তারপর রাজমুকুট খুলে ফেললেন মাথা থেকে। একজন ভৃত্যের হাতের সোনার থালায় সেই মুকুট রেখে মহারানা খালি পায়ে একাই প্রবেশ করলেন মন্দির-চত্বরে। শুধু তাঁর মাথার উপর বিরাট সোনার ছাতা ধরে চলল একজন ছত্রবাহক।

এ মন্দিরে বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন মহারানা। দরবারে যাবার আগে একবার সেই বিগ্রহ দর্শন করতে চান তিনি। মন্দির-চত্বর খুব মনোরম। চারপাশ নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে ময়ূরের ডাক। মূল মন্দিরে প্রবেশ করার আগে মহারানা থেমে যেতে বললেন ছত্রবাহককে। তারপর শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে একলা প্রবেশ করলেন মন্দিরের গর্ভগৃহে।

গর্ভগৃহের ভিতরটা আধো অন্ধকার। কষ্টি পাথরের বিষ্ণুমূর্তির সামনে জ্বলছে একটা ঘি-এর প্রদীপ। তারই হালকা একটা আভা ছড়িয়ে আছে চারপাশে, আর আছে ধূপের সুগন্ধ। মহারানা বিগ্রহের সামনে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নতজানু হয়ে রইলেন, তারপর এক সময় ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার উপর ঝুলছে বিরাট একটা সোনার ঘণ্টা। সেটা বাজাবার জন্য ডান হাতটা মাথার ওপরে তুললেন মহারানা, আর ঠিক তখনই তাঁর নজর পড়ল গর্ভগৃহর এক কোনায়।

মহারানা তাঁর হাতটা নীচের দিকে নামিয়ে নিলেন। কক্ষের সেই কোণে ধ্যানে বসে আছেন রাজমহিষী মীরা। নিরাভরণ দেহ, শুভ্র বস্ত্র, হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করা। তাঁর সামনের কুলুঙ্গিতে রাখা গিরিধারীর

BanglaBook.org

কষ্টিপাথরের ছোট্ট এক মূর্তি। মহারানা বুঝতে পারলেন তাঁর উপস্থিতি টের পাননি মীরা। লঘু পদে তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। প্রদীপের একটা মৃদু আভা এসে পড়েছে তাঁর দেহের ঊর্ধ্বাংশে। অনেক দিন পর কুম্ভ ভালো করে তাকালেন তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে। ঠিক কত দিন পর এত কাছ থেকে তিনি তাঁকে দেখছেন তা তিনি নিজেও মনে করতে পারলেন না। এক অদ্ভুত প্রশান্তি যেন ছড়িয়ে আছে মীরার মুখমণ্ডলে। এখনও তাঁর যৌবন পুরোপুরি অতিক্রান্ত হয়নি। কপালের সামনে দু-একটা কেশগুচ্ছ রুপালি বর্ণ ধারণ করেছে মাত্র। মৃদু নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর উন্নত বক্ষ আস্তে আস্তে ওঠা-নামা করছে। স্খলিত বসনার বুকের ঠিক মাঝখানে টলটল করছে এক বিন্দু ঘাম।

কুম্ভ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর মহিষীর মুখের দিকে। মনে মনে তিনি ভাবতে লাগলেন—'যেখানে অন্য মহিষীরা রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে ভোগ বিলাসে নিমজ্জিত, সেখানে মীরার কেন এত কৃচ্ছসাধন, কেন এত তপস্যা! কেন মীরা জাগতিক সুখ-দুঃখ থেকে নিজেকে এতটা দূরে সরিয়ে নিল! সে কি আমার প্রতি অভিমানে! কিন্তু আমি তো কোনওদিন ওর প্রতি কোনও অমর্যাদা করিনি। এখনও দরবার কক্ষে রাজসিংহাসনের পাশে ফাঁকা পড়ে আছে প্রধানা মহিষীর সিংহাসন।

আজও সেই শূন্য সিংহাসনের মাথার ওপর চামর দুলায় দাসীরা। অন্য মহিষীরা বার বার অনুযোগ করছে এ ব্যাপারে। কিন্তু সে সিংহাসনে আজও অন্য কাউকে বসাতে পারিনি আমি। একটা কাজ অবশ্য করে ছিলাম আমি। তার গুরু রুইদাস চামরকে নিষেধ করেছিলাম অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে। সে তো বংশপরম্পরায় চলে আসা নিয়মরক্ষার জন্য। তাই কি মীরা এতটা ক্ষুব্ধ হল আমার প্রতি? না কি অন্য কোনও কারণ আছে তার নিস্পৃহতার পিছনে? আমার প্রতি কেন এত শীতল মীরার দেহ-মন? আমি কি ওকে ঠিক বুঝতে পারলাম না, না কি মীরা বুঝতে পারল না মহারানার হৃদয়ের কথা! যে মীরা দশ-দশটা বছর বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে আমার বাহুবন্ধনে, সে কেন আজ এসে দাঁড়ায় না আমার পালঙ্কের পাশে? তা হলে কি এই দেহ-মন সব মিথ্যে! সব সত্যি কি ওই কষ্টিপাথরের বোবা গিরিধারীর মূর্তি?'

BanglaBook.org

মীরার মুখের দিকে চেয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছিলেন কুম্ভ। হঠাৎ মীরা চোখ মেলে তাকালেন মহারানার দিকে। চিন্তাজাল তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হল মহারানার। কয়েক মুহূর্ত মাত্র দৃষ্টি বিনিময় হল উভয়ের মধ্যে। মীরা উঠে দাঁড়াতে গেলেন স্বামীর চরণ স্পর্শ করার জন্য। কিন্তু মহারানা তার আগেই কয়েক পা পিছিয়ে এসে মাথার উপরের ঘণ্টাটা জোরে জোরে দুবার বাজালেন, তারপর মীরার দিকে দৃষ্টিপাত না করেই দ্রুত পদে ত্যাগ করলেন মন্দিরের গর্ভগৃহ।

মীরা যখন ধীর পায়ে গর্ভগৃহের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন ততক্ষণে মহারানা চেপে বসেছেন তাঁর শিবিকাতে। বাহকের দল মহারানাকে নিয়ে রওনা হয়েছে দরবারকক্ষের অভিমুখে, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের পদশব্দ।

বাইরের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মীরা। শূন্য মন্দির-চত্বরে বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। মীরা আবার ফিরে গিয়ে দাঁড়ালেন গর্ভগৃহর সেই স্থানে, যেখানে একটু আগে দাঁড়িয়েছিলেন চিতোররাজ কুম্ভ। স্বামীর চরণচিহ্ন মাথায় ঠেকিয়ে প্রথমে প্রণাম জানালেন রাজমহিষী, তারপর আবার গিয়ে বসলেন সেই গিরিধারী মূর্তির সামনে। আস্তে আস্তে তাঁর চোখের পাতা বুজে এল।

কিছুক্ষণ পর দরবারকক্ষের ছাদ থেকে সারা চিতোরের আকাশে ছড়িয়ে পড়ল বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। দরবার শুরু হতে চলেছে। সে শব্দ আর কানে গেল না মীরার। তিনি তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়েছেন। তাঁর কানে তখন একটাই সুর, তা হল গিরিধারীর মনমোহিনী বাঁশির সুর, যা বিশ্ব চরাচর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে মীরার মনকে। তাঁর চোখের সামনে থেকে মুছে দিয়েছে পার্থিব সবকিছু।

BanglaBook.org

৩

অনেক বছর পর আবার আজ এই মরুরাজ্যে বৃষ্টি নামতে চলেছে। ক'দিন ধরেই আকাশে আস্তে আস্তে জমতে শুরু করেছে জল-ভরা কালো মেঘ।

তাই দেখে পেখম মেলেছে ময়ূরের দল। পায়ে তাদের সোনার ঘুঙুর বাঁধা। সেই শব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে প্রাসাদ। সবার মনে খুশির বাতাস। অমন যে দুর্ধর্ষ রাঠোর সেনাবাহিনী, যাদের যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না, তাদেরও আজ গ্রামে ফিরে যাবার জন্য মন কেমন করছে। তাদের সর্দার রাঠোররাজের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন সৈন্যদের কয়েক দিনের ছুটি মঞ্জুরের আর্জি জানাতে। তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেছেন রাঠোর অধিপতি। যাদের এতদিন শুধু দেখা যেত নগরের কামারশালার আশেপাশে নতুন তরবারির খোঁজে অথবা বর্ম তৈরির জন্য, তারাই আজ নগদ মোহরের বিনিময়ে খরিদ করছে অলঙ্কার, রেশম বস্ত্র থেকে শুরু করে কাঠের খেলনা পর্যন্ত। তারপর তা বেঁধে-ছেদে চেপে বসছে ঘোড়ার ওপর। ঘোড়া ছুটিয়ে দিচ্ছে মরুরাজ্যে অবস্থিত নিজেদের ছোট ছোট গ্রামের দিকে। আকাশে মেঘ দেখে সেখানে তাদের প্রতীক্ষা করছে আপনজনেরা।

দ্বিপ্রহরে রাঠোররাজ চন্দ্রকান্ত মান্ডোর প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে জল ভরা মেঘের খেলা দেখতে দেখতে ভাবছিলেন একজনার কথা। তিনি ঝুলকুমারী, রাঠোররাজের বাগদত্তা। রাঠোররাজ ভাবছিলেন, ঝালোয়ার প্রাসাদে কোনও নিভৃত কক্ষে বসে হয়তো তাঁরই কথা চিন্তা করছেন ঝুলকুমারী। ওই যে অনেক দূরে কালো রেখার মত পাহাড় দেখা যাচ্ছে তার ওপাশেই ঝালোয়ার রাজ্য। সেখানেও নিশ্চয়ই বৃষ্টি নামবে। মেঘের দল তো ভিড় করে আছে ওখানেও। মেঘের দিকে চেয়ে রাজকন্যা ঝুলকুমারীর কথা চিন্তা করতে করতে রাঠোররাজের মনে পড়ে গেল 'মেঘদূতম'-এর সেই শ্লোক—

'তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলবিপ্রযুক্ত স কামী
নীত্বা মাসান কনকবলয়ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠঃ
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষনীয়ং দর্দশঃ

BanglaBook.org

রাঠোররাজ মনে মনে আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন—

'তস্য স্থিতা কথমপি পুরঃ—
কৌতুকধানহেতো
রন্তর্বাষ্পশ্চিরসনুচরো রাজরাজস্য দধৌ।...

মরুভূমির প্রখর সূর্য ফিকে হতে হতে এক সময় মুছে গেল আকাশের বুক থেকে। অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক। তারপর অন্ধকার আকাশ জুড়ে শুরু হল বিদ্যুতের নাচন, আর তার সঙ্গে মেঘের গুরু গুরু গর্জন। এ দৃশ্য মরুদেশে বড় দুর্লভ। তন্ময় হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন রাঠোররাজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল রুক্ষ মরুদেশের বুকে। প্রাসাদের ছাদে একলা দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলেন রাঠোররাজ। তিনি শুনতে পেলেন প্রাসাদের নীচ থেকে ভেসে আসছে কোলাহল। প্রাসাদের সমস্ত নরনারী আনন্দবিহ্বল হয়ে প্রাসাদ ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে খোলা আকাশের নীচে। বৃষ্টির জলে সিক্ত করে নিচ্ছে নিজেদের দেহ-মনকে। এক সময় খুব জোরে বৃষ্টি পড়তে লাগল। রাঠোররাজ আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না সেই প্রবল বর্ষণের মধ্যে। ছাদ থেকে নীচে নেমে প্রবেশ করলেন নিজের কক্ষে। তারপর বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ শুনতে শুনতে আবার ভাবতে লাগলেন ঝুলকুমারীর কথা।

ঝালোয়ার রাজকন্যার সঙ্গে রাঠোররাজের বিবাহের প্রস্তুতি প্রায় সারা হয়ে গেছে। দিনক্ষণও একদম ঠিক। আর কয়েক পক্ষকাল পরেই ঝুলকুমারী এই মান্ডোর প্রাসাদে রানির বেশে পা রাখবেন। সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় এখন দিন গুনছেন প্রাসাদের সকলে। সিংহল দ্বীপ থেকে আজই প্রাসাদে পৌঁছেছে একহাজার মঙ্গলশঙ্খ।

রানি যখন পদার্পণ করবেন এ প্রাসাদে, সেই শুভক্ষণে কুলনারীর দল ওই মঙ্গলশঙ্খে ফুঁ দিয়ে স্বাগত জানাবেন তাঁকে। মান্ডোররাজ তাঁর ভাবী রানির জন্য প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচাতে শ্বেতপাথরের এক মহল নির্মাণ করিয়েছেন। সেই বাগিচাতে রোপণ করা হয়েছে পারস্য থেকে সংগ্রহ

BanglaBook.org

করে আনা গোলাপ। বাগানে খেলে বেড়ায় আরাবল্লীর গহীন অরণ্য থেকে নিয়ে আসা হরিণশিশু, নেচে বেড়ায় সাদা ময়ূরের দল। মহল সংলগ্ন ছোট্ট পুষ্করিণীতে ঘুরে বেড়ায় রঙিন মাছের ঝাঁক। ক্লান্ত দিবাবসানে ওই বাগানেই রাঠোররাজ নিভৃতে প্রেমালাপে মত্ত হবেন ঝালোয়ার দুহিতার সঙ্গে।

আকাশে একসময় রুপার থালার মতো চাঁদ উঠবে, পারসীয় গোলাপের সৌরভ ছড়িয়ে পড়বে চারপাশে, তখন বাগানে শ্বেতপাথরের বেদির ওপর ঝুলকুমারীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে রাঠোররাজ শুনবেন তাঁর সুমধুর সঙ্গীত। তারপর কথা ও কাহিনিতে রাত যখন গভীর হবে তখন রাজপ্রাসাদের নরম বিছানায় রানিকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকবেন রাঠোররাজ।

আর তো মাত্র ক'টা দিন। কিন্তু তা-ও যেন কাটতে চাচ্ছে না রাঠোর অধিপতির। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রাঠোররাজের মনে হচ্ছিল এই অন্ধকারময় বৃষ্টির দিনে যদি ঘোড়া ছোটানো যেত তাহলে বড় ভালো হত। এরকম গোপন অভিসারে তিনি যে ইতিপূর্বে যাননি তা নয়, কিন্তু এখন সমস্যা হল, বিবাহের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। রাঠোররাজ ঝালোয়ার প্রাসাদে অভিসারে গিয়ে যদি রাজকুমারীর কোনও সহচরীর হাতে ধরা পড়ে যান তবে লজ্জার আর শেষ থাকবে না। তাই এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে রাঠোররাজকে। আর তো মাত্র কয়েকটা দিন, আর তার পরেই তো...এই ভেবে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে লাগলেন রাঠোর অধিপতি।

দুপুর বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল, বৃষ্টির বিরাম নেই। বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে ঝুলকুমারীর কথা চিন্তা করছিলেন রাঠোররাজ। হঠাৎ আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোতে ক্ষণিকের জন্য অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হল রাঠোররাজের। চোখে পড়ল দূরের পাহাড়শ্রেণির মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক দুর্গ-প্রাকারের অস্পষ্ট ছবি। তারপর আবার তা হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। খুব কাছেই কোথায় যেন বাজ পড়ল, থর থর করে কেঁপে উঠল সারা প্রাসাদ।

তড়িৎশিখার আলোতে ওই দুর্গ-প্রাকার চোখের সামনে ভেসে উঠতেই

BanglaBook.org

রাঠোররাজের মনে পড়ে গেল আরও এক জনের কথা,—তিনি ওই কুম্ভমেরু দুর্গের মালিক, এই মরু রাজ্যের অধীশ্বর মহারানা কুম্ভ। তাঁর কথা মনে আসতেই রাঠোররাজ ভাবলেন—এই বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায় মহারানা এখন কী করছেন? হয়তো তিনি নিজের কক্ষে বসে বীণা বাজাচ্ছেন মগ্ন হয়ে।

বহুদিন আগে এইরকম এক বৃষ্টির রাতে রাঠোররাজকে সারা রাত ধরে তাঁর বীণা বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন মহারানা। সে কী অপূর্ব সুরের মূর্চ্ছনা! চোখ বন্ধ করলেই এখনও তা কানে বাজে রাঠোররাজের। তাই মহারানার কথা মনে পড়তেই রাঠোররাজের এ কথা মনে হল।

কুম্ভ চিতোরের মহারানা, আর চন্দ্রকান্ত ছোট্ট এক মরু অঞ্চলের শাসনকর্তা। বলতে গেলে নামেই তিনি রাজা। আসলে তিনি কুম্ভর অধীনস্থ এক সামান্য ভূস্বামী মাত্র, প্রজা বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাদের দুজনের সম্পর্ক বন্ধুর মতো। রাঠোররাজের চেয়ে মহারানা বয়সে, ধনে, মানে, বিদ্যায় অনেক বড়। তবু কেন যেন এসবের ঊর্ধ্বে দুজনের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠেছে। আশেপাশের অনেক ভূস্বামী এ জন্য মনে মনে ঈর্ষাও করেন রাঠোররাজকে। কেউ কেউ আবার উপযাচক হয়ে গোপনে সাবধানও করেছেন রাঠোররাজকে, মহারানাদের মতিগতি বোঝা বড় দায়। কখন যে তাঁরা কার ওপর কুপিত হন বোঝা মুশকিল। তাই তাঁকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাঠোররাজ অবশ্য এসব কথায় কান দেননি কোনওদিন। মহারানার ওপর তাঁর অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা। কুম্ভও যথেষ্টই স্নেহ করেন চন্দ্রকান্তকে। এমনকী নিভৃতে যখন দুজনের মধ্যে আলোচনা হয় সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন বা অন্য কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে, তখন তাঁকে রাঠোররাজ মহারানা বলে সম্বোধন করলে অসন্তুষ্ট হন তিনি। তার চেয়ে রাঠোররাজের মুখ থেকে কুম্ভজি কথাটা শুনতেই বেশি ভালোবাসেন মহারানা। তাই একান্তে ওই নামেই তাঁকে সম্বোধন করেন চন্দ্রকান্ত।

রাঠোররাজের কুম্ভর প্রতি শ্রদ্ধার বিশেষ কারণ আছে। কুম্ভ শুধু এই দিগন্ত বিস্তৃত বালির সমুদ্রের অধীশ্বরই নন, তাঁর পাণ্ডিত্যও অগাধ। বহু গুণের অধিকারী মহারানা। শিল্পকলা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর। 'গীতগোবিন্দ'-র এক আশ্চর্য পরিশিষ্ট রচনা করেছেন মহারানা, যা

BanglaBook.org

শুনলে মোহিত হয়ে যেতে হয়। একদিন তাঁর মুখ থেকে তা শুনেছেন রাঠোররাজ। রাঠোররাজের ইচ্ছা আছে কুম্ভজিকে তিনি অনুরোধ জানাবেন, যেন তিনি ঝুলকুমারীকে শোনান তাঁর এই অমৃত রচনা।

সাধারণত চিতোর প্রাসাদেই চন্দ্রকান্তকে ডেকে পাঠান কুম্ভজি। তারপর প্রহরের পর প্রহর দুজনের মধ্যে চলে নানা আলোচনা। যা অধিকাংশই শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক। কুম্ভজিও যে মান্ডোর প্রাসাদে একেবারে আসেন না তা নয়। আসার আগে প্রতিবারই দূত মারফত তাঁর আগমনের খবর জানিয়ে দেন যাতে চন্দ্রকান্ত সেসময় কোনও কাজে ব্যস্ত না থাকেন। কিন্তু কিছুদিন আগে এক বিকালে চন্দ্রকান্তকে একেবারে অবাক করে দিয়ে একলা মহারানা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন মান্ডোর প্রাসাদে। তড়িৎশিখায় চকিতের জন্য যে দুর্গ প্রাকার চন্দ্রকান্তর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, সেই কুম্ভমেরু দুর্গ নির্মাণের তদারকির কাজে এদিকে এসেছিলেন কুম্ভজি। তারপর মনের খেয়ালে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন মান্ডোর প্রাসাদে। কিন্তু সেদিন যেন রাঠোররাজের কেমন বিষণ্ণ বলে মনে হয়েছিল কুম্ভজীকে। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। রাঠোররাজ একবার ভেবেছিলেন এর কারণ জিগ্যেস করবেন কুম্ভজিকে। কিন্তু সংকোচের কারণে শেষ পর্যন্ত তা আর জিগ্যেস করা হয়ে ওঠেনি চন্দ্রকান্তর।

কুম্ভজির কথা ভাবতে ভাবতে রাঠোররাজের মনে পড়ে গেল সে দিনের একটি কথা—। কথা বলতে বলতে সেদিন কুম্ভজি হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিলেন—'আচ্ছা পাষাণমূর্তি আর রক্তমাংসের মানুষের পার্থক্য কী?'

'রক্তমাংসের মানুষের অনুভূতি আছে, সে নিজের ও অন্যের দেহ-মনের ক্ষুধা জাগিয়ে তুলতে পারে কিন্তু পাষাণমূর্তি তা পারে না। কারণ তার কোনও অনুভূতি নেই, জৈবিক তাড়না নেই।'—উত্তর দিয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত।

রাঠোররাজের উত্তর শুনে কুম্ভজি বলেছিলেন—'আমিও তো তাই জানি, কিন্তু-।' কথাটা আর শেষ করেননি কুম্ভজি। হঠাৎই থেমে গেছিলেন তিনি। আর তারপরই এ প্রসঙ্গ ছেড়ে চলে গেছিলেন অন্য প্রসঙ্গে।

BanglaBook.org

সে দিন এই আপাত সরল অথচ অদ্ভুত প্রশ্নটা তাকে কেন করলেন কুম্ভজি। ওই প্রশ্নের মধ্যে কি অন্য কোনও তাৎপর্য লুকিয়ে ছিল, যা তাকে বুঝতে দিতে চাননি কুম্ভজি? নইলে কেনই বা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন তিনি? কেনই বা সেদিন তাঁকে বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল? অন্ধকারের মধ্যে একা একা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলেন রাঠোররাজ চন্দ্রকান্ত।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় যখন শুতে গেলেন চন্দ্রকান্ত, বৃষ্টি তখন একটু ধরে এসেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে বাঁকানো চাঁদের হাসি। নরম পালঙ্কে শুয়ে ঝুলকুমারীর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন চন্দ্রকান্ত।

৪

বৃষ্টি নেমেছে চিতোরগড়েও। আর তার সঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে মহারানার মনে। কেল্লার একেবারে শেষ প্রান্তে এক স্বচ্ছ জলাশয়ের মাঝখানে অবস্থান করছে ছোট্ট এক প্রাসাদ। নাম, জলমহল। জলমহল থেকে ধাপে ধাপে শ্বেতপাথরের সোপানশ্রেণি নেমে গেছে জলাশয়ের মধ্যে। এই স্থান বড় প্রিয় মহারানার। দুর্গ নগরীর কোলাহল এ পর্যন্ত এসে পৌঁছোয় না। মাঝে মাঝে শুধু দূর থেকে ভেসে আসে চিতোরেশ্বরী মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি আর জলাশয়ের পদ্মবনে উড়ে বেড়ায় ভ্রমরের গুঞ্জন।

বেলা দ্বিপ্রহরে মহারানা একা জলমহলে বসে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন জলাশয়ের দিকে। দুদিন ধরে সূর্যদেব মুখ লুকিয়েছেন মেঘের আড়ালে। বৃষ্টির যেন আর বিরাম নেই। বরুণদেব অকৃপণ হাতে জল সিঞ্চন করে চলেছেন তৃষ্ণার্ত মরুভূমির বুকে। আকাশ থেকে নেমে আসা বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা জলের ওপর পড়ে প্রতি মুহূর্তে রচনা করছিল নানা আলপনা।

মহারানা দেখছিলেন জলতরঙ্গের সেই ভাঙা-গড়ার খেলা। এ প্রাসাদকে লোকে বলে 'পদ্মিনী মহল'। মহারানার পূর্বপুরুষ ভীমসিংহ এ প্রাসাদ

BanglaBook.org

নির্মাণ করেছিলেন তাঁর প্রিয়তমা, মহারানি পদ্মিনীর জন্য। এ প্রাসাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চিতোরের ইতিহাসের এক করুণ কাহিনিও। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিতোরের বুকে নেমে এসেছিল ধ্বংস লীলা, তার সূচনা এই জলমহল থেকেই হয়েছিল বলা যেতে পারে। সেসব মহারানা কুম্ভর জন্মের প্রায় দুশো বছর আগের ব্যাপার। কিন্তু সেদিনের সেই ইতিহাসের কথা স্মরণ করলে আজও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মহারানার হৃদয়। বিশেষত, জলমহলের এই নির্জনতায় এসে বসলে তার বার বার মনে হয় হতভাগ্য রানি পদ্মিনীর আখ্যান—সিংহল রাজহামীরশঙ্কের অসামান্য রূপসি কন্যা পদ্মিনীকে রাজপরিবারের বধূ করে এনেছিলেন চিতোররাজ লক্ষ্মণ সিংহের কাকা ভীম সিংহ। কীভাবে যেন পদ্মিনীর রূপের কথা পৌঁছেছিল দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিনের কানে। তাঁকে পাবার লোভে আলাউদ্দীন অবরোধ করে বসলেন চিতোরগড়। অবশেষে চিতোররাজ লক্ষ্মণ সিংহের সঙ্গে সুলতানের চুক্তি হল—কেল্লায় প্রবেশ করে একবার মাত্র সুলতান দূর থেকে প্রত্যক্ষ করবেন রানির অপার সৌন্দর্য। আর তারপর দিনই তিনি ফিরে যাবেন দিল্লির পথে।

সুলতানের কথায় বিশ্বাস করে লক্ষ্মণ সিংহ তাকে কেল্লায় প্রবেশের অনুমতি দিলেন। সুলতানকে এনে রাখা হল জলমহলের বিপরীতে জলাশয়ের ধারে দূর্গপ্রাকার সংলগ্ন এক কক্ষে। সেই কক্ষে বিশাল এক দর্পণ এমনভাবে বসানো ছিল যে জলমহলের সোপানশ্রেণির শেষ ধাপে কেউ নেমে দাঁড়ালে স্বচ্ছ জলে তার যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে তা ধরা দেবে কক্ষের দর্পণে।

সকাল থেকে দর্পণের দিকে চেয়ে বসেছিলেন সুলতান। তারপর দিনের শেষে এই জলমহলের শ্বেতপাথরের সোপানশ্রেণি বেয়ে ক্ষণিকের জন্য নীচে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন সেই রূপসি নারী। মুহূর্তের জন্য খুলে ফেলেছিলেন তার অবগুণ্ঠন। অস্তাচলগামী সূর্যের লাল আভা এসে পড়েছিল তার মুখে। দর্পণের মাধ্যমে সুলতান প্রত্যক্ষ করেছিলেন যুবতী রানির অপার সৌন্দর্য। মাত্র এক মুহূর্তের জন্যই। তার পরক্ষণেই রানি অদৃশ্য হয়েছিলেন জলমহলের ভিতর। হয়তো মহারানা আজ যেখানে বসে আছেন সেখানে দাঁড়িয়েই রানি ক্রোধে-ঘৃণায়-অপমানে অশ্রু বিসর্জন

BanglaBook.org

করেছিলেন সেদিন। সূর্যদেবও রানির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মুখ লুকিয়ে ছিলেন দূরের ওই পর্বতমালার আড়ালে। চারিদিকে নেমে এসেছিল ঘোর অন্ধকার। অন্ধকার নেমে এসেছিল চিতোরের ভাগ্যাকাশে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মিনীর জীবনেও। জলমহলের সোপানশ্রেণিতে পদ্মিনীকে দেখার পর তাঁকে পাবার ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল আলাউদ্দীনের।

মহারানা কুম্ভ গল্প শুনেছেন যে, দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিবিম্বকে সত্যি মনে করে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য নাকি দর্পণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কামুক সুলতান। ভেঙে খান খান হয়ে গেছিল সেই দর্পণ। আলাউদ্দীন কিন্তু তাঁর কথা রাখেননি। কয়েক মাসের মধ্যেই সুলতানের নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী আছড়ে পড়ে চিতোরে। তাকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে ভীম সিংহ, লক্ষ্মণ সিংহের সাত পুত্রসহ চিতোরের বহু নামি-অনামি যোদ্ধা শহীদ হন যুদ্ধক্ষেত্রে। তবু প্রাণ থাকতে চিতোরের মানুষ রানি পদ্মিনীকে তুলে দেননি আলাউদ্দিনের হাতে। শেষ পর্যন্ত দুর্গের পতন যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তখন অসহায় রানি মহারানা কুম্ভর প্রাসাদের নীচে এক ভূগর্ভস্থ কক্ষে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মসম্মান রক্ষা করলেন।

যে নারীদেহর জন্য সুলতানের মনে এত লালসা, সেই নারীদেহ মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল চিতার আগুনে। যুদ্ধ শেষে রক্তে পিচ্ছিল পথ বেয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন বিজয়ী সুলতান। কিন্তু পদ্মিনীকে পাওয়া হল না তাঁর। চিতোর নগরীর যা কিছু সুন্দর ছিল সুলতানের ক্রোধের আগুনে ধ্বংস হল সব কিছু। শুধু তিনি ধ্বংস করলেন না এই জলমহল। যে জলমহলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে অস্তাচলগামী সূর্যের আলোতে একদা সুলতানকে দর্শন দিয়েছিলেন রূপসি রানি পদ্মিনী। কিন্তু কেন জলমহলের ধ্বংস করলেন না সুলতান? তাহলে সত্যিই কি পদ্মিনীর কথা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি প্রেমের সঞ্চার হয়ে গিয়েছিল কামুক সুলতানের মনে? অসহায় রানির শেষ পরিণতি কি সিক্ত করেছিল দুর্ধর্ষ সুলতানের মন? জলমহলের বিষণ্ণতায় এ প্রশ্নগুলো বারবার ফিরে আসে মহারানা কুম্ভর মনে।

বৃষ্টিস্নাত জলমহলে একলা বসে আজ আরও এক জনের কথা খুব

BanglaBook.org

বেশি মনে পড়ছিল কুম্ভর। মনে পড়ছিল মীরার কথা। মনে পড়ছিল যৌবনের সেই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। সেসময় গ্রীষ্মকালটা এ প্রাসাদেই কাটাতেন মীরা। কুম্ভ কেল্লায় থাকলে রাজকার্য সমাপ্ত হলে দ্বিপ্রহরে চলে আসতেন জলমহলে। এখানে তাঁর প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন মীরা। যদি কোনওদিন বিশেষ কারণে তাঁর জলমহলে আসা না-হত তাহলে পরদিন কত অনুযোগ শুনতে হত রানির কাছ থেকে। মুখ ভার হয়ে থাকত রাজমহিষীর, প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতেন মহারানা। তারপর এক সময় মান ভাঙত মহারানির। ওই শ্বেতপাথরের সোপানশ্রেণি বেয়ে দুজনে গিয়ে বসতেন জলাশয়ের ধারে। মহারানার বাহুবন্ধনে প্রেমালাপে মেতে উঠতেন রানি। মাঝে মাঝে রানি যখন খিল খিল করে হেসে উঠতেন তখন জলমহলের অলিন্দে বসে থাকা পায়রার দল ডানা মেলে উড়ে যেত আকাশের দিকে। তাই দেখে মহারানার মনে হতো মীরার হাসি যেন ছড়িয়ে পড়ছে দূরের ওই নীল আকাশের বুকে।

এক-একদিন গল্প করতে করতে সূর্য ঢলে যেত পশ্চিমে। আকাশে গোল চাঁদ উঠত, সেই চাঁদের প্রতিবিম্ব আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠত জলাশয়ের বুকে। জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ত ছোট্ট জলমহলের শ্বেতপাথরের স্তম্ভ থেকে। তখন কুম্ভর কোলে মাথা রেখে শুয়ে মীরা শুনত তাঁর বীণার ঝঙ্কার। রাত যত বাড়ত আস্তে আস্তে তাদের দুজনের মন থেকে মুছে যেত পৃথিবীর অন্য সব কিছুর অস্তিত্ব। জেগে থাকত শুধু দুটি মন আর দেহ। তারপর শেষ রাতে অনেক কষ্টে মীরার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রাসাদে শুতে যেতেন মহারানা।

সেবার একবার এ রকমই বহু দিন পর বৃষ্টি নেমেছিল চিতোর গড়ের বুকে। মহারানা এমনই এক দ্বিপ্রহরে মীরাকে নিয়ে চলে এসেছিলেন এই জলমহলে। মহারানার হঠাৎ কী খেয়াল হয়েছিল—তিনি বৃষ্টিতে ভিজবেন। জলমহলের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে তিনি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শেষ ধাপে। অঝোর ঝরে বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। তার সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক ফালা ফালা করে দিচ্ছিল আকাশকে। বাজের গুরুগম্ভীর গর্জনে কেঁপে উঠছিল চারিদিক। বাজের শব্দকে খুব ভয় করত মীরা। স্বামীকে জলমহলের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে দেখে অগত্যা বৃষ্টির মধ্যে তাঁর পিছু পিছু নীচে এসে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়েছিল রানি।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কাছেই কোথাও প্রচণ্ড শব্দ করে একটা বাজ পড়েছিল। ভয় পেয়ে রানি জড়িয়ে ধরেছিল মহারানাকে। মহারানাকে জড়িয়ে ধরে থর থর করে কাঁপছিল রানি। বৃষ্টির ধারা তার চিবুক ছুঁয়ে তার বক্ষের বিভাজিকা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল আরও নীচের দিকে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে মহারানার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছিল এক আদিম উষ্ণতার স্রোত। বেশিক্ষণ আর বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি মহারানা। সিক্ত অবস্থাতেই রানিকে নিয়ে শুতে গেছিলেন জলমহলের সুখশয্যায়। বিকাল গড়িয়ে কখন সন্ধ্যা নেমেছিল কিছুই খেয়াল ছিল না দুজনার। সন্ধ্যাবেলায় যখন মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের ফালি উঁকি দিল তখন বিছানায় উঠে বসেছিলেন মহারানা।

আজ এতদিন পরে আবার জলমহলের বিষণ্ণতায় বসে মহারানার মনে পড়ে গেল ওই দিনটার কথা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা প্রশ্নের উদয় হল মহারানার মনে। আজ যদি তাকে এখানে ডেকে পাঠান তবে সে কি আসবে এখানে? 'হ্যাঁ সে আসবে, সে আসবে মহারানা কুম্ভর ডাকে, স্বামী কুম্ভর ডাকে নয়।'—মনে মনে নিজেই নিজের প্রশ্নরই উত্তর দিলেন কুম্ভ। আর যদি সে মহারানার ডাকে আসেই বা, সে কি বয়ে আনতে পারবে সেদিনের সেই উত্তাপ, যা কুম্ভর শিরায় শিরায় জাগিয়ে তুলবে কামনার আগুন? সে কি সঙ্গে করে আনতে পারবে এমন কিছু, যা কুম্ভর শুষ্ক হৃদয়কে আবার সিক্ত করে তুলবে? মীরার সব কিছু তো আজ ওই কষ্টিপাথরের মূর্তির কাছে উৎসর্গীকৃত। ওই পাষাণমূর্তি ছাড়া সব কিছু জাগতিক বিষয় আজ মূল্যহীন তার কাছে।

পাষাণমূর্তি গ্রাস করে নিয়েছে মীরার সব কিছু, এমনকী দূরে সরিয়ে দিয়েছে স্বামী কুম্ভকেও। কুম্ভ কোনওদিন তো মহারানা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চাননি মীরার কাছে, থাকতে চেয়েছেন শুধু কুম্ভ হয়ে, রক্তমাংসের মানুষ হয়ে, আজীবন মীরার ভালোবাসার সঙ্গী হয়ে। নইলে কবেই তো তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতেন কষ্টিপাথরের ওই গিরিধারির মূর্তি, গর্দান নেবার আদেশ দিতে পারতেন মীরার গুরু রুইদাসের অথবা নিদেন পক্ষে মীরার জন্য বন্ধ করে দিতে পারতেন কুম্ভশ্যাম মন্দিরের দরজা। এসব

BanglaBook.org

কিছুই তিনি করেননি। করেননি মীরাকে তিনি আজও ভালোবাসেন বলে, করেননি মীরার ওপর তিনি জোর করতে চান না বলে।

গ্রাম থেকে মীরা যেদিন রাজবধূ বেশে ভয় ভয় চোখে চিতোর গড়ের সিংহ দুয়ারে পা রেখেছিল সেদিন থেকেই কী কারণে যেন তার প্রতি একটা মায়া জন্মে গেছিল মহারানা কুম্ভর মনে। যা তিনি আজও কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। এমনকী মীরাকে বলতে পারলেন না—'তোমার এই নিস্পৃহতা আসলে আমার প্রতি অবিচার, আমার ভালোবাসার প্রতি নির্দয়তা। মহারানা কুম্ভ একা নন, কিন্তু বড় একা। আর এই একাকিত্বের পূর্ণ দায়িত্ব তোমারও কারণ তুমি শুধু কৃষ্ণপ্রিয়া নও, তুমি কুম্ভরও প্রিয়া। কৃষ্ণপ্রেমে তুমি ভুলে যেতে পারো না আমাকে, অবজ্ঞা করতে পারো না রক্তমাংসের মানুষ কুম্ভর ভালোবাসাকে।'

একলা জলমহলে বসে এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই যেন মীরার প্রতি একটা তীব্র ক্ষোভ জন্ম নিল কুম্ভর মনে।

৫

তিন দিন ধরে বৃষ্টির পর আকাশে ঝলমলে রোদ উঠেছে। সকালবেলা মান্ডোর প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে পায়রা ওড়াচ্ছিলেন রাঠোররাজ চন্দ্রকান্ত। গেরোবাজ পায়রাগুলো আকাশের বুকে পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছিল উঁচু থেকে আরও উঁচুতে। ময়ূরপঙ্খীগুলো আকাশে উড়তে পারে না। পেখম নাচিয়ে গলা ফুলিয়ে বকবকম-বকবকম করতে করতে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল রাঠোররাজের পায়ের কাছে। শৈশব থেকেই নানা ধরনের পায়রা পোষার নেশা রাঠোররাজের। সেই নেশাটা বড় বয়সেও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি। মন মেজাজ ভালো থাকলে সকালবেলা ছাদে উঠে পায়রা ওড়ান তিনি, নিজের হাতে দানা খাওয়ান তাদের।

চন্দ্রকান্ত আকাশের দিকে পায়রা ওড়া দেখছিলেন এমন সময় এক ভৃত্য এসে খবর দিল—নীচে বার্তাবাহকের দল তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গেছিলেন চন্দ্রকান্ত। তিনি আজ তাদের উপস্থিত

BanglaBook.org

হতে বলেছিলেন প্রাসাদে। বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে তারা যাবে এই মরু অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় রাজ্যে। তার মধ্যে অনেককে পাড়ি দিতে হবে দু-তিন দিনের পথ। আজ সকালেই তাদের যাত্রা করা প্রয়োজন। তাই খবরটা শোনা মাত্রই রাঠোররাজ ছাদ থেকে নীচে নেমে চললেন তাঁর ছোট্ট দরবার কক্ষের দিকে।

দরবার কক্ষে প্রবেশ করে রাঠোররাজ দেখলেন তাঁর প্রধান বার্তাবাহক বৃদ্ধ বীরমল্লসহ অন্যান্য সকল বার্তাবাহকই উপস্থিত হয়েছে সেখানে। বীরমল্ল ছাড়া তাঁর অন্য অনুচরদের হাতে রাঠোররাজ তুলে দিলেন রেশম বস্ত্রের ওপর সোনার সুতোয় বোনা বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র। তাদের নির্দেশ দিলেন কাকে কোথায় যেতে হবে। রাঠোররাজের নির্দেশমতো নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা কেউ জয়সলমের, কেউ অম্বর, কেউ বুঁদির দিকে ছুটল। সবাই চলে গেলে দরবার কক্ষে রইলেন শুধু রাঠোররাজ চন্দ্রকান্ত আর বীরমল্ল।

রাঠোররাজ বীরমল্লকে বললেন—'আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে পাঠাব চিতোরের মহারানা কুম্ভর কাছে। তাঁকে বলবেন, তিনি বিবাহের দিন আমার সঙ্গে ঝালোয়ার প্রাসাদে উপস্থিত না হলে মনে বড় ব্যথা পাব আমি। এই বিবাহে তিনিই আমার অভিভাবকত্ব করবেন। মহারানার কাছে এই আমার প্রার্থনা।'

বীরমল্ল বললেন—'যে আজ্ঞে মহারাজ।' এরপর রাঠোররাজ একটু যেন ইতস্তত করে বীরমল্লর উদ্দেশ্যে বললেন—'শুধু নিমন্ত্রণ পত্রই নয়, আরও একটা জিনিস আমি মহারানার উদ্দেশ্যে পাঠাব, তবে খেয়াল রাখবেন মহারানার হাতে পৌঁছোবার আগে অন্য কেউ যেন সেটা দর্শন না করেন। জিনিসটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত।'

রাঠোররাজের কথা শুনে বীরমল্ল ঘাড় নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর নির্দেশ পালন করবেন তিনি। এরপর বীরমল্লকে দরবার কক্ষে তাঁর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে চন্দ্রকান্ত রওনা হলেন প্রাসাদের দ্বিতলে তাঁর কক্ষের দিকে।

চন্দ্রকান্ত কুম্ভজিকে পাঠাবেন এক ছবি। এক বৃদ্ধ চিত্রকরকে দিয়ে রাঠোররাজ আঁকিয়েছেন ঝুলকুমারীর ছবি। কিছুদিন আগে কুম্ভজি

BanglaBook.org

যখন মান্ডোর প্রাসাদে এসেছিলেন তখন কথাপ্রসঙ্গে মান্ডোররাজ তাঁকে বলেছিলেন এই ছবির কথা। কুম্ভজি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ছবিটার ব্যাপারে। সেটা আঁকা সম্পূর্ণ হয়নি চিত্রকরের। কুম্ভজি বলেছিলেন অতি অবশ্যই রাঠোররাজ যেন তাঁকে ছবিটা দেখান। চিত্রকলার একজন বড় সমঝদার মহারানা। এবিষয়ে তাঁর খুব আগ্রহ। রাঠোররাজ তাঁকে কথা দিয়েছিলেন, আঁকা সম্পূর্ণ হলে ছবিটা তিনি চিতোর প্রাসাদে কুম্ভজির দেখার জন্য পাঠিয়ে দেবেন। দুদিন আগে চিত্রকর তার কাজ সম্পন্ন করে সে ছবি দিয়ে গেছেন রাঠোররাজের হাতে। ছবি অতুলনীয় হয়েছে ঠিকই, সত্যি কথা বলতে কী রাঠোররাজেরও ধারণা ছিল না বৃদ্ধর হাতের তুলিতে এত যাদু থাকতে পারে। কিন্তু ছবিটা যত ভালোই হোক না কেন, সর্বসমক্ষে ছবিটা দেখানোর ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে। আসলে ছবি আঁকার নির্দেশ দেবার সময় রাঠোররাজ শিল্পীর স্বাধীনতায় কোনও হস্তক্ষেপ করতে চাননি। তিনি চিত্রকরকে তার নিজের মনের মতো করেই ছবিটা আঁকতে বলেছিলেন, আর তাঁর হাতে শুধু তুলে দিয়েছিলেন ঝুলকুমারীর মুখশ্রীর একটা কাঠ খোদাই প্রতিচ্ছবি। যাতে অদেখা ঝুলকুমারীর মুখশ্রী চিত্রকর আঁকতে পারে। যেহেতু ছবি আঁকা প্রসঙ্গে রাঠোররাজ শিল্পীকে অন্য কোনও নির্দেশ দেননি তাই চিত্রকর আপন মনের খেয়ালে এঁকেছেন সিক্ত বসনা ঝুলকুমারীর ছবি।

বৃদ্ধ চিত্রকর অদ্ভুতভাবে সে ছবিতে জাগিয়ে তুলেছেন সিক্তবসনা সুন্দরীর নারী দেহ। তাই ছবি দেখার পর রাঠোররাজ যেমন শিল্পীর নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়েছেন তেমনই একটু বিব্রত হয়েছেন। বেশ কয়েকবার তিনি চিন্তা করেছেন এ ছবি বয়ঃজ্যেষ্ঠ কুম্ভজীকে দেখানো ঠিক হবে কিনা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাঠোররাজ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ছবিটা তিনি দেখাবেন চিতোর রাজকে। কারণ তিনি কুম্ভজীকে কথা দিয়েছেন এ ব্যাপারে। ছবির প্রকৃত উৎকর্ষতার বিষয়েও কুম্ভজীর মতামত তাহলে জানতে পারবেন চন্দ্রকান্ত। সেই মতো তিনি পুরস্কারও প্রদান করতে পারবেন চিত্রকরকে।

নীচে দরবার কক্ষে বীরমল্লকে রেখে ওপরে উঠে চন্দ্রকান্ত প্রবেশ করলেন নিজের শয়ন কক্ষে। পালঙ্কের পাশেই রেশম বস্ত্রের আচ্ছাদন

BanglaBook.org

দেওয়া ছবিটা রাখা আছে। বেশ প্রমাণ মাপের তৈল চিত্র, প্রায় এক মানুষ হবে। চন্দ্রকান্ত গিয়ে দাঁড়ালেন তার সামনে, খুলে ফেললেন তার আচ্ছাদন। তারপর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ছবিটার দিকে। রাঠোররাজের মনে হতে লাগল সত্যিই যেন সিক্তবসনা রাজকন্যা এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। চিত্রকরের তুলির টানে আশ্চর্যভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর দেহের গোপন রেখাগুলি। ছবি নয়, এ যেন সত্যিই রাজকন্যার রক্তমাংসের জীবন্ত শরীর। যা আহ্বান জানাচ্ছে রাঠোররাজকে।

বেশিক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না চন্দ্রকান্ত। গরম রক্তের স্রোত জ্বালা ধরাতে শুরু করল তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। রাঠোররাজ আবার ঢেকে ফেললেন ছবিটা। শেষ বারের মতো তিনি আর একবার চিন্তা করলেন—কুম্ভজির কাছে এ ছবি পাঠানো কি ঠিক হবে? পরক্ষণেই আবার তিনি ভাবলেন—কুম্ভজির স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। বিবাহের মাত্র কিছুদিন আর বাকি। বিবাহের পর কুম্ভজী যদি ছবিটা দেখতে চান আরও বিপদ হবে। কারণ, ঝুলকুমারী মান্ডোর প্রাসাদে আসার পর তাকে দেখাতে হবে ছবিটা। আর তা দেখার পর স্বাভাবিক কারণেই লজ্জাশীলা অন্যান্য নারীর মতই ঝুলকুমারীও নিশ্চয়ই চাইবেন না তার এ ছবি অন্য কোনও পর পুরুষ দেখুক। তখন উভয় সঙ্কটে পড়বেন রাঠোররাজ। কুম্ভজি না ঝুলকুমারী, কার ইচ্ছাকে তখন প্রাধান্য দেবেন চন্দ্রকান্ত। কাউকে মিথ্যা কথাও বলতে পারবেন না চন্দ্রকান্ত। কারণ জীবনে কাউকে কোনও দিন মিথ্যা বলেননি রাঠোররাজ। এ বিষয়ে তিনি নিজের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। এসব ভেবে তাই রাঠোররাজ তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্তই বহাল রাখবেন।

আচ্ছাদন সমেত ছবিটাকে নিজের হাতে রেশমের ফিতা দিয়ে ভালো করে বাঁধলেন তিনি। তারপর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা রক্ষীকে নির্দেশ দিলেন সেটা বহন করে তাঁর সঙ্গে দরবার কক্ষে যেতে।

ছবি নিয়ে দরবার কক্ষে পৌঁছোবার পর রাঠোররাজ রক্ষীকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন, তারপর সেটা বীরমল্লর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—'ছবিটা চিতোররাজের কাছে দিয়ে বলবেন তাঁর দেখার পর তিনি যেন ছবিটা আবার আপনার হাতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এ ব্যাপারে আরও একটা

BanglaBook.org

কথা আপনি তাঁকে জানাবেন, তা হল আমার অনুরোধ—তিনি যেন সর্বসমক্ষে এ ছবি না দেখেন।'

রাঠোররাজকে প্রণাম জানিয়ে ছবি আর রাঠোররাজের দেওয়া তাঁর বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন বৃদ্ধ বার্তাবাহক বীরমল্ল। আর রাঠোররাজ সিঁড়ি ভেঙে চললেন আবার প্রাসাদের ছাদের দিকে। দেখতে, তার প্রিয় গেরোবাজগুলো ওড়া শেষ করে ঠিকমতো আবার ফিরে এসেছে কিনা। দূরের নবনির্মিত কুম্ভমেরু দুর্গে কয়েকটা বাজপাখি পুষেছেন মহারানা। মাঝে মাঝেই তারা তাড়া করে চন্দ্রকান্তর শখের পায়রাগুলোকে। রাঠোররাজ মনে মনে ভেবে রেখেছেন এবার কুম্ভজির সঙ্গে দেখা হলে বলবেন ব্যাপারটা। যাতে কুম্ভজি দুর্গরক্ষীদের নির্দেশ দেন যে সকালবেলায় তারা যেন ওই হিংস্র পাখিগুলোকে না ওড়ায়।

বৃদ্ধ বীরমল্ল প্রাসাদ ছেড়ে প্রথমে রওনা হলেন নিজের আস্তানার দিকে। চিতোর বেশ অনেকটা পথ। সেখানে রওনা হবার আগে আস্তানা থেকে ঘোড়া আর রসদ সংগ্রহ করে নিতে হবে। সাজ-পোশাকও পালটাতে হবে। কিন্তু একটা ব্যাপার তাকে পেয়ে বসল। রাঠোররাজ মহারানার কাছে কী এমন ছবি পাঠাচ্ছেন যে সর্বসমক্ষে তা না দেখতে অনুরোধ করেছেন মহারানাকে।

ঘরে ফিরে আসার পর বীরমল্ল আর নিজের কৌতুহল সংবরণ করতে পারলেন না। একটা গর্হিত কাজ করে ফেললেন বৃদ্ধ। ছবির আবরণ উন্মোচন করে ফেললেন তিনি। কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র। আর তার পরেই আবার ঢেকে ফেললেন ছবিটা। মনে মনে বীরমল্ল ভাবলেন—'কাজটা আমার ঠিক হয়নি। রাজকুমারী ক'দিন পরেই আমাদের সকলের মা হবেন। কারণ রাজমাতা বহু দিন হল গত হয়েছেন। ঝুলকুমারীই পাবেন রাজমাতার সম্মান। তাই কৌতূহলের বশে তাঁর এ ছবি দেখা ঠিক হল না। ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন।'

আর একটা কথা তিনি ভাবলেন, রাঠোররাজ কি এ ছবি মহারানার কাছে পাঠিয়ে ঠিক করেছেন? অবশ্য তার ভাবাভাবিতে কিছু এসে যায় না। বীরমল্ল নগণ্য দূত মাত্র। রাঠোররাজের আদেশ পালনই তার একমাত্র

BanglaBook.org

কর্তব্য। কাজেই ছবিটাকে আবার ভালো করে বেঁধে ছেদে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বীরমল্ল রওনা হলেন চিতোরের উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যাবেলায় বীরমল্ল হাজির হলেন চিতোর প্রাসাদে। রক্ষীরা যখন তাকে নিয়ে মহারানার কক্ষে উপস্থিত হল তিনি তখন প্রস্তুত হচ্ছেন মন্ত্রণাসভায় যাবার জন্য। বীরমল্ল তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে নিমন্ত্রণ পত্র আর সেই ছবি তাঁর কাছে তুলে দিয়ে করজোড়ে ব্যক্ত করলেন সব কথা। কুম্ভ সব কথা শুনে বললেন—'তোমার রাজাকে বলো তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করব আমি। বিবাহের দিন আমি যথা-সময়ে ঝালোয়ার প্রাসাদে পৌঁছে যাব। ঝালোয়ার রাজের কক্ষ থেকেও নিমন্ত্রণ পত্র এসে পৌঁছেছে আমার কাছে। আমার সঙ্গে যাবে পাঁচশত অশ্বারোহী। রাঠোররাজ যেন তাদের আহারের ব্যবস্থা করে রাখেন। তবে সময়াভাবে ছবিটা এখনই দেখা সম্ভব নয়। এটা আমি আমার কাছে রেখে দিলাম। দেখা হলে রাঠোররাজকে ফেরত পাঠিয়ে দেব।' এই বলে মহারানা তাঁর একজন পার্শ্বচরকে ডেকে বীরমল্লকে একশো স্বর্ণমুদ্রা দেবার নির্দেশ দিয়ে কক্ষ ছেড়ে মন্ত্রণাকক্ষের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন।

বীরমল্ল আর কিছু বলতে পারলেন না তাঁকে। স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করে বীরমল্ল আবার রওনা হলেন মান্ডোরের দিকে। আচ্ছাদিত অবস্থায় সেই ছবি রয়ে গেল মহারানার কক্ষে।

৬

বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল মহারানার। সূর্য তখন প্রায় মাথার উপর। সাধারণত ঘুম ভাঙতে এতটা দেরি হয় না মহারানার। আগের দিন সন্ধ্যা থেকে শেষরাত পর্যন্ত সীমান্ত-সমস্যা নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে জরুরি আলোচনা করেছিলেন মহারানা। মালব সীমান্তে কিছু গোলযোগ হচ্ছে। আলোচনা শেষ করে মহারানা যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিলেন তখন পূবের আকাশ লাল হতে শুরু করেছিল।

ঘুম ভাঙতেই কুম্ভ বুঝতে পারলেন বড্ড বেশি বেলা হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

তখনই তার চোখে পড়ল কক্ষের কোনায় রাখা রেশম বস্ত্রে মোড়া ছবিটা। মনে মনে ভাবলেন দরবার সাঙ্গ হলে দ্বিপ্রহরের আহারের পর ছবিটা নিয়ে দেখতে বসবেন তিনি। দেখতে হবে কেমন এঁকেছেন চিত্রকর, দেখতে হবে কাকে রানি করতে চলেছেন রাঠোররাজ।

কুম্ভ প্রস্তুত হতে শুরু করলেন স্নানে যাবার জন্য। দরজার বাইরে পর্দার আড়ালে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তাঁর ভৃত্য ও অঙ্গরক্ষকের দল। তাদের কথাবার্তার চাপা শব্দ কক্ষের ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছেন কুম্ভ। কক্ষের বাইরে পা রাখতেই অপেক্ষমান নারী-পুরুষের দল নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ করে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রণাম জানাল মহারানাকে। অলিন্দ দিয়ে তাদের নিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতে যেতেই হঠাৎ মহারানার চোখে পড়ল রানিমহলের এক দাসী অলিন্দের এক কোনায় করজোড়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রানিমহলের দাসী এসময় এখানে কেন! অন্যদের একটু দূরে সরে যেতে বলে তাকে ডাকলেন মহারানা। দাসী তাঁর সামনে এসে প্রণাম জানিয়ে যে-কথা বলল তাতে চমকে উঠলেন কুম্ভ। মহারানি মীরা আজ রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। কথাটা তাঁর কাছে এতটা আশ্চর্য লাগল যে নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে চাচ্ছিলেন না কুম্ভ। এতদিন পর...।

দাসীকে তিনি কী বলবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না মহারানা। কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি প্রকাশ করে সামনের দিকে পা বাড়ালেন।

গোমুখকুন্ডের জলে স্নান সারার পর সূর্যমন্ত্র জপ করার সময় রোজকার সেই মন্ত্র যেন মাথার মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছিল মহারানার। সূর্যস্তব শেষ করে পালকিতে চেপে তিনি যাত্রা করলেন দরবারের উদ্দেশ্যে। যাত্রাপথের দু-পাশে প্রতিদিনের মতো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে নগরবাসী প্রণাম জানাচ্ছে মহারানাকে। সেসব যেন কিছুই আজ নজরে পড়ল না মহারানার। শুধু কুম্ভশ্যাম মন্দিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার সে-দিকে তাকালেন তিনি।

দরবার কক্ষে বেশি ভিড়। বাদী-বিবাদী, সাক্ষী-দর্শক সবাই হাজির সেখানে। মহারানা সিংহাসনে গিয়ে বসতেই বিচার শুরু হল। ব্যাপারটা

BanglaBook.org

খুব গুরুতর। মহারানার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উদয়করন। যদিও সে উদা নামে বেশি পরিচিত। উদার স্বভাব চরিত্রের জন্য মাঝে মাঝেই বিব্রত হতে হয় মহারানাকে। বিভিন্ন অপরাধের জন্য বেশ কয়েকবার শাস্তি দিয়েছেন তিনি উদার সাঙ্গপাঙ্গদের। ভর্ৎসনা করেছেন উদাকেও। উদার দুই অনুচরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এক অল্পবয়স্কা বিধবার ওপর বল প্রয়োগ করেছে তারা। এ ব্যাপারে বসেছে বিচার সভা। মহারানা আগেই ঠিক করে রেখেছেন অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই দুই সঙ্গীকে কঠোর দণ্ড দিয়ে তিনি শিক্ষা দেবেন উদাকে। উদাও হাজির আছে দরবারে।

সওয়াল-জবাব চলতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই যেন মহারানার কাছ থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল সব কথা। মহারানা ভাবতে লাগলেন অন্য কিছু। তাঁর মন চলে গেল অন্যখানে। এক সময় বাদ-বিবাদ শেষ হল। সবাই অধীর আগ্রহে তাকাল মহারানার দিকে, মহারানা কী নির্দেশ দেন তা শোনার জন্য। মহারানার কিন্তু খেয়াল নেই সওয়াল-জবাব শেষ হয়ে গেছে। মাথা নীচু করে কী যেন ভাবছেন তিনি।

নিস্তব্ধ সভাঘর। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যাবার পর ব্যাপারটা মনে হয় কিছুটা আঁচ করতে পারলেন তাঁর পাশে বসা সেনাপতি। তিনি মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন মহারানা। সম্বিত ফিরল মহারানার। যদিও এতক্ষণ কী কথা হচ্ছিল কিছুই কানে যায়নি মহারানার। সেনাপতির ডাক শুনে মাথা তুলতেই মহারানার চোখ পড়ল দরবারের একপাশে বসে থাকা উদার ওপর। সেদিকে তাকিয়ে মহারানা শুধু বললেন—পঞ্চাশ ঘা বেত। এই বলে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু, পঞ্চাশ ঘা বেত কাকে? বল প্রয়োগ প্রমাণিত হয়েছে মনে করে রাজকুমারের সঙ্গীদের? নাকি, মিথ্যা অভিযোগের জন্য সেই বিধবাকে? নাকি, সঙ্গীদের আচরণের জন্য স্বয়ং রাজকুমারকেই বেত মারতে বললেন মহারানা!

দরবারের কেউই মহারানার নির্দেশ বুঝে উঠতে পারল না। আর কোনও কথা না বলে মহারানা দরবার কক্ষ ত্যাগ করলেন। দরবার থেকে প্রাসাদে ফিরে এসে আহার সেরে পালঙ্কে শুয়ে পড়লেন কুম্ভ। অন্যদিনে তাঁর এ সময় ঘুম আসে। সারা রাত তো জেগেই কাটাতে হয় তাঁকে। কিন্তু বিছানায় শোবার পর দু-চোখের পাতা আজ এক করতে পারলেন

BanglaBook.org

না কুম্ভ। মনের মধ্যে একই চিন্তা তাঁর ঘুরপাক খেতে লাগল। এতদিন পর আজ হঠাৎ মীরা কেন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। তাহলে এত দিন পর সে কি সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে? বুঝতে পেরেছে, ওই মূক-বধির পাথরের মূর্তির চেয়ে অনেক বেশি সত্য রক্তমাংসে গড়া মহারানার ভালোবাসা? নাকি জেগে উঠেছে তার উপবাসী শরীর? যে শরীরকে তৃপ্ত করার ক্ষমতা ওই কষ্টিপাথরের মূর্তির নেই।

কতদিন...মনে হয় এক যুগ হবে...মীরাকে নিজের বাহুবন্ধনে বন্দি করেননি মহারানা। আসলে কোনওদিন কোনও ব্যাপারে জোর করেননি কুম্ভ। মহারানার আরও বেশ কয়েকজন মহিষী আছেন। কিন্তু কুম্ভর সব সময় কেন যেন মনে হয় মীরা তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার চিন্তা-চাওয়া-পাওয়া সব কিছুই যেন বরাবরই অন্যরকম। সেই মীরা কি এত দিন পর আবার...। নিশ্চয় তাই। নইলে অন্য কোনও প্রয়োজনে তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হবার কথা নয় তার। মীরার যে-কোনও নির্দেশই তো মেনে চলেন প্রাসাদের অন্যান্যরা।

মীরার কথা বিভোর হয়ে ভাবতে ভাবতে এক সময় বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। সারাক্ষণ অন্ধকার। দূর থেকে ভেসে আসা চিতোরেশ্বরী মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে কুম্ভ বুঝতে পারলেন সেখানে সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে। হঠাৎ দ্বারের কাছে মৃদু শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে সেদিকে তাকিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন কুম্ভ। দ্বারের কাছে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক নারীমূর্তি। তাহলে সে কি উপস্থিত হল!

কুম্ভ প্রশ্ন করলেন, 'কে ওখানে?' নারীমূর্তির উত্তর শুনে কুম্ভর ভুল ভেঙে গেল। সে প্রাসাদের একজন দাসী। রোজকার মতো সে আজও মহারানার কক্ষে বাতি জ্বালাতে এসেছে। আজ এই অন্ধকার কক্ষই ভালো লাগছে মহারানার। তাই দাসীকে ফিরিয়ে দিলেন তিনি। তারপর আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামল। আকাশে চাঁদ উঠল। সেই চাঁদের আলো অলিন্দ বেয়ে খোলা দ্বারের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে কক্ষের ভিতর। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিলেন মহারানা। আর কতক্ষণ...।

ঠিক এমন সময় কক্ষের ভিতরে এসে প্রবেশ করলেন মীরা। কুম্ভ

BanglaBook.org

বিছানা ছেড়ে নীচে নেমে দাঁড়ালেন। রানির পরনে শুভ্র বস্ত্র। চাঁদের আলো তাঁর পিছন থেকে কক্ষে প্রবেশ করছে বলে তার মুখ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তবু মহারানা চেয়ে রইলেন সেদিকে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল এভাবে। এরপর মীরা মাটিতে ঝুঁকে পড়ে মহারানার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। তারপর একই জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কুম্ভ ভাবলেন এতদিন পর এভাবে হয়তো তার কাছে আসতে সংকোচ বোধ হচ্ছে রানির। তাই তিনি বললেন—'এতক্ষণ আমি তোমার প্রতীক্ষাতে ছিলাম। সংকোচ কোরো না। তুমি আজও আমার কাছে আগের মতোই আছ। আমি তোমার কাছে আজও মহারানা নই, শুধু কুম্ভ।' এই বলে কুম্ভ আবার পালঙ্কের ওপর বসলেন।

অন্ধকারের মধ্যেও কুম্ভ বুঝতে পারলেন এবার তাঁর দিকে মুখ তুলে চাইল মীরা। কুম্ভ ভাবলেন, এবার হয়তো সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁর কোলে, তারপর বাঁধ ভাঙা অশ্রুতে ভিজে যাবে তাঁর বুক। সারা রাত ধরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে কুম্ভ সান্ত্বনা দেবেন তাঁকে। মীরা কিন্তু এগিয়ে এলেন না, শুধু তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন কুম্ভ—'মহারানার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।'

'কী সেই কথা? তোমার যে-কোনও অনুরোধ রাখার জন্যই আজও আগের মতোই প্রস্তুত চিতোরেশ্বর। কিন্তু তুমি কি ওখানে দাঁড়িয়ে বলবে সেই কথা!' কুম্ভর এই কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন মীরা।

তারপর বললেন—'চিতোর ত্যাগ করে আমি কৃষ্ণভূমে চলে যেতে চাই মহারানা, দ্বারকাধীশই আমাকে ডাকছেন সেখানে। মহারানা আমাকে সেখানে যাবার অনুমতি দিন।' কক্ষের মধ্যে বজ্রপাত হলেও মনে হয় এতটা চমকে উঠতেন না মহারানা। তাঁর স্বপ্নের জাল মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল মীরার কথা শুনে। পালঙ্ক ছেড়ে নীচে নেমে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন তিনি। তারপর চিৎকার করে বলে উঠলেন—'দ্বারকাধীশই তোমার সব, আর তোমার স্বামী, সে কি কেউ নয়?'

'আমার সব কিছুই আজ পরমপ্রেমময় গিরিধারীর চরণে নিবেদিত'—উত্তর দিলেন মীরা।

BanglaBook.org

'যদি আমি তোমাকে চিতোর ত্যাগের অনুমতি না দিই? এই মুহূর্ত থেকে আটকে রাখি এই কক্ষে?'

'দেহকে আপনি আটকে রাখতে পারবেন মহারানা, মনকে নয়। দ্বারকাধীশের যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে তিনি আমাকে একদিন ঠিক নিয়ে যাবেন সেই পুণ্যভূমে'—শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন মীরা।

কুম্ভ আর কিছু উত্তর দিতে পারলেন না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি পালঙ্কের উপর বসে পড়লেন। এরপর কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন মীরা, তারপর মহারানার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করলেন।

মীরা চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ পালঙ্কে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন মহারানা। তারপর কক্ষ ত্যাগ করে প্রাসাদের নীচে নেমে একাই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। স্তম্ভ-চত্বরের দিকে। কুম্ভশ্যাম মন্দিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুধু তাঁর চোখে পড়ল একটা ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যাচ্ছে মন্দিরের ভিতর। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে তাকিয়ে ঘোড়ার গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

ক'দিন ধরে দরবারে বসেন না কুম্ভ। আত্মমগ্ন হয়ে নিজের কক্ষেই সারা দিন কাটান। মহামন্ত্রীকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। শুধু রাত্রিবেলা প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে বার হন তিনি। সোজা চলে যান স্তম্ভ-চত্বরে। সারারাত ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখেন। তারপর শেষ রাতে আবার প্রাসাদে ফিরে আসেন কুম্ভ। মীরার সঙ্গে সেই দিন সাক্ষাতের পর একাকিত্ব যেন আরও বেশি গ্রাস করেছে মহারানার মনকে। আরও একটা ব্যাপার কানে এসেছে কুম্ভর। যা মীরার ঘটনার পর আরও একবার ক্ষতবিক্ষত করেছে তাঁর হৃদয়কে। সে-ঘটনা হল মাস ছয়েক আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কুম্ভ। সেসময় এক বৈদ্য ব্রাহ্মণ কুম্ভর চিকিৎসার ভার নেন। কিন্তু তার ঔষধ সেবন করার পর থেকেই আরও যেন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকেন মহারানা। মন্ত্রীর সন্দেহ হয় ব্যাপারটাতে। শেষ পর্যন্ত তিনি ধরে ফেলেন যে ঔষধ সেবন করানোর নামে ধীরে ধীরে তাঁকে বিষ সেবন করাচ্ছিলেন ব্রাহ্মণ। মহারানা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। সেই দণ্ড কার্যকর করার জন্য দিন-

BanglaBook.org

দু-এক আগে যখন তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন মৃত্যুর আগে সে জানায় যে মহারানার চিকিৎসার অছিলায় তাঁকে বিষ প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং যুবরাজ উদয়করন। তাঁর দেওয়া বিষাধার স্বরূপ এক অঙ্গুরীয়ও ব্রাহ্মণ তুলে দেন সেনাপতির হাতে। ব্রাহ্মণের কথা যে মিথ্যা নয় তা অঙ্গুরীয় দেখে বুঝতে পেরেছেন কুম্ভ। কারণ, নাগোর রাজ্য জয় করে আসার পর মহারানা নিজ হাতে ওই অঙ্গুরীয় একদিন উপহার দিয়েছিলেন পুত্র উদাকে।

পুত্র উদা ছোটবেলা থেকেই উচ্ছৃঙ্খল, বেয়াদপ প্রকৃতির, তা বলে সে সিংহাসনের লোভে পিতাকে পর্যন্ত হত্যার চেষ্টা করতে পারে এতটা কল্পনা করতে পারেননি মহারানা। শিসোদা রাজপরিবারে এ-ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। ঘটনাটা শোনার পর এখনও অবশ্য তিনি উদাকে কিছু বলেননি। রাজপরিবারের কলঙ্ক যাতে বাইরে ছড়িয়ে না পড়তে পারে তাই ঘটনাটা তিনি গোপন রাখতে বলেছেন সেনাপতিকে। এই অমার্জনীয় অপরাধের সাজা অবশ্যই তিনি যুবরাজকে দেবেন। তবে তা দেবেন অন্য অছিলায়।

৭

সন্ধ্যাবেলায় নিজের কক্ষে একলা বসেছিলেন কুম্ভ। কিছুক্ষণ আগে দাসী এসে কক্ষে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। নিজের ক্ষতবিক্ষত মনটাকে একটু অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য কুম্ভ স্মরণ করছিলেন তাঁর ফেলে আসা যৌবনের কথা। বহু যুদ্ধের সফল রণনায়ক কুম্ভের দেহে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন আছে। সেইসব-চিহ্নগুলির উপর পরম মমতার হাত বোলাতে বোলাতে কুম্ভ চলে যাচ্ছিলেন অতীতের সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, যার সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে এইসব ক্ষতচিহ্ন, স্মরণ করাচ্ছে কুম্ভর শৌর্য-বীর্যের কথা।

ঠিক এমন সময় এসে উপস্থিত হলেন মহামন্ত্রী। কক্ষে প্রবেশ করার পর মহারানার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তিনি তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। মহামন্ত্রী নারায়ণ সিংহের বয়স কুম্ভর থেকে সামান্য বেশি হবে।

BanglaBook.org

ছেলেবেলায় এক সময় তিনি ছিলেন কুম্ভর খেলার সঙ্গী। কুম্ভ সিংহাসনে বসার পর তাঁকেই তিনি নির্বাচন করেন মহামন্ত্রী হিসাবে। সে নির্বাচনে কোনও ত্রুটি ছিল না। ছেলেবেলা থেকে আজও যে কুম্ভর প্রতি একই রকম বিশ্বস্ত। তাঁর হাতে চিতোর গড়ের ভার দিয়ে জীবনের অনেকটা সময় যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েছেন কুম্ভ। আজও চিতোরগড়ে তাঁর অবর্তমানে নারায়ণ সিংহই সবকিছু দেখভাল করেন। কুম্ভও তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান ও গুরুত্ব দেন।

নারায়ণ সিংহ তাঁর সামনে দাঁড়াতেই কুম্ভ বললেন—'আপনি আসন গ্রহণ করুন। তা হঠাৎ এ সময়ে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে নাকি? ভীলরা কি আবার খেপে উঠেছে?'

নারায়ণ সিংহ হেসে বললেন—'না না, সেসব কিছু নয় মহারানা। আসলে ক'দিন ধরে আপনি একলা কাটাচ্ছেন। তাই দরবারের কাজ শেষ হলে মনে হল—যাই একবার মহারানার সঙ্গে দেখা করে আসি। ধৃষ্টতা মাপ করবেন, মহারানা কি বিষণ্ণ?'

কুম্ভ বুঝতে পারলেন তিনি ধরা পড়ে গেছেন মহামন্ত্রীর কাছে। তাই তিনি মনের ভাব গোপন না করে বললেন—'যাঁর স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করতে চাচ্ছে, পুত্র সিংহাসনের লোভে হত্যা করতে চাচ্ছে তাঁর তো বিষণ্ণ থাকাটা স্বাভাবিক।'

কুম্ভর কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন নারায়ণ সিংহ। তারপর বললেন—'আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি মহারানা। কিন্তু আপনি এসব যত বেশি চিন্তা করবেন ততই বিষণ্ণতা আপনাকে গ্রাস করবে। যা আপনার আর চিতোরগড় উভয়ের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। জগৎ সংসারে এসব ঘটনা আপনি আমি না চাইলেও তা বিধাতা-পুরুষের নির্দেশে ঘটে চলে। আপনি বরং মনটাকে শান্ত করুন মহারানা। প্রয়োজনে মৃগয়া কিংবা অন্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করুন।'

নারায়ণ সিংহের কথা শুনে মহারানা বললেন—'কথাটা আপনি খারাপ বলেননি মন্ত্রী, দেখি কী করা যায়!' নারায়ণ সিংহ মহারানাকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় জানাতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল একটা ব্যাপার। যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা মানসিক অবস্থার কারণে এক'দিনের মধ্যে

BanglaBook.org

একবারের জন্যও মনে আসেনি মহারানার।

নারায়ণ সিংহ বললেন—'আর তিন দিন পর মান্ডোররাজের বিবাহের দিন। আপনি সেখানে উপস্থিত হবেন তো মহারানা?' কথাটা শুনে চমকে উঠলেন মহারানা।

তারপর বললেন—'দেখেছেন তো। আমি একেবারে ভুলতে বসেছিলাম ব্যাপারটা। আপনি স্মরণ না করিয়ে দিলে কী বিপত্তিটাই না হত! কী ভাবতেন মান্ডোররাজ! আমি অবশ্যই সেখানে যাব। মান্ডোররাজ তাঁর বিবাহে আমাকে অভিভাবকত্ব করার অনুরোধ জানিয়েছেন। পাঁচশো অশ্বারোহী আমার সঙ্গে যাবে ঝালোয়ার প্রাসাদে চন্দ্রকান্তের বিবাহবাসরে। আর একটা কথা, পিছোলা হ্রদের তীরে যে ভূখণ্ড আমি ভীলদের থেকে অধিকার করেছিলাম তা নবদম্পতিকে উপহার দিতে চাই আমি। আপনি তার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশনামা তৈরি করুন। এ ছাড়া দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাও আমি তাদেরকে উপহার দেব। যাত্রাকালে সব কিছু যেন তৈরি থাকে।'

'যে আজ্ঞে'—বলে মহারানাকে প্রণাম জানিয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন মন্ত্রী নারায়ণ সিংহ।

নারায়ণ সিংহ চলে যাবার পরই কুম্ভর মনে হল সেই ছবিটার কথা। ঘরের এক কোনায় আগের মতোই রাখা আছে ছবিটা। কুম্ভ সেখানে উঠে গিয়ে ছবিটা এনে রাখলেন পালঙ্কের উপর, তারপর খুলে ফেললেন ছবির আচ্ছাদন। বেশ কিছুক্ষণ ছবির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কুম্ভ। শিল্পরসিক কুম্ভ জীবনে বহু ছবি দেখেছেন, কিন্তু এত আশ্চর্য ছবি কোনওদিন দেখেননি। এ যেন ছবি নয়, রক্তমাংসে গড়া জীবন্ত নারীমূর্তি! চিত্রকরের তুলির টানে সিক্ত বসনার দেহের প্রতিটা খাঁজ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এমনকী চিবুক, ঘাড়, স্খলিত বক্ষ ও নাভিমূলের গায়ে আঁকা টলমল জলবিন্দুগুলোও যেন এখনই ঝরে পড়বে। তার মুখশ্রীও অদ্ভুত সুন্দর-দীর্ঘল চোখ, টিকালো নাক আর গোলাপের পাপড়ির মতো রক্তিম ঠোঁট। গালে তার পদ্মরাগের আভা। দেহবর্ণ কাঁচা সোনার মতো। সত্যিই কি কোনও নারী এত সুন্দর হতে পারে?

মনে মনে চন্দ্রকান্তর পছন্দের তারিফ করলেন কুম্ভ। আর তারিফ

BanglaBook.org

করলেন নাম-না-জানা সেই চিত্রকরের। যে তার রং আর তুলিতে বন্দি করেছে ঝুলকুমারীকে। ঝুলকুমারীর শরীরের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই যে চিত্রকর তাকে সিক্তবসনা রূপে এঁকেছেন তা বুঝতে অসুবিধা হল না অভিজ্ঞ কুম্ভর।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন কুম্ভ। তারপর পালঙ্ক থেকে নীচে নেমে ছবিটা উন্মুক্ত অবস্থাতেই দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। ভাবলেন কাল দিনের আলোতে আর একবার তিনি ভালো করে দেখবেন, তারপর সেটা পাঠিয়ে দেবেন মান্ডোরে। ছবিটা দেখার পর মনটা একটু ভালো হয়ে গেল কুম্ভর।

সেদিন আর স্তম্ভ পরিদর্শনে গেলেন না কুম্ভ। খাওয়া সেরে অনেকদিন পর রাতে নিজের পালঙ্কে শুয়ে পড়লেন তিনি। মাঝরাতে এক দুঃস্বপ্ন দেখলেন কুম্ভ। তাঁর পুত্র উদা তাঁকে ছুরি দিয়ে হত্যা করতে আসছে। তিনি কাছে আসতে নিষেধ করছেন কিন্তু ছুরি হাতে উদা ক্রমেই আরও কাছে এগিয়ে আসছে। এক সময় সে নিরস্ত্র কুম্ভর একদম কাছে এসে তাঁর বুক লক্ষ্য করে ছুরি চালাল। ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করে উঠলেন কুম্ভ। আর তারপরেই তাঁর ঘুমটা ভেঙে গেল।

কুম্ভ দেখলেন তিনি পালঙ্কে শুয়ে আছেন। ঘামে ভিজে গেছেন তিনি। রাত কত প্রহর হল ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। আবার তাঁর মনে ভিড় করে এল সেইসব চিন্তা—সিংহাসনলোভী কুচক্রী পুত্র উদার চিন্তা, চিতোর ত্যাগে ইচ্ছুক মীরার চিন্তা। এসব ভাবতে ভাবতে মাথা একসময় গরম হয়ে উঠল কুম্ভর। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করার পর উঠে বসলেন তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নজর পড়ল ছবিটার উপর।

কক্ষের মধ্যে একটা প্রদীপ জ্বলছে। তার আলো গিয়ে পড়েছে ছবিটার উপর। সেই আলোতে ঝুলকুমারীর ছবি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সিক্তবসনা ঝুলকুমারী যেন হাজির হয়েছে কুম্ভর শয়নকক্ষে। ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কুম্ভর দেহের ভিতর এক অন্যরকম অনুভূতি শুরু হয়।

তার মনে হল ওই গোলাপের মতো ওষ্ঠ, সিক্ত বস্ত্রের মধ্যে থেকে জেগে ওঠা ভারী স্তনযুগলের চন্দ্রমল্লিকার অস্ফুট কুঁড়ির মতো শীর্ষদেশ, ক্ষীণ কটিদেশের মধ্যভাগে সুগভীর নাভিমূল, উন্মুক্ত সিক্ত উরু—এ সবই

BanglaBook.org

যেন আহ্বান জানাচ্ছে তাঁকে। অন্যসব চিন্তা ধীরে ধীরে মুছে গেল কুম্ভর মন থেকে। জেগে রইল সেই নারী। সারারাত ধরে সেই ছবির দিকে চেয়ে বসে রইলেন। ভোরের প্রথম আলো যখন গবাক্ষের শ্বেতপাথরের জাফরির ফাঁক দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল তখন সম্বিত ফিরল কুম্ভর।

সেদিন ভোরেই স্নান সেরে নিলেন মহারানা। মেজাজটা তাঁর আজ হালকা লাগছে। মন থেকে সব হতাশা মুছে গেছে এক রাতে। দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজের মনে। তার একটা পূরণের জন্য স্নান সেরে ফিরে আসার পর তিনি নিজের কক্ষে ডাক পাঠালেন সেই দাসীকে, যে ক'দিন আগে মীরার সাক্ষাৎ করতে আসার খবর জানাতে এসেছিল মহারানাকে।

দাসী আসার পর কুম্ভ তাকে বললেন—'রানিকে বলো, তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন মহারানা। তবে তার শর্ত একটাই, কাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই তাকে ত্যাগ করতে হবে চিতোর গড়। নইলে চিতোর ত্যাগের সুযোগ হারাবেন তিনি।'

মহারানার বার্তা নিয়ে দাসী চলল কুম্ভশ্যাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে। দাসী চলে যাবার পর কুম্ভ এসে দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। বেশ ভালো করে দেখতে লাগলেন তাঁর ঝুলপিতে, পুরুষ্টু গোঁফে, চুলে ঠিক কতটা পাক ধরেছে। কিছুক্ষণ পর তিনি ডেকে পাঠালেন সেনাপতিকে।

পরদিন সন্ধ্যায় আকাশে সবে মাত্র চাঁদ উঠেছে। ঘড়-ঘড় শব্দে খুলে গেল দুর্গের বিশাল তোরণ। পঞ্চাশ জন সুশিক্ষিত অশ্বারোহী বার হল দুর্গ থেকে। তাদের সবার আগে ধবধবে সাদা ঘোড়ার পিঠে পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক পরা মহারানা কুম্ভ। ঘোড়ার খুরের শব্দে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সর্পিল গিরিপথ বেয়ে দ্রুত বেগে নীচে নামতে শুরু করল সেই অশ্বারোহী সেনাদল।

BanglaBook.org

৮

কুম্ভমেরু। গাছপালা খাড়া পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত ভয়ংকর দুর্গ। দিবারাত্রি খোলা তরবারি হাতে পাহারা দেয় রক্ষীদল। মহারানা কুম্ভর

নির্দেশ ছাড়া স্বয়ং মৃত্যু-দেবতাও নাকি প্রবেশ করতে পারে না সেই দুর্গে। কোনও পথিক যদি পথ ভুলে চলে আসে দুর্গ প্রাকারের কাছাকাছি সঙ্গে সঙ্গে পাহারাদার রক্ষীদের কর্কশ চিৎকার শোনা যায়—'তফাত যাও'। আর সেই নির্দেশ না শুনলে পরমুহূর্তেই দুর্গ প্রাকারের ওপর থেকে নেমে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত তির।

সেই পাষাণপুরীতে বন্দি এক রাজকন্যা। তাঁর নাম ঝুলকুমারী। তাকে হরণ করে কুম্ভমেরুতে বন্দি করে রেখেছেন মহারানা কুম্ভ। মুক্তির শর্ত একটাই, বিবাহ করতে হবে মহারানা কুম্ভকে। কিন্তু জীবন থাকতে মহারানার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারবেন না রাজকুমারী। তার চেয়ে ঘাগরার মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছুরি বসিয়ে দেবেন নিজের বুকে। এ কাজটা হয়তো আরও আগেই করে ফেলতেন ঝুলকুমারী। কিন্তু করতে পারেননি একজনের কথা ভেবে।

দিনের বেলা দুর্গর শীর্ষদেশে দাঁড়ালে দূরে চোখে পড়ে এক প্রাসাদের চুড়ো। ঝুলকুমারী জানেন সেই প্রাসাদে আজও তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছেন একজন। হতে পারে তিনি নামেই রাজা, আসলে তাঁর পিতা ঝালোয়ার-রাজের মতো সামান্য ভূ-স্বামী মাত্র। তবুও তাঁকেই তিনি দেহ-মনে বরণ করে নিয়েছেন নিজের স্বামী রূপে। মহারানা কুম্ভর মতো বিশাল সাম্রাজ্যের পরিধি হয়তো তার নেই, কিন্তু তাঁর ভালোবাসা? সে শত সাম্রাজ্যের অনেক অনেক বেশি দামি। তাঁর কথা ভেবে আজও নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর বাগদত্তা। মহারানার শত প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি সম্মত হননি তাঁর প্রস্তাবে।

রাজকুমারীর দেহ-মনও আস্তে আস্তে ভেঙে পড়েছে, সারাদিন অন্ধকার কক্ষে কাটাবার ফলে চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে আসছে। তবুও নিজের ভালোবাসায় অবিচল ঝুলকুমারী। হয়তো কোনওদিন তিনি এসে দাঁড়াবেন তাঁর সামনে, তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন এই পাষাণপুরী থেকে।

সূর্য ডোবার পর চারপাশে যখন অন্ধকার নেমে এল পাথুরে মেঝের থেকে উঠে দাঁড়ালেন ঝুলকুমারী। কক্ষের কোনায় গিয়ে চকমকি পাথর ঠুকে জ্বালালেন পিতলের সেই বিরাট প্রদীপটা। তারপর সেই জ্বলন্ত প্রদীপ

BanglaBook.org

মাথার উপর তুলে ধরে কক্ষ ত্যাগ করে ধীর পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলেন দুর্গের মাথায়। সেখানে ওঠার পর প্রতিদিনের মতোই সেই প্রদীপ স্থাপন করলেন দুর্গের শীর্ষবিন্দুতে। কুম্ভমেরুতে আসার পর প্রতি রাতে এমনভাবে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন ঝুলকুমারী। যাতে কিছুদূরে মান্ডোর প্রাসাদে তাঁর প্রতীক্ষায় রাঠোররাজ এই দীপ শিখা দেখে বুঝতে পারেন এখনও জীবিত আছে তাঁর বাগদত্তা, এখনও সে আত্মসমর্পণ করেনি চিতোরেশ্বর মহারানা কুম্ভর কাছে।

প্রদীপটা রেখে সেদিনও দূরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন ঝুলকুমারী। ওই অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক ছোট্ট প্রাসাদে তাঁরই কথা চিন্তা করছেন এক নিঃসঙ্গ অসহায় মানুষ। দুজনের মধ্যে ব্যবধান কত কাছের, অথচ কত দূরের। কুম্ভমেরু থেকে মান্ডোর প্রাসাদের দূরত্ব কয়েক যোজন, কিন্তু মহারানা কুম্ভর ইচ্ছায় সে-পথের ব্যবধান সহস্র যোজনেরও বেশি।

কয়েকদিন পর মনে হয় অমাবস্যা। আকাশে শুধু সরু এক ফালি চাঁদ অসহায়। অন্যদিন প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত এমনিই দূরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রাঠোররাজের কথা চিন্তা করেন ঝুলকুমারী। কিন্তু প্রতিদিনই তাঁর জীবনশক্তি যেন কমে আসছে। ক'দিন ধরে ভালো করে দাঁড়াতে পারছেন না তিনি। তাই কিছুক্ষণ দুর্গশীর্ষে দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে অন্ধকার রুক্ষ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আবার নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন ঝুলকুমারী। পাথুরে মেঝেতে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলেন নিজের ভাগ্যের পরিহাসের কথা, রাঠোররাজ চন্দ্রকান্তর কথা।

হঠাৎ কক্ষের বাইরে ক্ষীণ পদশব্দ শোনা গেল। ফুটে উঠল মৃদু আলোকরেখা। তাই দেখে উঠে বসলেন ঝুলকুমারী। মনে মনে ভাবলেন— তাহলে সে কি আজ সত্যিই এসেছে! এসেছে তাঁর প্রিয়তমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য! কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঝুলকুমারীর সে ভুল ভেঙে গেল। কক্ষের বাইরে অলিন্দ বেয়ে সেই আলোর রেখা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে এগিয়ে এসে স্থির হল কক্ষের প্রবেশপথের সামনে।

ঝুলকুমারী দেখলেন দ্বারের সামনে মশাল হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন মহারানা কুম্ভ। দীর্ঘদেহী কুম্ভর ছায়া এসে পড়েছে কক্ষের শেষ প্রান্তে

BanglaBook.org

যেখানে ঝুলকুমারী বসে আছেন সেই পর্যন্ত। তাঁকে দেখা মাত্রই চমকে উঠলেন ঝুলকুমারী। হাতের স্পর্শ দিয়ে অনুভব করে নিলেন তাঁর কোমরে লুকানো ছুরিটা ঠিক স্থানে আছে কিনা। সেরকম হলে মহারানা কক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে স্পর্শ করার আগেই তিনি তীক্ষ্ণ ছুরি বসিয়ে দেবেন নিজের বুকে। প্রাণ থাকতে কুম্ভর আলিঙ্গনে বন্দি হবেন না ঝুলকুমারী।

কুম্ভ কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না। সেখানে দাঁড়িয়েই মশালের আলোটা উঁচু করে তুলে ধরলেন। যাতে সেই আলোকরশ্মি গিয়ে পড়ে কক্ষের শেষ প্রান্তে এক কোনায় বসে থাকা ঝুলকুমারীর দেহে।

বেশ কয়েক মুহূর্ত মশালের আলোকে ঝুলকুমারীকে নিরীক্ষণ করার পর কুম্ভ বললেন—'তুমি কি তোমার মত পরিবর্তন করেছ রাজকুমারী?' ঝুলকুমারী কোনও উত্তর দিলেন না। মাথা নীচু করে বসে রইলেন। কুম্ভ এবার বললেন—'তোমার কোনওদিন কোনও অমর্যাদা হতে দেব না রাজকুমারী। রাজদরবারে আমার সিংহাসনের পাশে যে সিংহাসনে একদিন মহারানি মীরা বসতেন সেই সিংহাসনেই তোমাকে বসাব আমি। তোমার গর্ভে যদি পুত্রসন্তান জন্মায় তাহলে সে-ই হবে চিতোরের রাজসিংহাসনের মালিক। তুমি শুধু একবার সম্মত হও আমার প্রস্তাবে।'

কথাগুলো বলার সময় অনুরোধের সুর ফুটে উঠল মহারানার কণ্ঠে। তাঁর কথা শুনে ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালেন ঝুলকুমারী। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—'আমাকে প্রলোভন দেখাবেন না মহারানা, রাঠোররাজ ছাড়া অন্য কারো গলায় বরমাল্য দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'যদি আমি তোমাকে জোর করি?'—প্রশ্ন করলেন কুম্ভ।

'জোর করে হয়তো আপনি আমার দেহ পেতে পারেন মহারানা, কিন্তু মন নয়। সে মন আমি সমর্পণ করেছি রাঠোররাজকে। মন বিনা দেহ পেয়ে আপনি কী করবেন মহারানা! সে তো মৃতদেহেরই সামিল।'

ঝুলকুমারীর কথা শুনে একটু চমকে উঠলেন মহারানা। কিছুদিন আগে এক রাতে চিতোর প্রাসাদে ঠিক একই রকম কথা মহারানা শুনেছিলেন আরও এক নারীর মুখ থেকে—'দেহকে আপনি আটকে রাখতে পারবেন মহারানা, মনকে নয়।'

BanglaBook.org

ঝুলকুমারীর কথা শুনে হঠাৎই যেন মহারানার মনে পড়ে গেল তাঁর কথা। কিছু যেন চিন্তা করলেন মহারানা। তারপর ঝুলকুমারীর উদ্দেশ্যে বললেন—'মহারানি মীরা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে আমাকে ত্যাগ করেছেন, পুত্র উদা সিংহাসনের লোভে আমাকে হত্যা করতে চায়। আমি আজ বড় নিঃসঙ্গ। তুমি আমাকে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি দাও রাজকুমারী।'

মহারানার কণ্ঠে এবার স্পষ্ট বেদনার সুর ফুটে উঠল। হয়তো তা কয়েক মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করল ঝুলকুমারীর মনকেও।

ঝুলকুমারী বললেন—'আপনার বেদনা আমি অনুভব করতে পারছি মহারানা। কিন্তু আমি নিরুপায়। মহারানা আমাকে ক্ষমা করুন।'

ঝুলকুমারীর কথা শুনে মহারানার কণ্ঠে ক্ষোভ আর হতাশা ঝরে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন—'কী আছে ওই রাঠোররাজের কাছে? তারচেয়ে আমি ধনে, মানে, জ্ঞানে, বিদ্যায় অনেক বড়। তবুও তুমি...।'

ঝুলকুমারীর মুখে ফুটে উঠল ম্লান হাসি। তিনি বললেন—'তা আমি জানি মহারানা। কিন্তু তার কাছে এমন এক জিনিস আছে যা অন্য কারও কাছে নেই।'

'কী তা! যা স্বয়ং চিতোরেশ্বর কুম্ভর কাছেও নেই!'—একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন কুম্ভ।

'সে আমার প্রেম'—মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলেন ঝুলকুমারী।

কুম্ভ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর কথা শুনে। তারপর ধীর পায়ে হাঁটা শুরু করলেন অন্যদিকে। আবার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল কক্ষ। তার মধ্যে বসে ঝুলকুমারী আবার ভাবতে শুরু করলেন রাঠোররাজের কথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকদণ্ডি বেয়ে নীচে নেমে যাওয়া ঘোড়ার খুরের শব্দে দুর্গের সবাই বুঝতে পারল কুম্ভমেরু ত্যাগ করে মহারানা রওনা হলেন চিতোরের দিকে।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় মান্ডোর প্রাসাদের ছাদে উঠে দূরে অন্ধকারের মধ্যে জেগে থাকা আলোক বিন্দুর দিকে চেয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত। আজ প্রায় তিন মাস হয়ে গেল প্রতি রাতেই রাঠোররাজ এমনই ভাবে চেয়ে থাকেন কুম্ভমেরুর দিকে। তারপর রাত কেটে গিয়ে যখন পূর্বের আকাশ লাল হতে শুরু করে, ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় ওই দীপশিখা, তখন ছাদ থেকে

BanglaBook.org

নীচে নেমে আসেন রাঠোররাজ। সারাটা দিন একলা বসে চিন্তা করেন দূরের ওই পাষাণপুরীতে বন্দি তাঁর বাগদত্তার কথা, তার ভাগ্যের পরিহাসের কথা। কখনও বা একাকী রোমন্থন করেন চন্দ্রালোকে ঝালোয়ার প্রাসাদে অভিসারের সুখস্মৃতি।

তারপর এক সময় দিন কেটে গিয়ে সূর্য পশ্চিমে ঢলতে শুরু করে। চন্দ্রকান্ত অধৈর্য হয়ে ওঠেন কখন সন্ধ্যা নামবে, কখন ওই দূরের অন্ধকারের মধ্যে তার প্রেমের দীপশিখা জ্বলে উঠবে বলে। এভাবেই দিন কাটে রাঠোররাজের। রাঠোররাজ দূরের আলোকবিন্দুর দিকে চেয়ে ভাবছিলেন নিজের অসহায়তার কথা। তিনি সামান্য ভূস্বামী মাত্র। কীভাবে তিনি মৃত্যুপুরী থেকে উদ্ধার করে আনবেন তাঁর প্রিয়তমাকে! উদ্ধার তো দূরের কথা, ওই পাষাণপুরীতে কেমনভাবে দিন কাটাচ্ছে রাজকুমারী সে খবর পাওয়াও দুষ্কর। তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে জলে ভিজে উঠল রাঠোররাজের দু-চোখ। ঠিক এমন সময় খস খস শব্দ শুনে পিছনে ফিরে তাকালেন রাঠোররাজ। দেখলেন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বীরমল্ল। তাকে দেখে চন্দ্রকান্ত বুঝতে পারলেন নিশ্চয় কোনও সংবাদ আছে। চোখের জল মুছে বীরমল্লকে তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—'তাঁর কি কোনও সংবাদ পেলেন আপনি?'

বীরমল্ল বললেন, 'না রাঠোররাজ। তবে আমার কাছে অন্য সংবাদ আছে—মহারানা চিতোরে যে স্তম্ভ নির্মাণ করাচ্ছিলেন তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর তিনদিন পর সেই স্তম্ভ দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে চলেছেন মহারানা। সেই দিন চিতোরে যে উৎসব হবে তা উপলক্ষ্যে আগের দিন রাতে অধিকাংশ রক্ষীই কুম্ভমেরু ত্যাগ করে এক রাতের জন্য চিতোরে উপস্থিত হবে। সে সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। আপনাকে মুক্ত করে আনতে হবে ঝালোয়ার কন্যাকে।'

রাঠোররাজ বললেন—'বিশাল ওই দুর্গে কোথায় তিনি বন্দিনী আমার তো তা জানা নেই। তাঁর সন্ধান আমি কীভাবে পাব! তাঁকেও তো প্রস্তুত থাকতে হবে আমার জন্য। কিন্তু কীভাবে তিনি পাবেন সেই খবর?'

বীরমল্ল বললেন, 'সে ব্যবস্থাও আমি ভেবে রেখেছি। আপনি শুধু আমাকে এমন একটা পায়রা দিন যে কুম্ভমেরু থেকে পথ চিনে উড়ে

BanglaBook.org

আসতে পারবে মান্ডোর প্রাসাদে। আপনার বার্তা আপনি তার পায়ে বেঁধে দিন। আমি সে পায়রা পৌঁছে দেব রাজকুমারীর কাছে। কুম্ভমেরু থেকে মান্ডোরে ফিরবার সময়ে সে-ও নিশ্চয়ই বহন করে আনবে রাজকুমারীর বার্তা।'

চন্দ্রকান্ত বললেন—'কিন্তু সেই পায়রা আপনি তাঁর কাছে পৌঁছোবেন কী করে?'

বীরমল্ল বললেন, 'আমি কাল কুম্ভমেরুতে উপস্থিত হব বণিকের ছদ্মবেশে। চিতোরের উৎসবে যোগ দিতে যাবার জন্য রক্ষীদের সাজ-পোশাক অলঙ্কার ইত্যাদি কেনার প্রয়োজন আছে। কয়েকদিন ধরেই বেশ কয়েকজন বণিক দুর্গে প্রবেশ করেছে এইসব বিক্রির জন্য। তাদের দলের সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করব আমি।'

রাঠোররাজ বললেন—'বেশ, কাল প্রত্যুষে আমি আপনার হাতে তুলে দেব চিঠি আর পায়রা। এ কাজে যদি আপনি সফল হন তাহলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব আমি।' এই বলে গভীর আবেগে রাঠোররাজ জড়িয়ে ধরলেন বীরমল্লর হাত।

সারারাত জেগে ঝুলকুমারীর উদ্দেশ্যে চন্দ্রকান্ত লিখলেন মর্মস্পর্শী চিঠি। তাঁর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠল রাজকুমারীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসার কথা, বিরহযন্ত্রণার কথা। লিখলেন তাঁর অসহায়তার কথা, লিখলেন ঝুলকুমারী যেন প্রস্তুত থাকেন, কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে আসবেন রাঠোররাজ।

BanglaBook.org

৯

পরদিন ভোরে রাঠোররাজ বীরমল্লর হাতে তুলে দিলেন একটা সাদা পায়রা। তার ডানার নীচে লুকানো রইল ঝুলকুমারীর উদ্দেশ্যে লেখা সেই চিঠি। বীরমল্ল তা নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বণিকের ছদ্মবেশে রওনা হলেন কুম্ভমেরুর দিকে।

তখন বিকাল। দিনান্তে সূর্যের রক্তিম আভা এসে পড়েছে ঝুলকুমারীর

কক্ষের সামনের অলিন্দে। আর কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার নামবে। ঝুলকুমারীকে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে যেতে হবে দুর্গশীর্ষে। কিন্তু আজই হয়তো শেষ দিন। শরীর ভেঙে পড়েছে রাজকুমারীর, ভালো করে দাঁড়াতে পারছেন না তিনি। অতএব ভারী পিতলের জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে দুর্গশীর্ষে হয়তো আর ওঠা হয়ে উঠবে না ঝুলকুমারীর। তাঁর পরমায়ু বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে। কক্ষে বসে প্রদীপ জ্বালাবার জন্য সলতে পাকাচ্ছিলেন ঝুলকুমারী।

শেষ বিকেলের বিষণ্ণ আলো তাঁর মুখে। কোথায় গেল তার সেই অপরূপ সৌন্দর্য। তার চোখ কোটরগত, গালের রক্তিম আভা উধাও হয়ে রক্তহীন ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে, জট পড়েছে তাঁর রেশমের মতো চুলে, কণ্ঠার হাড় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিনের আলোতে কোনওদিন তাঁর কক্ষে আসেননি মহারানা। এলে হয়তো তাঁকে বিবাহের বাসনা এখনই ত্যাগ করতেন। এই পাষাণপুরী শুষে নিয়েছে রাজকুমারীর সব সৌন্দর্য। দেহের ভিতর প্রাণটা শুধু অতি কষ্টে টিকে আছে। কাঁপা কাঁপা হাতে সলতে পাকাতে পাকাতে একটা কথা শুধু ভাবছিলেন ঝুলকুমারী—মৃত্যুর আগে একবারের জন্যও কি সে এসে দাঁড়াবে না আমার সামনে?

হঠাৎ একটা ঝট পট শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালেন ঝুলকুমারী। দেখলেন কক্ষের সামনে অলিন্দে এসে বসেছে একটা সাদা পায়রা। এতে অবাক হলেন রাজকুমারী। কুম্ভমেরুতে কোনও পায়রা নেই। বাজপাখির ভয়ে একটা চড়ুই পাখি পর্যন্ত প্রবেশ করে না এই দুর্গে। তাহলে পায়রা কীভাবে এল? সে কি পথ ভুলে প্রবেশ করেছে এই মৃত্যুপুরীতে?

ঝুলকুমারী দেখলেন সে খালি ডানা ঝাপটাচ্ছে, কিন্তু উড়তে পারছে না। সে-ও কি তবে ঝুলকুমারীর মতো এই পাষাণপুরীতে বন্দিনী? বাঁধা আছে তার ডানা? 'তবে তাকে ডানা খুলে মুক্ত করে দিই আকাশে। নইলে এই মৃত্যুপুরীতে সে-ও আর বেশি দিন বাঁচবে না।'

তাকে মুক্ত করার জন্য রাজকুমারী অতিকষ্টে অলিন্দে এসে ধরে ফেললেন পায়রাটাকে। রাজকুমারী দেখলেন তিনি যা ভেবেছেন ঠিক তাই। পায়রার ডানা দুটো বাঁধা। রাজকুমারী তার বাঁধন খুলতে যেতেই চোখে পড়ল তার পালকের নীচে সযত্নে বাঁধা আছে একটা ভাঁজ করা কাগজের

BanglaBook.org

টুকরো। সেটা দেখা মাত্রই তিনি পায়রাটাকে নিয়ে অলিন্দ ছেড়ে ভিতরে প্রবেশ করে দ্বারের আগল টেনে দিলেন। তারপর জ্বালালেন প্রদীপ। আলোকিত হয়ে উঠল কক্ষ। কাগজের টুকরোটা নিয়ে তার ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন তিনি। আর তার পরেই চমকে উঠলেন। এ যে রাঠোররাজের হস্তাক্ষর। চিঠিটা বুকে জড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর পড়তে শুরু করলেন সেই চিঠি।

চোখের জলে ভেসে যেতে লাগল তার বুক। চিঠি পড়া শেষ হলে রাজকুমারী চোখের জল মুছে ভাবতে বসলেন কীভাবে রাঠোররাজের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখবেন তিনি? তার কাছে তো কাগজ, কালি, লেখনী কিছুই নেই! কিছুক্ষণ ভাববার পর ঝুলকুমারী একটা উপায় বার করলেন। কোমর থেকে ছুরি বার করে রাজকুমারী চিরে ফেললেন তার বুক। টপ টপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল সেখান থেকে। ছুরির ডগাতে সেই রক্ত নিয়ে ঝুলকুমারী রাঠোররাজের চিঠির ওপরে বড় বড় হরফে লিখলেন গুটি কয় কথা—'জীবন মরণে আমি তোমারই থাকব রাঠোররাজ। মহারানা কোনওদিনই পাবে না আমাকে। আমৃত্যু ঝুলকুমারী তার প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় থাকবে।'

চিঠি লেখা শেষ হলে সেই চিঠি আবার বেঁধে দিলেন পায়রার ডানার ভিতরে। ঝুলকুমারী এরপর পায়রাটাকে কক্ষের ভিতরে রেখে ঝুলন্ত প্রদীপ মাথায় তুলে নিয়ে টলমল পায়ে চললেন দুর্গের ছাদে। আজ তার বড্ড দেরি হয়ে গেছে। রাঠোররাজ নিশ্চয় মান্ডোর প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে ওই প্রদীপশিখা দেখার জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

পরদিন ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল ঝুলকুমারীর তখন গবাক্ষ দিয়ে ভোরের আলো এসে প্রবেশ করেছে কক্ষে। সেই আলোকেরশ্মি দেখে বাইরের খোলা আকাশে উড়ে যাবার জন্য ডানা ঝাপটাচ্ছে পায়রাটা। ঝুলকুমারী উঠে বসতে গেলেন কিন্তু তাঁর দেহে যেন শক্তি নেই। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর উঠে বসলেন তিনি, তারপর এক সময় উঠে দাঁড়ালেন। পায়রাটাকে নিয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে দ্বারের আগল খুলে অতি কষ্টে উপস্থিত হলেন অলিন্দে। মাথার উপর চোখে পড়ল সুনীল আকাশ।

অনেকদিন পর এমন নীল আকাশ দেখলেন ঝুলকুমারী। মনে হল

BanglaBook.org

সে যেন হাতছানি দিচ্ছে তাঁকে। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না তিনি। তাঁর শরীরের সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে আসছে। বাঁধন খুলে দিয়ে তিনি নীল আকাশের বুকে উড়িয়ে দিলেন পায়রাটা। ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাথার উপর আকাশে এক পাক খেয়ে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল সে। কোনওরকমে তাঁর শীর্ণ দেহটা নিয়ে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ঝুলকুমারী।

মান্ডোর প্রাসাদে ফিরে যাবে বলে দিক নির্ধারণের জন্য যখন কুম্ভমেরুর মাথায় পাক খাচ্ছিল পায়রাটা, তখন এক ছোট্ট ঘটনা ঘটল। দুর্গের এক রক্ষী প্রতিদিনের মতো সেদিনও খুলে ছিল শিকারি বাজের খাঁচা। কুম্ভমেরুর আকাশে পায়রাটাকে উড়তে দেখে বাজ তাড়া করল তাকে। কোনওরকমে পায়রাটা বাজের হাত থেকে রক্ষা পেল ঠিকই। কিন্তু পালাতে গিয়ে দিক ভুল করে ফেলল সে। মান্ডোরের দিকে না গিয়ে সে সোজা উড়ে গেল চিতোরের দিকে। ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে সে আশ্রয় নিল চিতোর গড়ের সবচেয়ে উঁচু স্থান, একেবারে কুম্ভ-নির্মিত স্তম্ভের শীর্ষদেশে।

দ্বিপ্রহরে পাত্র-মিত্র সভাসদ পরিবৃত হয়ে মহারানা মনে মনে এ স্তম্ভের নাম ঠিক করে রাখলেন—'বিজয় স্তম্ভ'। কুম্ভর মন আজ খুশিতে ভরে উঠেছে। তাঁর স্বপ্ন আজ বাস্তবের রূপ নিয়েছে। চিতোর গড়ের আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তাঁর স্বপ্নের সৌধ, মহারানার অক্ষয়কীর্তি। যা মৃত্যুর পরেও অমর করে রাখবে মহারানা কুম্ভকে। হাজার বছর পরেও মানুষ এই স্তম্ভর নীচে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে কুম্ভর উদ্দেশ্যে।

স্তম্ভ-চত্বরে দাঁড়িয়ে পরদিন যে যজ্ঞানুষ্ঠান হবে সে বিষয়ে সভাসদদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন মহারানা। মাঝে মাঝে হাসি তামাসাও করছিলেন তার সঙ্গীদের সঙ্গে।

ঠিক সেই সময় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে স্তম্ভর মাথায় এসে বসল সেই পায়রাটা। মহারানা তাকে দেখতে পেয়ে বললেন—'এ আবার কোথা থেকে এল!' মহারানার কথা শুনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিদূষক বললেন—'ও মনে হয় স্বয়ং ধর্মরাজ, পায়রার রূপ ধরে আপনাকে আশীর্বাদ জানাতে এসেছেন।'

BanglaBook.org

মহারানা তার কথা শুনে বললেন—'দেখবেন, কাল যখন আমি যজ্ঞ করতে বসব তখন উনি আবার ওপর থেকে আশীর্বাদস্বরূপ আমার মাথায় বিষ্ঠা ত্যাগ না করেন।'

মহারানার রসিকতায় সভাসদদের দল হেসে উঠলেন।

আরও কিছুক্ষণ সভাসদ-পরিবৃত হয়ে মহারানা দাঁড়িয়ে রইলেন সেই স্থানে। কাল ভোর থেকেই চিতোরবাসীরা মেতে উঠবে উৎসবে। স্তম্ভ-চত্বরেও প্রচুর লোক সমাগম হবে। মহারানা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা কাল তিনি দান করবেন গরিব-দুঃখীদের। কী কী কাজ বাকি আছে সেসব আলোচনা তিনি সেরে নিলেন মন্ত্রীদের সঙ্গে।

তারপর স্তম্ভ-চত্বর ত্যাগ করে ঘোড়ার পিঠে চেপে ফিরে চললেন প্রাসাদের দিকে। পথে পড়ল কুম্ভশ্যাম মন্দির। একটা নিঃসঙ্গ ময়ূর শুধু বসে আছে তার প্রাচীরের ওপর। কয়েক মুহূর্তের জন্য সেখানে থামলেন কুম্ভ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার রওয়ানা হলেন প্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

প্রাসাদে ফিরে নিজের শয়নকক্ষের পালঙ্কে শুয়ে কী কী কাজ বাকি রয়ে গেল তা চিন্তা করতে লাগলেন মহারানা। একটা জরুরি কাজ অবশ্য বাকি আছে মহারানার। আজ রাতে তিনি যাবেন কুম্ভমেরুতে। শেষ বারের মত তিনি ঝুলকুমারীকে প্রশ্ন করবেন, তিনি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত কিনা। যদি তিনি সম্মত হন তাহলে তিনি আজই সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন চিতোরে। আর যদি তিনি সম্মত না হন তাহলে তাঁকে মুক্তি দেবেন কুম্ভ। তাঁকে আর জোর করে ধরে রাখবেন না মহারানা।

নিজের জীবনে আর কোনও কলঙ্ক রাখতে চান না কুম্ভ। সব কিছু তিনি আজ মুছে ফেলতে চান। এমনকী মীরার প্রতিও তাঁর আজ আর কোনও রাগ ক্ষোভ নেই। হয়তো সে আজ চিতোরে থাকলে ভালো হত। কুম্ভশ্যাম মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য এ কথাটাই মনে এসেছিল কুম্ভর। কুম্ভ স্থির করেছেন, যে-ক'টা দিন তিনি আর বাঁচবেন সে-ক'টা দিন তিনি অতিবাহিত করবেন চিতোর গড়ের মানুষের কল্যাণে। যাতে মহারানা হাম্বীরের মতো চিতোর গড়ের মানুষের হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যায়

BanglaBook.org

তার নাম।

পালঙ্কে শুয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন মহারানা কুম্ভ। যখন তাঁর ঘুম যখন ভাঙল তার অনেক আগেই সন্ধ্যা নেমে গেছে। ঘুম ভাঙার পর তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে শুরু করলেন দুর্গ ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য।

১০

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই মান্ডোর প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে কুম্ভমেরুর দিকে পায়রা আসার প্রতীক্ষা করেছিলেন রাঠোররাজ চন্দ্রকান্ত। কিন্তু এক সময় সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল কিন্তু পায়রা ফিরে এল না। তাহলে কি ঝুলকুমারী বার্তা পাঠালেন না! নাকি পথ ভুল করল পায়রা! এমন তো হবার কথা নয়। রাঠোররাজের মন ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠল। এক সময় শেষ বিকালের লাল আলোটুকুও মুছে গেল আকাশের বুক থেকে। রাঠোররাজ বুঝতে পারলেন তাঁর পায়রা আর ফিরবে না।

অন্ধকার নেমে আসার পরও রাঠোররাজ তাকিয়ে রইলেন কুম্ভমেরুর দিকে। প্রতিদিনের মতো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে ওই বুঝি কুম্ভমেরুর শীর্ষে জ্বলে উঠল সেই অনির্বাণ দীপশিখা। কিন্তু সেদিন কোনও আলো জ্বলে উঠল না কুম্ভমেরুতে। অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করার পর এক সময় চন্দ্রকান্ত ছাদ থেকে নীচে নেমে এলেন। তারপর পোশাক পালটে প্রবেশ করলেন প্রাসাদেরই এক কক্ষে। সেখানে দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো আছে বিভিন্ন রকমের তরবারি। এসব অস্ত্র কোনও দিন ব্যবহার করেননি চন্দ্রকান্ত। কারণ তিনি কোনওদিন যুদ্ধেই যাননি। জীবন কাটিয়েছেন তিনি পায়রা উড়িয়ে, কাব্য আর সঙ্গীত চর্চা করে। তরবারি ধরার কোনও প্রয়োজন হয়নি তার, দেওয়ালে ঝোলানো অস্ত্রগুলো তাঁর পিতা পিতামহের-আমলের।

এক সময় চিতোরের রানাদের হয়ে এসব অস্ত্র-হাতেই যুদ্ধে যেতেন

BanglaBook.org

তাঁরা। দীর্ঘ দিনের অব্যবহারের ফলে তাতে মরচে ধরে গেছে। তারই একটা খুলে নিয়ে কোমরে বেঁধে নিঃশব্দে প্রাসাদ ছেড়ে ঘোড়ায় চেপে চন্দ্রকান্ত রওনা হলেন কুম্ভমেরুর দিকে। মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, ঝুলকুমারীকে না নিয়ে এ প্রাসাদে ফিরবেন না তিনি।

ঠিক একই সময় কালো ঘোড়ায় চেপে চিতোর ছেড়ে কুম্ভমেরুর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন আরও একজন। চিতোর থেকে কুম্ভমেরুর দূরত্ব অনেকটা। কালো ঘোড়ার সওয়ার হিসাব করে দেখলেন প্রথম প্রহর নাগাদ তিনি পৌঁছে যাবেন কুম্ভমেরুতে। সূর্যোদয়ের আগেই তাঁকে আবার ফিরে আসতে হবে চিতোরে। কিন্তু তিনি কি একা ফিরবেন?

আকাশে আজ চাঁদ নেই, চারপাশে শুধু জমাট বাঁধা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দুই অশ্বারোহীই আপন আপন চিন্তা নিয়ে এগিয়ে চললেন কুম্ভমেরুর দিকে।

চন্দ্রকান্তই আগে উপস্থিত হলেন দুর্গের কাছে। এত বড় দুর্গ যেন অন্ধকারের মধ্যে একদম মিশে গেছে। দুর্গ-প্রাকারের ওপরে শুধু দু-এক জায়গায় মশালের আলো ক্ষীণভাবে জ্বলছে। এ মৃত্যুপুরী আজ প্রহরী শূন্য। প্রধান তোরণের সামনে বসে শুধু ঢুলছে দুজন দ্বাররক্ষী। অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠে তিনি কুম্ভমেরুর পেছনের প্রাকারের নীচে এসে দাঁড়ালেন। তারপর একটা স্তম্ভের আড়ালে ঘোড়া বেঁধে রেখে দুর্গ-প্রাকারের পাথুরে দেওয়ালের খাঁজ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন। এক সময় তিনি পা রাখলেন কুম্ভমেরুর ভিতরে। শত দুঃখের মধ্যেও এবার মনে মনে কুম্ভর উদ্দেশ্যে হাসলেন রাঠোররাজ।

তিনি শুনেছিলেন কুম্ভর অনুমতি বিনা স্বয়ং যমরাজও নাকি এ দুর্গে পা রাখতে সাহস করেন না। ঝুলকুমারী বন্দি আছেন দুর্গের মাথায় এক কক্ষে। বীরমল্লর দেওয়া পথনির্দেশ মতো অন্ধকার হাতড়ে পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে একের পর এক কক্ষ-অলিন্দ অতিক্রম করে এক সময় পৌঁছে গেলেন সেই কক্ষের সামনে। তার ভিতর জমাট বাঁধা অন্ধকার বিরাজ করছে। নিস্তব্ধ অন্ধকার সেই কক্ষে প্রবেশ করে চন্দ্রকান্ত প্রথমে ভাবলেন কক্ষ চিনতে তিনি ভুল করেননি তো!

মৃদু স্বরে তিনি বললেন—'ঝুলকুমারী, আমি এসেছি।' কিন্তু কোনও

BanglaBook.org

উত্তর ভেসে এল না অন্ধকারের মধ্য থেকে। চন্দ্রকান্তর কাছে একটা ছোট প্রদীপ ছিল। চকমকি পাথর ঠুকে চন্দ্রকান্ত জ্বালিয়ে ফেললেন প্রদীপটা। একটা মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়ল কক্ষে। রাঠোররাজ দেখতে পেলেন পাথুরে মেঝের উপর পড়ে আছে ঝুলকুমারী। প্রদীপ তাড়াতাড়ি মাটির ওপর নামিয়ে রেখে চন্দ্রকান্ত দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে নিলেন ঝুলকুমারীর দেহ। বলতে লাগলেন—'ঝুলকুমারী-প্রিয়তমা! চোখ খোলো! দেখো আমি তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি।'

ঝুলকুমারী চোখ খুললেন না। তাঁর শুষ্ক কোটর থেকে ঝরে পড়ল শুধু কয়েক ফোঁটা জল। ওই জলবিন্দু ক'টা মনে হয় রাঠোররাজের জন্যই সঞ্চয় করে রেখেছিলেন ঝুলকুমারী। রাঠোররাজ বারবার তাঁর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, চুম্বন করতে লাগলেন তাঁর ওষ্ঠে, কপালে, এক সময় তাঁর খেয়াল হল বরফের মতো ঠান্ডা ঝুলকুমারীর দেহ।

রাত্রি এক প্রহর নাগাদ মহারানা কুম্ভ এসে উপস্থিত হলেন কুম্ভমেরুতে। তিনি প্রথমে দুর্গে প্রবেশ করলেন না। হঠাৎ তার মনে ইচ্ছে হল, ভিতরে প্রবেশ করার আগে দুর্গের চারপাশটা একবার ঘুরে দেখা যাক। দুর্গ-প্রাকারকে বেড় দিয়ে ঘুরতে শুরু করলেন তিনি। দুর্গের পিছনে এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল তাঁর ঘোড়া। সে আর কিছুতেই নড়তে চায় না। খালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে পা ঠুকতে লাগল আর ঘাড় নাড়তে লাগল। কিছুদিন ধরেই গরম হয়ে আছে কুম্ভর ঘোড়া। অভিজ্ঞ কুম্ভ বুঝতে পারলেন নিশ্চয় কোনও ঘোটকীর গন্ধ পেয়েছে সে। তাই সে আর এগোতে চাচ্ছে না। কিন্তু এত রাতে এখানে ঘোটকী কোথা থেকে আসবে!

অন্ধকারের মধ্যে চারিদিকে দেখবার চেষ্টা করলেন কুম্ভ। ঠিক এমন সময়ে একটা থামের আড়ালে মৃদু খস খস শব্দ শুনে সেদিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দেখতে পেলেন থামের আড়ালে বাঁধা আছে ঘোটকী। সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভ বুঝতে পারলেন, তাকে এখানে বেঁধে রেখে দুর্গ-প্রাকার বেয়ে নিশ্চয় কেউ কুম্ভমেরুতে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সে কে! কুম্ভ আর দেরি করলেন না, নিজের ঘোড়ার পিছনে চাবুক চালিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটলেন কুম্ভমেরুর প্রবেশপথের দিকে।

ঘোড়ার খুরের শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল দ্বাররক্ষীদের। তারা দেখল

BanglaBook.org

মহারানা কুম্ভ এসে দাঁড়িয়েছেন দুর্গ-তোরণের সামনে। বিস্মিত দ্বাররক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিল তোরণ। ভিতরে প্রবেশ করে লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে মহারানা ছুটলেন ওপরে যাবার রাস্তায়। ঝুলকুমারী যে কক্ষে বন্দি আছেন সেই কক্ষ সংলগ্ন অলিন্দে উপস্থিত হয়ে একটু থমকে দাঁড়ালেন। কক্ষের ভিতর থেকে ভেসে আসছে একটা হালকা আলো। মহারানা নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালেন কক্ষের সামনে।

মহারানা দেখলেন, মাটির ওপর বসে ঝুলকুমারীর দেহ কোলে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁর কপালে চুম্বন করছেন রাঠোররাজ। কিন্তু তাঁরা কেউই নড়ছেন না। ঠিক যেন চুম্বনরত পাথরের মূর্তি তাঁরা। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যেতে লাগল মহারানা তাকিয়ে রইলেন সেই পাথরের মূর্তি-যুগলের দিকে। এক সময় নিজের অজান্তেই চৌকাঠ ডিঙিয়ে প্রবেশ করলেন কক্ষের ভিতর।

মহারানার ছায়া গিয়ে পড়ল মূর্তিযুগলের চুম্বনরত মুখের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকালেন রাঠোররাজ। ঝুলকুমারীর দেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়ল কোল থেকে। মহারানা বুঝতে পারলেন ও-দেহে আর প্রাণ নেই।

মহারানাকে দেখতে পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন রাঠোররাজ। জ্বলে উঠল তাঁর দুই চোখ। বিদ্যুৎগতিতে কোমর থেকে তরবারি খুলে নিয়ে রাঠোররাজ আক্রমণ করলেন তাঁকে। মহারানা কৌশলে এড়িয়ে যেতে লাগলেন রাঠোররাজের তরবারির আঘাত। অপটু হাতে পাগলের মতো মহারানাকে লক্ষ্য করে তরবারি চালাতে লাগলেন রাঠোররাজ। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না মহারানা। তরবারির আঘাত এসে লাগল তাঁর বাহুতে। ভোঁতা তরবারির আঘাতে তেমন কিছু ক্ষতি হল না মহারানার, কিন্তু রক্তপাত হতে শুরু করল তাঁর বাহু থেকে। এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না মহারানা। তাঁর রাজরক্ত টগবগ করে উঠল। তিনি কোষমুক্ত করলেন নিজের তরবারি।

রক্ত দেখে ক্ষণিকের জন্য থমকে গেছিলেন রাঠোররাজও। তিনি আবার মহারানাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হতেই বিদ্যুৎগতিতে রাঠোররাজের কণ্ঠনালি ছিন্ন করে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল মহারানা কুম্ভর তরবারি।

BanglaBook.org

প্রিয়তমা ঝুলকুমারীর দেহর পাশে গড়িয়ে পড়ল রাঠোররাজের দেহ। মহারানা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। তারপর ধীরে কক্ষ ত্যাগ করলেন। কেউ কিছু জানল না। শেষ রাতে নিঃশব্দে চিতোরে ফিরে এলেন মহারানা।

ভোরবেলা গোমুখ কুণ্ডের পবিত্র জলে স্নান সেরে সূর্য-প্রণাম করে মহারানা পদব্রজে চললেন স্তম্ভ-চত্বরে। চিতোরের সমস্ত মানুষ ভোরবেলা উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। রক্ষী-পরিবৃত হয়ে মহারানা স্তম্ভ-চত্বরে প্রবেশ করতেই সকলে মহারানার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। নীল আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মহারানা কুম্ভর অতুলনীয় কীর্তি—বিজয় স্তম্ভ। আগামী দিনের পৃথিবীকে সে স্মরণ করাবে মহারানার শৌর্য-বীর্যের গৌরব গাথা।

স্তম্ভের ঠিক নীচেই যজ্ঞস্থল। মহারানা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই রাজপুরোহিত তাঁর কপালে এঁকে দিলেন চন্দনের টিকা। যজ্ঞে বসার আগে তরবারি শুদ্ধ করতে হবে। সেনাপতি নারায়ণ সিংহ মহারানার তরবারি খাপ থেকে টেনে বার করতেই হঠাৎ তার চোখে পড়ল তার গায়ে লেগে থাকা শুকনো রক্তের দাগ। তা কারো চোখে পড়ার আগে মন্ত্রী তাড়াতাড়ি পবিত্র গঙ্গাজল দিয়ে মুছে ফেললেন সেই দাগ। বেজে উঠল শঙ্খধ্বনি, যজ্ঞস্থলে বসলেন মহারানা। মন্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করলেন রাজপুরোহিত। জ্বলে উঠল যজ্ঞের আগুন।

দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল যজ্ঞ, পূজাপাঠ। এক সময় হাজার শঙ্খধ্বনির মধ্যে মহারানা এ স্তম্ভ উৎসর্গ করলেন ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে। এক সময় সম্পন্ন হল সব কাজ।

যজ্ঞের আগুন তখন নিভু নিভু। মহারানা উঠে দাঁড়াতে যাবেন ঠিক এমন সময় স্তম্ভের মাথার উপর থেকে মহারানার সামনে খসে পড়ল একটা মৃত পায়রা। এ পায়রাকেই মহারানা কাল স্তম্ভের মাথার উপর উড়ে এসে বসতে দেখেছিলেন। মহারানা দেখতে পেলেন মৃত পায়রার দেহ থেকে বেরিয়ে পড়েছে একটা কাগজের টুকরো। সেটা নিয়ে তার ভাঁজ খুলে ফেললেন মহারানা। তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল রাঠোররাজের উদ্দেশ্যে লেখা ঝুলকুমারীর সেই চিঠি। শব্দগুলো মনে মনে

BanglaBook.org

পাঠ করলেন মহারানা। তারপর সেই কাগজের টুকরো যজ্ঞের আগুনে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়ালেন।

সমবেত চিতোরবাসী চিৎকার করে বলে উঠল—জয় চিতোরেশ্বরের জয়, জয় মহারানা কুম্ভর জয়।

ঠিক তখন চিতোর থেকে অনেক দূরে বৃন্দাবন নামে এক প্রাচীন জনপথের পুণ্য ধূলিকণা পায়ে মেখে পথে পথে মীরা গেয়ে বেড়াচ্ছেন—

'সাজন সুধ জ্যোঁ জানে লীজে হো।
তুমি বন মেরে অন্তর ন কোঈ।।
...মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
মিল বিছুড়ন নহি কীজে হো।।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG